নিরঞ্জনের চোখে তিন পুরু কাপড় বেঁধে দেওয়া হলো। তারপর এক এক লাইনের যুবক এগিয়ে তাঁর খাটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

দশজনের ভিতর থেকে নিরঞ্জন একজনকে রেখে বাকি সকলকে চলে যেতে বল্লেন। এমনি করে পঞ্চাশ জন বাছাই হলো প্রথম দফে।

দ্বিতীয় দফে এলো পাঁচ পাঁচ জন করে, তার পরের দফে এলো দশ জনে, সেই দশজনের মধ্যে থেকে পঞ্চমকে কাছে ডেকে নিরঞ্জন তার মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন, তোমার নাম হ'লো নির্ভয় দাস। আজ থেকে এক বছরের মধ্যে আমার বৈকুণ্ঠবাস হলে তুমি এই গদির সেবায়েৎ হবে। এই ভার তুমি স্বীকার করতে রাজি আছ?

হাঁ, আছি।

এই গদির বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণজীউর নিয়মিত সেবা তুমি বিধিমত করবে, শপথ কর।

সে শপথ করলে।

তারপর নির্ভয়কে কাছে বসিয়ে নিরঞ্জন বল্লেন, আর একটা কঠিন পণ তোমাকে করতে হবে বাচ্চা, তুমি এ জীবনে কোন দিন স্ত্রীজাতির সঙ্গ করবে না। যদি কর তো তোমার বনবাস হবে,—তার ফলেই তুমি গদির অযোগ্য হ'য়ে যাবে। আর এই পাঁচ মোড়ল তোমাকে গদি থেকে সরিয়ে দিয়ে এই গদির নিয়ম মত নূতন সেবায়েৎ বাহাল করবেন।... রাজি আছ, নির্ভয় দাস?

রাজি আছি।

ঈশ্বর সাক্ষ্য ক'রে শপথ কর।

ঈশ্বর সাক্ষ্য করে শপথ করি।

অগ্নি সাক্ষ্য করে শপথ কর।

অগ্নি সাক্ষ্য করে শপথ করি।

আমার পা ছুঁয়ে শপথ কর।

নির্ভয় দাস নিরঞ্জনের পদস্পর্শ করে শেষ শপথ গ্রহণ করলে।

সমস্ত রাত্রি ধরে গদিতে খাওয়া দাওয়া চল্লো। এমন উৎসব নাকি অনেক দিন হয় নি।

পরের দিন সকাল হ'তে না হ'তে নিরঞ্জন দেহ রক্ষা করলেন।

নিমেষের মধ্যে নির্ভয় দাসের মাথায় গদির পর্ব্বত-প্রমাণ গুরু-ভার এসে প'ড়লো!

চাবির গোছা কোমরে বেঁধে মালিক হ'য়ে বসা সহজ; কিন্তু মালিকের কর্ত্তব্য যে কত কঠিন, কত দুর্ভর, তা সে দিন সে ভাল ক'রেই বুঝেছিল।

লোকের ভিড় একটুও কমলো না; বরং বাড়তেই লাগলো; নির্ভয় দাসের মনে হ'লো যে অগণ্য বিচারক তার চারিদিকে দাঁড়িয়ে তার অক্ষমতা দেখে নির্দ্দয় কৌতুকের হাসি হাস্‌চে। তারা যদি সরে যায়, তা হলে সে হয় তো কোন রকমে নিজেকে সম্বরণ করে কাজ সাম্‌লে নিতে পারে। কিন্তু কেউ এক পাও নড়ে না; কেবল চারিদিক থেকে প্রশ্ন উঠছে, দেরি কিসের, দেরী কিসের?

নির্ভয় কিছুক্ষণের জন্য যেন অভিভূত হয়ে প'ড়লো। সে আর কোন পথ না দেখে ছুটে গিয়ে নিরঞ্জনের পায়ের ওপর প'ড়ে বার বার ক'রে নীরবে প্রশ্ন করতে লাগ্‌লো—তুমি গুরু, গদির উপর আমাকে বসিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলে, আমি যে কিছুই জানি নে! কি করবো, একবার ব'লে দাও প্রভু!

বিহ্বলতার মধ্যে নির্ভয় যেন শুন্‌তে পেলে কার ক্ষীণ কণ্ঠ-ধ্বনি তার কানের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে:

ভয় নেই বাচ্চা, ভয় নেই; কোমর বেঁধে কাজে লেগে যা—কাজই তোকে পথ ব'লে দেবে; আমি তোর বিপদের কথা জেনেই তোর নাম দিয়েছি, নির্ভয়। তুই নামের উপযুক্ত হ, তোর সাম্‌নে থেকে বিপদ আপনি সরে চ'লে যাবে।

সন্ধ্যার সময় নিরঞ্জনের ভস্মাবশেষ গদির সমাধি ক্ষেত্রে পুঁতে দিতে দিতে নির্ভয় শুন্‌তে পেলে লোকে বল্‌চে:

ছোক্‌রা নামের যোগ্য বটে ! এক মুহূর্ত্তে গদির যা-কিছু সব নখদর্পণ ক'রে তুলেছে !

আর একজন বল্লে, দূর, তাই কি হয় ? ওকে সমস্ত রাত ধরে ভকতজি—শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম ক'রে দিয়ে গেছে ...

অপর একজন বল্লে—তোরা জানিসনে, বাকে বকচিস্ কেন ? এ গদির দস্তুরই এই ! এর রাধাকিষণজি যে জাগ্রত তাও কি তোরা জানিস্ নে ?

এতক্ষণে নির্ভয়ের মুখে হাসির ক্ষীণ রেখাটুকু ফুটে উঠ্‌লো ।

২

নির্ভয় দাসের জীবনের ইতিহাস কেউ জান্‌তো না, এমন কি সেও ভাল ক'রে জান্‌তো না ।

যেদিন তার প্রথম জ্ঞান হয়েছিল সেদিন সে জান্‌তো যে একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাকে বনি-বনাও ক'রে থাক্‌তে হবে, নইলে কর্ত্তাদের মারের চোটে পিঠের চামড়া থাক্‌বে না ।

সকাল বেলায় বিছানা ছেড়ে উঠে সকলে মিলে এক সঙ্গে চীৎকার ক'রে যে কথাগুলো বল্‌তে হ'তো তার একটি বর্ণের মানে তারা জান্‌তো না । মানে বুঝিয়ে দেবার মাথা ব্যথাও কারুর ছিল না । শুধু ব'লে যাও—না বল্লে রক্ষা নেই !

তারপর জল তোলা, বাসন মাজা, কাপড় ক্যাচা সেরে একটা কলাই করা লোহার থালে খানিকটা খিচুড়ি । সেটা খেয়ে ছুটতে হ'তো পড়তে, বই শ্লেট নিয়ে ।

সেইখেনে ছিল খানিকক্ষণের জন্য নিষ্কৃতি । বুড়ো মানুষটির মেজাজ ছিল ঠাণ্ডা ; কিন্তু তিনি যে কি বল'তেন তা কেউ সহজে বুঝতে পারতো না । শুধু একটা বড় কাঠের ওপর খড়ি দিয়ে তিনি কতকগুলো হরফ লিখে দিতেন, তাই দেখে তারা শ্লেটে লিখে নিতো ; আর বই-এর হরফের সঙ্গে মিলিয়ে বল্‌তো, এ, বি, সি, ...

সে সঙ্গীদের কাছে শুনেছিল, যার বাপ নেই, মা নেই, দুনিয়ায় কেউ আপনার নেই—তারাই এখেনে আসে ; বড় হলে চা-বাগিচায় কুলির কাজ করার জন্যে এরা তাদের তালিম দিচ্চে !

সে ভাব্‌তো, আহা ! কবে বড় হবে ; কবে গিয়ে চা-বাগিচায় কুলির কাজে ভর্ত্তি হবে !

এম্নি ক'রে কতদিন কেটেছিল তা' তার ঠিক মনে হয় না । হঠাৎ একদিন শোনা গেল, তাদের এবার যেতে হবে চা-বাগিচায় কাজ শিখ্‌তে ।

আনন্দে তার মনটা নাচ্‌তে লাগ্‌লো । মনে হলো বাগানের খোলা বাতাসে একটু নিশ্বাস ফেলে প্রাণটা যেন বেঁচে যাবে এইবার !

দু'দিন পথ হেঁটে তারা গিয়ে পৌছল এক মজার জায়গায় যেখেনে মস্ত মস্ত গাড়িগুলো ছুটোছুটি করছে লোহার রাস্তার উপর দিয়ে । তাদের ভু-ভু শব্দে কান যেন ফেটে যায় ; হুস্‌হুস্ করে ধোঁয়া ফেলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় যে মিলিয়ে যায় তার কোন ঠিকানাই থাকে না !

সেটা একটা ইষ্টিশান্ ; সেখান থেকে একদিন অনবরত রেলে চ'ড়ে গেলে তবে জাহাজ-ঘাটে পৌছায় মানুষ, তারপর চার-দিন চার-রাত গেলে তবে গিয়ে পৌছন যাবে চা-বাগিচায় !

শেষ রাতে গাড়ি ছাড়বে ; সবাই ঘুমিয়ে পড়লো একটা মস্ত বড় পাথরের চাতালের ওপর । তার ধারেই এসে লাগ্‌বে গাড়ি—তখন টপাটপ্ গাড়ির মধ্যে উঠে পড়তে হবে !

চা-বাগানের সুখস্বপ্নে কিছুতেই আর ঘুম আসে না । চিৎ-হয়ে শুয়ে শুয়ে নির্ভয় দেখতে লাগ্‌লো হাজার হাজার চোখ দিয়ে আকাশ যেন চেয়ে রয়েছে এই পৃথিবীর দিকে ! কি দেখে আকাশ ? তারো কি ইচ্ছা হয় নেমে আস্‌তে চাঁদের আলোয় ম্লান এই রহস্য রাজ্যের মধ্যে !

প্রকাণ্ড মাঠের চারিদিকে যেন গাছের প্রাচিল দেওয়া

ঘেরা—তার পেছন থেকে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে বিদ্যুতের ক্ষণিক ছটা।

কখন তার চোখের পাতা দুটো আপ্‌নি বন্ধ হয়ে গেছে! সে স্বপ্নে দেখচে যে, কালো ভারি মেঘের রাশ এসে যেন তাদের বুকের ওপর চেপে বসতে চায়! সেই চাপে কিছুতেই আর নিশ্বাস পড়ে না!

হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখে তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে ঝড়-বৃষ্টি ছুটে চ'লে আস্‌চে! যে যেখানে পারলে ছুটে পালিয়ে গেল।

নির্ভয় ছুট্‌তে ছুট্‌তে যে কোথায় চ'লে গেল তা সে আর কিছুই ঠিক করতে পারলে না। যখন তার পা দুটো আর চল্‌তে পারে না—তখন গিয়ে ব'সলো একটা ছোট ঝর্ণার প্রান্তে।

আঁজলা আঁজলা ক'রে তার জল খেয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। তারপর চোখের পাতা দুটো সীসের ডেলার মত আপনি বন্ধ হয়ে গেল।

তেমন ঘুম বুঝি আর সে জীবনে কোন দিন ঘুমোই নি।

৩

একজনের হাঁকা-হাঁকিতে তার ঘুম ভাঙলো। সে লোকটা কাছাকাছি একটা জঙ্গলে চ'লেছিল কাঠ কাট্‌তে।

নির্ভয়ের সরল উত্তর শুনে বোধ হয় তার মনে দয়া হলো; বল্লে, আমার সঙ্গে চল্‌, তোকে খেতে-পরতে দেবো, আমার সঙ্গে কাঠ্‌ কাট্‌বি।

নির্ভয় বল্লে, আমি চা-বাগিচায় কাজ শিখ্‌তে যাবো যে।

তার কথা শুনে লোকটা হাস্‌লে, তা' যাস্‌, ফের যখন জাহাজ ছাড়বে যাবি, সেও ত পনর দিন পরে, এর মধ্যে খাবি কি? থাক্‌বি কোথায়? তোর সঙ্গীরা সব তোকে ফেলেই চ'লে গেছে।

সন্ধ্যার সময় সে ফিরলে কাঠের বোঝা মাথায় ক'রে।

মাঠের মধ্যে লম্বাদাড়ি এক বাবাজি বসে আছেন; তাঁর সাম্‌নে জলছে একটা মস্ত কাঠের গুঁড়ি। চারিদিকে লোক ঘিরে ব'সে, বাবার গাঁজার প্রসাদ ভক্ষণ করছে; সেই প্রচণ্ড গরমে, আগুনের তাৎ তাদের গায়েও লাগে না যেন!

বাবাজি তাকে দেখে ইসারা করে ডাক্‌লেন। কাছে যেতে ইসারা ক'রে ব'সতে বল্লেন। সে ব'সলো।

তার ডান হাতখানা টেনে নিয়ে বাবাজি হাতের রেখাগুলো পুঙ্খাণুপুঙ্খ পরীক্ষা ক'রে ঝুলি থেকে খানিকটা ছাই তুলে নিয়ে তার কপালে মাখিয়ে দিতেই—চারিদিকের লোকেরা চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, হর-হর বোম্‌ বোম্‌! জয়, মৌনীবাবাকি জয়!

তারপর তার সাম্‌নে একথালা খাবার এসে প'ড়লো।—বাবাজি তাকে খেতে ইসারা করলেন।

নির্ভয়ের খুবই খাবার দরকার ছিল, সে আর দেরি করলে না।

তার খাবার সময় দুজনে তাকে পাখা করে বাতাস দিতে লাগ্‌লো।

সবাই চুপি চুপি কানাকানি করতে লাগ্‌লো, ছোঁড়াটার খুব ভাগ্য বল্‌তে হবে, বাবাজি একে দেখেই চেলা ক'রে নিলেন!

তারপর কোথায় কোথায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন যুক্তবেণী প্রয়াগে মৌনী বাবাজি দেহ রাখলেন!

সেও ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিন বছর হয়ে গেল!

তারপর?

তারপরের কথা নির্ভয়ের মনে করতে যতখানি সুখ, ততখানি ব্যথা!

নির্ভয় একটা বড় ধরণের নিশ্বাস ফেলে উঠে প'ড়ে নিজে নিজে বল্লে, যাই, চাবি খুলে দেখিগে সিন্দুক-বন্ধ কত কি ধনদৌলৎ আছে!

ঘরের চাবি খুল্‌তে গোটা কয়েক চামচিকে ঝট্‌-পট্‌ ক'রে বেরিয়ে এলো বাইরে।

ঘরের ভিতর ঢুক্‌তেই ইঁদুরগুলো চোঁচা দৌড়ে গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে প'ড়লো।

সে মনে মনে হাস্‌লে, কোন কাজের জিনিষ নেই এ সব ঘরে; দেখ্‌ছি গুরুজির পায়ের ধুলো বহুদিনই পড়েনি এখানে!

একটা সিন্দুকের ডালা তুলে দেখ্‌লে, তাতে একরাশ বই, আর্শোলায় কেটে তুলো-ধোনা ক'রে রেখেছে।

পাশের ছোট সিন্দুকটায় তালা ঝুল্‌চে। রিং-এর একটাও চাবি তাতে লাগে না, ব্যাপার কি? সিন্দুকটা নাড়বার চেষ্টা করলে, বেজায় ভারি!

তাইতো! এতেই বা কি আছে?

তারপরের গোটা চারেক খোলা সিন্দুক প'ড়ে আছে—কোনটাতে বিগ্রহের রাসের সাজ, কোনটাতে বা দোলের সাজ।

নির্ভয় ভাবলে ঐ বন্ধ সিন্দুকটায় বিগ্রহের গহনাগাঁটি, টাকা-কড়ি থাক্‌তে পারে; কিন্তু চাবি কোথায়?

কাকেই বা জিজ্ঞসা করে?

বেলা হ'তে পূজারি ঠাকুর এলো। প্রকাণ্ড শিখা, নাক থেকে কপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত তিলক। হাতে ফুলের সাজি!

সেদিনটা সে বিগ্রহের সেবা কেমন ক'রে হয় তাই দেখেই নীরবে কাটিয়ে দিলে। কারুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই; শুধু ধীর হ'য়ে দেখে নিতে হবে, কেমন ক'রে চলে গদির কাজ। তারপর যদি প্রয়োজন হয় পরিবর্ত্তনের, সে দেখা যাবে; তার অবসরের অভাব হবে না পরে!

এমনি ক'রেই ত তাল গাছের গায়ে অশ্বথ-বট গজিয়ে উঠ্‌তে থাকে! একদিন সেটা পরগাছা; দশ-বিশ বছর পরে তারই ডাল-পালায় ভ'রে যায় সেই জায়গা; তখন তাল গাছের চিহ্নও কেউ দেখ্‌তে পায় না।

পূজারি সেদিন বিগ্রহ-সেবায় যত না মন দিলে তার চেয়ে ঢের বেশী মনোযোগের সঙ্গে গদির নূতন মালিকের চলা-ফেরা দেখে নিতে লাগ্‌লো!

নবীন গৌর কান্তি; কি স্নিগ্ধ সহাস চোখ দুটি! পূজারি মনে মনে বল্লে, নির্ভয় ভাল লোক হবে; অন্ততঃ নিরঞ্জনের মত নির্দ্দয়-নিরস হবে না!

নবাগতের ইতিহাস কেউ জান্‌তো না; কিন্তু জেনে নেবার ভিতরের চেষ্টা সকলেরই মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠ্‌লো।

মানুষ অজানার মধ্যে থাক্‌তে চায় না; সন্দেহ তার মনকে পীড়িত ক'রে তোলে!

আরতির পর নির্ভয় এসে নাট-মন্দিরের একপাশে চুপ ক'রে ব'সে রইল। মানুষে মানুষে ভরা ছিল দুদিন আগে এই জায়গাটা! আজ কেউ কোথাও নেই!

একটা বড় আলো টিমে ক'রে দেওয়া হয়েছে; তার ম্লান আলোতে মেঝের কালো পাথরগুলো আরো বেশী কালো দেখায়—সাদা পাথরগুলো আরো বেশী সাদা!

কাজ সেরে পূজারি এসে নূতন মালিকের কাছে বস'লো; ইচ্ছা—কথায় বার্ত্তায় জেনে নেওয়া মানুষটি কেমন।

মৌনী-বাবাজির চেলা-গিরি ক'রে নির্ভয় কিছু আর কিছু শিখুক আর নাই শিখুক চুপ ক'রে শুনে আর দেখে দুনিয়াকে বুঝতে চেষ্টা করতো!

পূজারি বল্লে, রাসের সময় খুব মেলা হয়, অনেক লোক-জনের সমাগম হয় এখেনে।

নির্ভয় বল্লে, বটে!

পূজারি ব'লে যেতে লাগ্‌লো, গুরুজি, অনেক টাকা খরচ করতেন ...

এ টাকা আসতো কোথেকে?

তা' কেউ জানে না, কোথেকে যে তিনি কি করতেন; পাকা লোক ছিলেন, বহুদিন এই কাজ করছিলেন ...

নির্ভয়ের একবার জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা হ'লো, সেই সিন্দুকটার কথা, আবার মনে হ'লো—কাজ নেই প্রথম দিনে ঐ সব কথা উত্থাপন ক'রে। কথার উত্তরে বল্লে, তাঁর আশীর্ব্বাদে হ'য়ে যাবে সব কাজ, আমি তো উপলক্ষ্য মাত্র, আপনারা পাঁচজন আছেন।

পূজারির মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো, সে সজোরে ঘাড় নেড়ে

বল্লে, তা বটেই তো, তা ছাড়া দেখছি, আপনার বয়স কম হ'লে কি হয়, আপনার বুদ্ধি বড় ধীর ...

নির্ভয় মৃদু হেসে বল্লে, এত শীগ্‌গীর কি মানুষ চেনা যায় পূজারি-ঠাকুর ?

পূজারি সপ্রতিভ হাসি হেসে বল্লে, তা' একটু আধটু পারি বই কি আমরা, রাধাকিষণজীর কৃপায় ...

আলাপ জমে না দেখে পূজারি বিদায় নিয়ে চ'লে গেল সে রাত্রে।

গভীর রাত্রে হঠাৎ যেন নির্ভয়ের ঘুম ভেঙে গেল। কে ঐ নাট-মন্দিরে বেড়িয়ে বেড়াচ্চে !

রুদ্ধ-নিশ্বাসে সে দেখলে আর কেউ নয়, নিরঞ্জন; নিরঞ্জন ছাড়া ও আর কেউ হ'তে পারে না। সেই শীর্ণ হাত-পা, সেই দীর্ঘাকৃতি !

ভয়ে তার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লো। বুকের মধ্যে হৃৎ-পিণ্ডটা ধক্-ধক্ করতে লাগলো। সে খানিকটা সময় চোখ বুজে ভয়-বিহ্বল অসাড়ের মত প'ড়ে রইল।

তেম্নি ক'রে থাক্‌তে থাক্‌তে ক্রমে তার মনে সাহস আস্‌তে লাগ্‌লো—সে নিজেকে বল্‌তে লাগ্‌লো, তোর ভয় পেলে চলে কেমন ক'রে রে ? কার ভয় ? কিসের ভয় ? তবে এতবড় ব্যাপারে হাত দিয়েছিস কেন ?

তখন মনের ভিতর থেকে একটা শক্ত মানুষ বেরিয়ে এসে যেন দৃঢ় কণ্ঠে বল্লে, ওরে, গুরুজি আমার নাম যে নির্ভয় দিয়ে গেছেন, ভয় কি আমার সাজে ?

নির্ভয় উঠে ব'সলো, ব'সে ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে দেখ্‌লে, গুরুজি তেম্‌নি ক'রে বেড়াচ্চেন, যেন কিছুতেই তাঁর স্বস্তি নেই, শান্তি নেই !

নির্ভয় ধীরে ধীরে নাট-মন্দিরের একপাশে এসে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে, যে-শরীর সে নিজের হাতে সেদিন ভস্ম ক'রে পুড়িয়ে ফেলেছে সেই শরীরই বটে !

ছায়া-মূর্ত্তি আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো; এসে নির্ভয়ের ঠিক সাম্‌নে দাঁড়াতেই সে জানু অবনত ক'রে তার পায়ের কাছে হাঁটু-গেড়ে ব'সে প'ড়ে আত্মনিবেদন করলে।

৪

নির্ভয়ের ঠিক ক'রে জ্ঞান হ'লো তোষাখানার মধ্যে। সে জানে না, কে দরজা খুলেছিল, আলো এনেছিল, কেমন ক'রেই বা সেই ভারি সিন্দুকটার চাবি খুলে গেল !

এক সিন্দুক-ভরা গহনা আর সোনার টাকা দেখে তার বিস্ময়ের শেষ রইল না। সে মাথা তুলে দেখ্‌লে, ঘরে আর কেউ নেই, সে একাই !

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে নাট-মন্দিরে এলো, সেখেনেও কেউ নেই, সেই বাতিটা তেমনি মিট্-মিট্ ক'রে জ্বলছে !

নির্ভয় স্তম্ভিত হ'য়ে নীরব-নির্জ্জন পুরী মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল ! কতক্ষণ সে কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিল ? স্বপ্নের ঘোরে সে তোষাখানার চাবি খুলেছে ? টাকার-সিন্দুকের চাবিই বা এলো কোথা থেকে ?

ক্রমে পূবের আকাশ স্বচ্ছ নীল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। খাঁচার মধ্যে থেকে শ্যামা, দোয়েল, কোকিল সাড়া দিয়ে জানিয়ে দিতে লাগ্‌লো আর সকালের বড় বেশী দেরী নেই।

সে-টাকা একদিনে গুণে শেষ করতে পারা যায় না। কি হবেই বা গুণে-গেঁথে !

পথের পথিককে এক নিমিষের মধ্যে অতুল-ঐশ্বর্য্যের মালিক ক'রে দিয়ে এ কি পরিহাস ভাগ্য-দেবতার !

নির্ভয় যত ভাবে-চেষ্টায় ততই তার সামনে দুশ্চিন্তার সমুদ্র অকূলরূপ ধারণ করে। ধন-দৌলতের কথা আর সে ভেবে উঠ্‌তে পারে না !

নিরঞ্জন একটিও কথা কন নি। অধর-ওষ্ঠে তর্জ্জনি দিয়ে তাকেও কথা কইতে নিষেধই ক'রে ছিলেন।

শুধু ছুটো প্রদীপ্ত চোখের স্পষ্ট ইঙ্গিতে এ কথাই যেন তিনি বার বার ক'রে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রেছেন যে, সঞ্চিত সম্পদের রূঢ় আকর্ষণে তাঁর আত্মা অস্থির—তাই তাকে যত শীঘ্র পার নিঃশেষে খরচ করে দাও! একটুও আর সবুর সয় না!

আবার আরতির পর পূজারি এলো।

নির্ভয়ের চিন্তাব্যাকুল মুখ দেখে পূজারি-ঠাকুর চম্‌কে গেল।

শরীর ভাল আছে তো?

হুঁ।

খানিক নিস্তব্ধতার পর নির্ভয় বল্লে, পূজারি-ঠাকুর, আপনি সংস্কৃত পড়াতে পারেন?

পূজারি যেন আকাশ থেকে প'ড়লো।

অনেক ইতস্ততের পর পূজারি বল্লে, পড়েছিলুম তো অনেক বই, কিন্তু এখন পারি কি না জানি নে?

কাছাকাছি কোন পণ্ডিত আছেন? আপনার জানা আছে কি?

পূজারি মনে মনে প্রমাদ গণলে; এইবার বুঝি তার রুজী মারা যায়। অনেক কষ্টে বল্লে, খোঁজ নিয়ে কাল ব'লবো।

বেশীক্ষণ বসতে পূজারি-ঠাকুরের আর সাহস হ'লো না।

সকালে ফুল বাগানের অবস্থা দেখ্‌তে গিয়ে নির্ভয় দেখ্‌লে একটি কিশোরী ফুল তুল্‌চে।

বুড়ো মালি গাছের গোড়া খুঁড়ছিল।

মালি, এ মেয়েটি কে?

পূজারি-ঠাকুরের মেয়ে, মায়া।

মায়া এসে বল্লে, বাবা গেছেন বিজনে, পণ্ডিতজিকে ডেকে আন্‌তে। আমাকে ফুল তুল্‌তে ব'লে গেছেন।

তুমিই বুঝি ফুল তুলে দাও?

মায়া বল্লে, সে-বাবাজি থাক্‌তে রোজই আমি ফুল তুল্‌তুম।

আজকাল কেন তোল না?

মায়া কথার উত্তর দিলে না, মাটির দিকে দৃষ্টি নত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

নির্ভয় তার মুখখানি ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রলে। একটা অপরিসীম স্নিগ্ধতায় যেন তা ভরা!

মৌনী বাবাজীর সঙ্গে কত রমণীয় তীর্থে সে ঘুরেছে, কত অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য তো তার চোখে প্রতিভাত হ'য়েছে; কিন্তু কৈ এমন ক'রে তার মনকে সে সব তো স্পর্শ করেনি! মায়া কি সত্যই কোন মায়াতে ঘেরা?

তার সেখানে দাঁড়াতে লজ্জা বোধ হলো; মনে হলো, মনের এতখানি চাঞ্চল্য—তার খানিকটা তো মুখে প্রকাশ পেতে পারে। তা' মায়া দেখ্‌লেই বা কি মনে ক'রবে, তা' মালির দেখাও ত' ভাল হবে না।

সে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে নিজের বসার জায়গাটিতে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

নিজেকে একবার অপরাধী ব'লে মনে হলো। আবার মনে হ'লো, কিসের অপরাধ? একটি সুন্দর জিনিষকে দু-চোখ মেলে দেখে নেওয়া কি কোন অপরাধ হ'তে পারে?

নিদাঘ-তপ্ত দিনের শেষে বরফ জলে স্নান ক'রে একদিন জীবনে যে সুখ পেয়েছিল সে, এ যেন তার চেয়ে মধুর, তার চেয়েও—স্নিগ্ধ শান্ত!

কি মিষ্টি নামটি, মায়া, মায়া, মায়া!

পণ্ডিত সঙ্গে ক'রে পূজারি ফিরে এলো।

নির্ভয়ের প্রসন্ন-সহাস চোখ দুটি এমন শান্ত-আহ্বানে তাদের আপ্যায়িত ক'রলে, কণ্ঠ-স্বর এমন মধুর কোমল যে পূজারির মনে হলে—রাতের সে মানুষটি গেল কোথায়, এতো সে নয়!

নির্ভয় ব'ল্লে, আপনি যে এত উদ্যোগ ক'রে আজ

সকালেই পণ্ডিতজিকে ডেকে আন্‌বেন, তা' আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি নি।

তারপর পণ্ডিতজির চরণ-বন্দনা ক'রে সে বল্লে, দেখুন আমি দেব-ভাষার কিছু কিছু সেবা করার বাসনা করি; মনে করি আমার সঙ্গে আরো পাঁচটি ছেলেও শিখুক না কেন—তাই আপনাকে ডেকেছি।

পণ্ডিতজি তার বিনয় বাক্যে একান্ত খুশী হ'য়ে গেলেন, তাতো বটেই, তাতো বটেই, ভগবান যোগ্য বুঝেই ভার দেন্। আপনি অতিশয় সাধু ব্যক্তি, এ আপনার উপযুক্তই হয়েছে; এ সংকল্প অতি সুন্দর। আমি প্রস্তুত আছি ...

পণ্ডিতজি বাক্‌চাতুরীর জালে শেষটা কেমন নিজেকে জড়িয়ে ফেল্লেন।

নির্ভয় একটু হেসে বল্লে, দেখুন পণ্ডিতজি, আপনাকে একটা অনুরোধ ক'রবো, আপনার সেটা রাখ্‌তেই হবে।

তা' তা' অবশ্য সঙ্গত, কি বলেন? তা তো বটেই ...

তবে দয়া ক'রে শুনুন, ব'লে নির্ভয় দাস বল্লে, আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, জ্ঞানে বুদ্ধিতে কিসেই বা নয়! আপনি আমার গুরু হবেন—আমাকে আপনি বলবেন না—তুমি ব'লবেন।

পণ্ডিতজির মুখ প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো

র'টে গেল, নির্ভয় দাস চতুষ্পাঠি খুলচে।

গ্রামের মোড়লের দল মাথা নেড়ে ব'ল্লে—তা বেশ, কিন্তু কাজটা কি ভাল হ'লো?

একজন বল্লে, ওই তো দোষ, কম বয়সী হ'লেই একটা ধাঁ ক'রে—কিছু নূতন কর্‌তে চায়; আরে! দেবতার টাকায় দেবতার সেবা কর্; ওর ভেতর লেখা-পড়ার ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে ব্যাপারটাকে জটিল করবার দরকার কি?

আর এক জন বল্লে, তাতে ক্ষতি কি হলো? জান তোমরা—চীনে প্রতি মন্দিরের সঙ্গে এক একটা পাঠশালা, আর মন্দিরের পুজারিই ত গুরু?

তৃতীয় ব্যক্তি হেসে ব'ল্লে, ভায়া আমার সব-জান্‌তা; নিজেদের বাপ্-পিতামোর নামের নাই ঠিক-ঠিকানা—উনি খবর রাখ্‌চেন চীন জাপানের ... একেই বলে নাপ্‌ডিঘরে, মরণও হয় তেমনি আমাদের গাছের আগায়।

চারিদিকে হাসি প'ড়ে গেল।

পূজারির ছেলে গোবিন্দসুন্দর নির্ভয়ের সঙ্গে দেব-ভাষার পাঠ সুরু করলে। ঈষৎ গোঁফের রেখা উঠেছে। সে মায়ার চেয়ে বেশী বড় নয়; বড় জোর বছর দুই। এতদিন গরু চরিয়ে, গাছে চ'ড়ে তার দিন কাটছিল।

দেবভাষার কাঁকড়াবিছার মত অক্ষর দেখে সে প্রমাদ গণলে; দীর্ঘ ঋ যেন বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত তার পথ জুড়ে দাঁড়াল।

বালকের অক্ষমতা দেখে পণ্ডিতজির চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌লো, তিনি বল্লেন, এ ঘোর কলি, নইলে ব্রাহ্মণ-নন্দনের এত বড় প্রত্যবায়!

মায়া দূরে থেকে দাদার দুর্দ্দশা দেখে হাসে। বাড়ি গিয়ে মেঝেতে খড়ি দিয়ে লিখে দেখিয়ে দেয়, এই দেখ আমি লিখতে পারি।

গোবিন্দ রাগ ক'রে বলে, বেশী চালাকি ক'রবি তো এক থাপ্পড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবো।

আফিং-এর নেশায় ঝিমোত ঝিমোতে পূজারি বলে, মায়া, আর এক ছিলিম সেজে দে, মা!

প্রথম সাক্ষাতের কুয়াসা কেটে গিয়ে মায়া নির্ভয়ের চক্ষে চঞ্চল-মতি বালিকা ভিন্ন আর কোন রূপেই কোন মোহ সৃষ্টি ক'রতো না।

প্রথম দিনের কথা মনে ক'রে সে অবাক হ'য়ে যেতো। তার সে রূপ, সে উন্মুখ-যৌবন, যা হঠাৎ তার মনটাকে অতখানি চঞ্চল ক'রে তুলেছিল—তা যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে! নির্ভয় ভাব্‌তো, এমনি ক'রেই মানুষ ফাঁদে পড়ে; এমনি ক'রেই প্রথম-দর্শন পুরুষের জীবনের ইতিহাসকে পাহাড়ের ঝরণার মতই হয়তো উজ্জ্বল ক'রে তোলে।

কিন্তু ধীর শান্ত হ'য়ে দেখ্‌লে—আর আকুল হ'য়ে উঠ্‌তে হয় না ; চিত্তের মোহ ব্যাকুলতা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে আসে নিবিড় স্নেহ আর তার সঙ্গে সহজ আত্মীয়তা-বোধ !

বর্ষাবসানে সে দিন বিগ্রহের নানা বর্ণের বিচিত্র সাজ-পোষাকগুলি রোদে দিয়ে নির্ভয় ভগবানের গোবর্দ্ধন গিরি ধারণের তত্ত্বকথা ভাবছিল।

পণ্ডিতজি বলেছেন—কৃষ্ণ কিছু হাত দিয়ে গিরি ধারণ করেন নি—মূর্খ লোকেই ঐ কথা মনে করে—গিরির মানে, এখেনে পর্ব্বত কি পাহাড় নয় ;—পর্ব্বত-তুল্য গুরুভার কাজ ; গো, অর্থাৎ গো জাতির বর্দ্ধন কি না লালন পালন, ভগবান স্বয়ং নিজ হস্তে ধারণ ক'রেছিলেন। তারপর পণ্ডিতজি বলেন, কৃষিজীবির এদেশের গো-পালন ভিন্ন—অন্য পথ নেই। ..

নির্ভয় ভাব্‌লে আমাদেরও একটা গো-শালা করলে তো বেশ হয় !

ছুটতে ছুটতে এলো সেখানে মায়া। নানা রং-এর কাপড় দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

কি দেখ্‌ছিস্‌ মায়া ?

ঐ নীল শাড়ীখানা, ঝুলনের সময় ওটা প'রে এবারে কি সুন্দর দেখিয়ে ছিল রাধারাণীকে।

নিবি এমনি রং-এর একখানা কাপড় ?

উদাসভাবে মায়া বল্লে, নিয়ে আমি কি ক'রবো ?

নির্ভয় তার কথার ঠিক মর্ম্ম না বুঝে বল্লে, আচ্ছা দেবো তোকে একখানা ঠিক এমনি সুন্দর, এমনি রং-এর কাপড় যেদিন তোর বে হবে ..

মায়া তাকে মুখ ভেংচাতে ভেংচাতে—রাগে কেঁদে ফেলে কোথায় উধাও হ'য়ে গেল।

নির্ভয় অবাক হ'য়ে গেল। তাই তো ! এমন তো সে কোন দিন ক'রে নি !

গভীর সন্দেহে বিষাদ কালো হ'য়ে গেল তার মন ; নিজের মনে মনে সে বল্লে—তবে কি মায়া বিধবা ? ...

২

এই ছোট্ট সুন্দর—আধ-ফোটা ফুলটির ··· করুণায় নির্ভয়ের দু চোখে যেন জল এসে গেল ··· নির্ম্মম নিষ্ঠুর ...

শরতের রৌদ্র-দীপ্ত মধ্যাহ্ন আকাশে জলহীন লঘু মেঘের স্তবকের নীচে নীচে চাতক উড়ে বেড়াচ্ছে—তাদের স্ফটিক-জলের ক্ষীণ করুণ প্রার্থনাটি হয় ত উপরের দিকে যায় না ; কিন্তু মানুষের কানে এসে পৌঁছয় !

তৃষাতুর পাখী ! তোর স্ফটিকজলের আশা আর নেই রে ! ও যে ক্ষান্ত বর্ষণ শরতের সুষমার লঘু চাপল্য, মায়া মৃগ !

রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে নির্ভয়ের সব আগে মনে হলো মায়া বিধবা ! তার আর আশা করার কিছু নেই, আকাঙ্ক্ষার বস্তু নিঃশেষ হয়ে গেছে !

ঝক্‌ঝকে তারাখচিত আকাশের তলায় এসে দাঁড়িয়ে সে বল্লে, তাই কি হয় ? ..

এত বড় অন্যায় !

মায়ার জীবন-মুকুরের দিকে চোখ ফেলতে গিয়ে যেন সে শিউরে উঠলো—আর কার ছায়াও পড়েছে ওখানে যেন চিনি ওকে, যেন জানি ওর কথা।

বুকের ব্যথার জায়গাটা ব্যথা ক'রে ওঠে।

প্রশস্ত প্রাঙ্গনের ওপর পায়চারি ক'রে রাত শেষ হয়ে গেল ; কিন্তু এ চিন্তার শেষ নেই, নেই !

৫

গো-শালার বিরাট ব্যাপার চুক্‌তে প্রায় বছর দুতিন লেগে গেল। পঞ্চ মণ্ডল একদিনের জন্য নীরব রইল না। দেবতার টাকা, লাগ্‌লো কিনা গো-সেবায় ?

একজন বল্লে, বেটা বোধ হয় জাতে গয়লা ; গরু চরিয়ে খেতো ; হঠাৎ হাতে টাকা পেয়ে আর কি করে—গো-শালা খুলে ব'সলো ; যত রাজ্যের বুড়ো গরু জুটিয়েছে ... দেখেছিস্‌ ?

সে না হয় বেশ করেছে ; কিন্তু ঐ বড় বড় হাতির মত গরুগুলো কি জন্যে অত টাকা দিয়ে কেনা ?

আচ্ছা এত টাকাই বা পেলে কোত্থেকে ? নিরঞ্জন বেটা ত ছিল মক্ষীচুষ …

শুনেছিস্, এতেও শেষ হয়নি ! আবার একটা ডাক্তারখানা খুলবে নাকি ?

হুঃ টাকা পাবে কোথায় রে ?

কেন ? ওর কম জমি-জমা ? এক পয়সা খাজনা দিতে হয় না।

কিন্তু যাই বল, বেটা কিন্তু বেছে বেছে সব ভাল কাজে হাত দিয়েছে …

লোকে বলে, ও ছিল রাজপুত্তুর, রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে … দেখচিস্‌নে, চেহারাটা !

এখেনে আবার কি করবে, নির্ভর-দা ?

সেবাশ্রমের বাড়ি।

সেবাশ্রম কি ?

নির্ভর হাস্‌লে, জানিস্ নে মায়া ? অন্ধ খঞ্জ দীন-দরিদ্র, অনাথ আশ্রয়হীনদের বাড়ি।

বাবাঃ তা হ'লে তো খুব বড় বাড়ি করতে হবে।

কেন ?

পৃথিবীতে ক'জন সুখে থাকে—সবারি তো সেবার দরকার, সবাই তো গরীব অনাথ।

কেন, আমি ? অন্ধ নই, খঞ্জ নই, দরিদ্র নই—আশ্রয়হীন নই ;—এমনি আমার মতো হয় তো কত লোক আছে এই পৃথিবীতে।

তুমি কিচ্ছু জান না, তোমার মত আর একটা লোকও নেই, তা আমি জানি।

শান্ত হাসিতে নির্ভরের মুখ বিকচ হয়ে উঠ্‌লো।

আর একজন আমার চেয়ে ভাল লোক আছে, যার হাতে এই সেবাশ্রমের ভার থাকবে।

কে সে ?

তুই কি সবাইকে চিনিস্ ?

না ; তবুও বলো তার নাম।

বলচি ; কিন্তু হেঁয়ালি ক'রে বল্‌বো।

হেঁয়ালি ? ওঃ, আমি খুব বুঝে নিতে পারবো ; বল না।

প বর্গের পঞ্চমেতে জুড়িয়া আকার।
স্বরের দ্বিতীয় বর্ণ জুড়ি পিছে তার …

মায়া চেঁচিয়ে উঠে বল্লে—যাও তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ কিন্তু।

কেন মায়া, সেবাশ্রমের ভার যে তোকেই নিতে হবে।

কিন্তু, তুমি কেন আমাকে তোমার চেয়ে ভাল বল্‌বে ?

তুই যে ভালো, তাই ব'লেছি।

তবে তুমি কি করবে ?

গরুর সেবা। মানুষের সেবা করার মত বুদ্ধি আমার নেই !

আমি পারবো ?

পারবি নে তো করবি কি সারা জীবন ?

কিন্তু তুমি আমাকে চালিয়ে নিও।

আমি যদি চ'লে যাই ?

আমিও চ'লে যাবো তা হলে।

ছিঃ ও কথা বল্‌তে নেই মায়া।

লজ্জায় মায়ার মুখ টক্-টকে লাল হ'য়ে উঠ্‌লো।

* * *

দাদামা, ও-দাদামা !

কি বল্‌চিস্, বাবা ?

তুমি আমার কাছে এসে ব'সো, এখুনি ডাক্তার বাবু আস্‌বে, আমার ভয় করছে।

ভয় কি, বাবা ?

ওকে দেখ্‌লে আমার ভয় করে।

আচ্ছা আমি মানা ক'রে দিচ্চি, ডাক্তার বাবু এ ঘরে আস্‌বেন না।

অনাথাশ্রমের কুড়োনো সাত বছরের নেপাল, মায়ার হাতখানা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লে, বল, তারপরে কি হলো ; কোথায় গেলেন নির্ভর দাস বাবাজি ?

কেউ জানে না বাবা।

তোমার কি ব'লে চ'লে গেলেন ?

বল্লেন, মায়া, আজ থেকে তুই হলি সেবাশ্রমের দাসী— তোর উপর সব ভার রইলো এই অনাথ আতুরদের।

তিনি কবে ফিরে আস্‌বেন ?

কি ক'রে ব'লবো বাপধন ? ব'লে গিয়েছিলেন তীর্থ ভ্রমণ করে বারো বছর পরে ফিরবেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু'বার বারো বছর ত ফিরে গেল !

সন্ধ্যার আলো মায়ার চোখের উপর প'ড়ে চিক্ চিক্ ক'রতে লাগ্‌লো।

অনূঢ়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

—সত্যিই কি তোমার কেউ নেই দাদু ?

—কেন, এই তো তুমি রয়েছো দিদি !

—আমি আর আছি কই, আমাকে তো তুমি তাড়িয়ে দেবার জন্তে উঠে-পড়ে লেগেছ !

—ছিঃ ! ও কথা বলিস নি ভাই, বড় হ'য়েছিস, বিয়ে দিতে হবে না ? শ্বশুর-ঘর কর্‌বিনি ?

—না।

—তাও কি হয় ? লোকে যে আমার নিন্দে কর্‌ছে ! সবাই বলছে নাত্‌নিটা ষোল-সতেরো বছরের হ'য়ে উঠল, লোকনাথ তবু তার বিয়ে দেবার কোনও চেষ্টাই করছে না। মৎলব খারাপ !

—তাই বুঝি তুমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে পাগলের মতো আমার জন্ত একটি বর খুঁজে বেড়াচ্ছ ?

—নইলে কি বর আপনি এসে জুটবে রে পাগলি ? আজ কাল আর সেদিন নেই। এখন আর রূপের ফাঁদে আপনি এসে কেউ ধরা দেয় না—তাই, টাকার ফাঁদ পাততে হয়।

—কিন্তু, তোমার তো ফাঁদ পাতবার মতো টাকা নেই দাদু!

—না, তা নেই সত্যি ; তবে যা আছে তাতে চুনো-পুঁটি ধরবার মতো জাল ফেলা চলবে।

—তার চেয়ে কেন জালটি গুটিয়ে বোস না।

—ও ! নাতনির আমার রুই-কাৎলা চাই বুঝি ! পুঁটি মাছেতে মন উঠবে না, না ?

—না, আমি বিয়ে করবো না দাদু।

—আরে তাও কি হয় বোন্, মেয়েমানুষ হ'য়ে যখন জন্মেছিস, তখন বিয়ে না ক'রলে চ'লবে কেন ভাই ?

—কেন পুরুষ মানুষের যদি বিয়ে না ক'রে চলে, তবে মেয়েমানুষের চলবে না কেন ?

—পুরুষমানুষেরা যে উপার্জ্জন করে নিজেকে প্রতিপালন কর্‌তে পারে বোন্।

—কেন, তুমি যখন আমায় এতো লেখাপড়া শিখিয়েছো, আমি কি কোনও মেয়ে-ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রী হ'য়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবো না ?

—জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া অত সহজ নয় দিদি ! বিশেষত এই মেয়েমানুষের। অনেক রকম আপদ এসে জুটবে ভাই।

—তুমি একজন মেয়েদের স্বাধীন উপজীবিকার পক্ষপাতি হ'য়ে এ কথা ব'লছো কেন দাদু ?

—ব'ল্‌ছি অনেক দেখে শুনে রে। স্বাধীন উপজীবিকা খুবই ভাল, যদি তোমার ভাই, বন্ধু, স্বামী অথবা এমন কোনও একজন থাকে যে হাসিমুখে আনন্দের সঙ্গে যে কোনও মুহূর্ত্তে তোমার সব ভার নিতে পারবেন। কিন্তু যদি তোমার কোনও অভিভাবক বা অন্য কেউ সহায় না থাকে তা'হলে স্ত্রীলোকের সেই অসহায় অবস্থার সবাই সুযোগ নিতে চেষ্টা করে। তুমি শিক্ষয়িত্রী হ'তে চাইছ বটে, কিন্তু দিদি, ইস্কুলের সেক্রেটারি কিম্বা প্রেসিডেণ্টের যদি প্রণয়িনী হ'তে না পারো তাহ'লে তোমার চাকরি ছ'মাসও টেঁকবে না। 'মিড্‌ওয়াইফ্‌' কিম্বা 'নার্স্‌' হ'তে গেলেও ডাক্তার বাবুদের খুশী রাখতে হবে, নইলে উপোস করতে হবে। 'গভর্ণেস্‌' হ'তে গেলে বাড়ীর কর্ত্তার মনস্তুষ্টি করা চাই—! ওরে ভাই, দুঃখের কথা বলবো কি ?—আমার একটা বিধবা বোন্—তোরই মতো তার বিদ্যে-বুদ্ধি !—গেছল এক অনাথ-আশ্রমের পরিচালিকা হ'য়ে, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই অনাথ-আশ্রমের কমিটির যে ক'টি সভ্য ছিল, তারা সকলেই—অবশ্য পরস্পরের অসাক্ষাতে—হঠাৎ আমার ভগ্নীর প্রতি এমন প্রেমাকৃষ্ট হয়ে প'ড়তে লাগল যে, বেচারি পালিয়ে আসতে পথ পেলে না ! হুঁ ! হাসছো তো খুব, একবার শিক্ষয়িত্রী হওগে না, মজাটি টের পাবে !

—আচ্ছা দাদু, এই তো তোমার এক বিধবা বোন আছে শুনছি, তবে কেন বলো তোমার কেউ নেই।

—সে কি আজও আছে রে ?—সে সৌভাগ্যবতী যে অনেক দিন হ'ল তার স্বর্গগত পতির চিরশান্তিময় বুকে ফিরে গেছে।

—আর, তাঁর ভাইটি বুঝি তাই তাড়াতাড়ি সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজের স্বর্গগত পত্নীর বুকে ফিরে যাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে চাইছে।

—দূর্ পোড়ারমুখী ; তোর দাদু যে আজও ভাইবুড়ো তা জানিস্ নি ?

—কি ক'রে জানবো ? তুমি কি তোমার কথা বলো আমাকে ? পাড়ার মেয়েরা বলে বটে যে তুমি বিয়ে করো নি। আমার মা নাকি ছিল তোমার পুষ্যি মেয়ে—কিন্তু আমার তো দাদু সে কথা বিশ্বাস হয় না।

—কেন ? অবিশ্বাসই বা হয় কেন ?

—পালিতা মেয়ের কন্যাকে কি কেউ এমন বুকভরা ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রাখ্‌তে পারে দাদু ?

—ইস্ ! তাই নাকি ? দেখিস্ যেন শেষে আমারই গলায় মালা দিয়ে ফেলিস্ নি !

—সে সৌভাগ্য কি আমার হবে ? সে পুণ্য কি আমি করিছি ?

—ওরে বাস্ রে !—একেবারে দেবী চৌধুরাণীর মাস্তুতো বোন্ হ'য়ে উঠলি যে দেখ্‌ছি। এই বুড়ো বরটিকেই কি তবে বজ্‌রায় আটক ক'রে রাখতে চাস্ ?

—যাও, তুমি ভারী দুষ্টু ! তুমি বুঝি বুড়ো ! তোমার কি চুল পেকেছে ? তোমার কি দাঁত পড়েছে ? বামুন-গিন্নী বল্‌ছিলেন তিনি তোমায় জন্মাতে দেখেছেন ! তোমার বয়স নাকি এখনও সাঁইত্রিশ পার হয় নি !

—ওরে পাগলি, বয়স বেশী না হলে—চুল না পাকলে আর দাঁত না পড়লেই বুঝি মানুষ বুড়ো হয় না—এই বুঝি তোর ধারণা ? আমি আমার বাইশ বছর বয়সেই বুড়ো হ'য়ে পড়েছিলুম, বুঝ্‌লি ! তুই জন্মাবার ঠিক বছর খানেক আগে আর কি ! তোর মা সেটা জানতো ; তাই বয়সে আমার চেয়ে সে দু'এক বছরের বড় হ'লেও আমাকে 'বাবা' বলে ডাকতে তার বাধে নি !

—আমার মায়ের কথা একদিন যে আমাকে সব বলবে বলেছিলে—বলো না দাদু ?

—সে তোর বিয়ের পর শোনাবো ভাই, তার আগে নয়।

—তবেই আমার শোনা হ'য়েছে, একমণ তেলও পুড়বে না—রাধার নাচাও হবে না ?

—বটে ! বটে ! বিয়ের জন্যে যে একেবারে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিস্ দেখছি !

—ব'য়ে গেছে আমার বিয়ে ক'রতে ! বয়ে আমার

এমন সভা-উজ্জ্বল বর থাক্তে আমি পরের ছেলের গলায় মালা দিতে যাবো কেন ?

—দিতেই যে হবে রে ! বর বাছাই করে নিয়ে—স্বয়ম্বরা হবার প্রথা এ যুগে তো আর চলে না ! তবে আমি তোর জন্যে একটি সভা-উজ্জ্বল বরই খুঁজে আন্বার চেষ্টা করছি—

—তাই নাকি ? তাহ'লে তোমায় আমি আগামই বহু ধন্যবাদ দিয়ে রাখছি দাদু ! কিন্তু, শুধু সভা-উজ্জ্বল বর হ'লে ত হবে না, ঠিক তোমার মতন অম্‌নি একজোড়া ভোমরা-কালো হোমরা-চোমরা গোঁফ থাকা চাই—ফরমায়েস্ দিয়ে রাখলুম, বুঝলে !

—যো হুকুম হুজুরাইন্ ! নেহাৎ যদি ঠিক এ রকমটি না পাওয়া যায়, তাহ'লে আমারই গোঁফ জোড়াটা না হয় তাকে যৌতুক দেওয়া যাবে !

—না, সে হবে না। গোঁফ্ জোড়াটি পর্য্যন্ত যাকে দাদাশ্বশুরের কাছে ধার ক'রতে হবে আমি সে রকম ফতুর লোকের ঘর করতে যেতে পারবো না !

—আচ্ছা, সে তখন পরে দেখা যাবে ; এখন আমার একখানা ফর্সা কাপড় আর একটা ফর্সা জামা বার করে দে দেখি !

—কেন ? কোথায় যাবে ?

—একবার বেনোয়ারী বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর হাতে একটি ভাল পাত্র আছে। খবরটা নিয়ে আসি গিয়ে।

—গেলে—সারা হয়ে গেলে দেখছি ! 'পাত্র' 'পাত্র' ক'রে পাগল হবার উপক্রম ! কক্ষণো দেবো না তো জামাকাপড় বার করে !—

—লক্ষ্মী দিদি আমার, দে, পাগলামী করিস নি ! তোর বিয়েটা শীগ্‌গির না দিতে পারলে আমি যে আর লোক-সমাজে মুখ দেখাতে পারছি নি ! এর মধ্যেই লোক আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করেছে ! ব'লছে, নাত্‌নিকে নিয়ে ঘর-করার চেয়ে একটি ওই রকম বড় সড় মেয়ে দেখে আমার নাকি বিয়ে করা উচিত।

—সে মুখপোড়া লোকগুলোকে তুমি বেশ ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারো না দাদু !

—হ্যাঁ তা শুনিয়ে দিই বই কি ! বলি যে, তোমাদের ঘরে যদি এমন নাত্‌নি থাক্‌তো, তাহ'লে তোমরাও আমারই মতন ভেড়া ব'নে যেতে ! শুনে তারা কি বলে জানিস্ ?—

—না, আমি শুনতে চাই নে। যাও ! তুমি ভারী দুষ্টু !

—ওরে শোন্ শোন্—তারা বলে যে—"তবে আর কেন পাত্র খুঁজে খুঁজে শহর তোলপাড় করছো—একটা ভাল দিন দেখে পুরুত ডেকে নাত্‌নিটিকে পত্নী-পদে অভিষিক্ত করে নাও না ! এখনও তো চল্লিশে এসে পৌঁছও নি, বিয়ের বয়স আজও আছে—নেহাৎ বেমানান হবে না !" হাঃ হাঃ হাঃ !

—ওঃ ! ভারি খুশী যে দেখছি ! হাসি আর ধরে না ! তা এককাজ করো—তাদের তুমি এই রবিবার এখানে এসে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে এসো ! তারা খুব ভাল লোক দেখ্‌ছি। সৎ পরামর্শ দিতে জানে ! আমি এখনি জামা কাপড় বার করে দিচ্ছি।

—আর অম্‌নি গোটা দুই টাকাও এনে দে—রবিবারের বাজারটাও ক'রে আনিগে তাহ'লে ! ইস্ ! টেপাঠোঁটের ধারে ধারে চাপা হাসি যে উপচে পড়্‌ছে দেখছি !

—এই নাও, জামা কাপড় ; আর ফর্সা উড়্‌নীও একখানা দিলুম, ফিরতে বেশী দেরী কোরো না যেন। পকেটে টাকা পয়সাও কিছু দিয়েছি, দরকার হ'লে গাড়ী করে যেও। সেদিনকার মতো রেঁধেবেড়ে খাবার সাজিয়ে নিয়ে আমায় যেন ব'সে থাকতে না হয়।

—না না, যাতে আর না তোমাকে এ লক্ষ্মীছাড়ার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়, শীগ্‌গিরই সে ব্যবস্থা ক'র্‌ছি দিদি।

—ফের্ ওই সব কথা। আচ্ছা যখন বিদেয় হ'য়ে যাবো তখন বুঝতে পার্‌বে। নাকের জলে-চ'খের জলে হ'তে হবে। কে তোমার সব করবে তখন দেখবো।—

—আমি তখন বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে আসবো। সে আমার সব করবে।

—সত্যি দাদু, একটি বিয়ে করো না ভাই! তোমার মনের মতো একটি মেয়ে আমি খুঁজে এনে দিতে পারি।

—তা হয় তো' পারো, কেন না সে জন্যে তো আর তোমায় বেশীদূর যেতে হবে না। এই ঘরে—আমার সামনেই তো সে মেয়েটি হাজির রয়েছে!

—যাও, যাও, অত আর মিছে কথা ব'লতে হবে না। আমাকে তো তুমি দু'চক্ষে দেখতে পারো না! ... তুমি নাই বা কিছু বললে, আমি বামুন-গিন্নীর মুখ থেকে সব শুনিছি। 'নন্দরাণী'-বলে কে এক তোমার ছেলেবেলার খেলুনী কায়েতদের মেয়েকে তুমি ভালবাসতে। তাকেই বিয়ে করতে চেয়েছিলে, কিন্তু বামুনের ছেলের সঙ্গে কায়েতের মেয়ের বিয়ে হয় না বলে সেই দুঃখে আজও আইবুড়ো কার্ত্তিক হ'য়ে আছো!

—তারপর? আর কি শুনিছিস্?

—তারপর আর কি? নন্দরাণীর যে রাত্রে অন্য জায়গায় বিয়ে হ'য়ে গেল, সেই রাত্রে তুমি নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছলে, তারপর বছর ফিরতে না-ফিরতে নন্দরাণী তোমায় স্বর্গে চলে গেলেন, তুমি সেই খবর পেয়ে দেশে ফিরে এলে!

—এত কথা যখন শুনেছিস্, তখন তোর মা'য়ের কথাও নিশ্চয় কিছু জানতে পেরেছিস, না?

—না, বামুন-গিন্নীকে কত জিজ্ঞাসা করিছি; তিনি কিছুতেই ব'লতে চান না, শুধু বলেন, তোর দাদুকে জিজ্ঞাসা করিস। তবে তিনি যেটুকু জানেন সেটুকু বলেছেন বটে!

—কি বলেছেন?

—বলেছেন, একদিন সন্ধ্যের পর নাকি তুমি বেড়িয়ে ফিরে আসছিলে। সেই সময় সাগরদীঘিতে একটি মেয়েকে ডুবে যেতে দেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় ঘরে তুলে এনেছিলে এবং শুশ্রূষা করে বাঁচিয়েছিলে! সে মেয়েটি এ অঞ্চলের নয়, কেউ তাকে চেনে না! তুমি তাকে নিরাশ্রয় অনাথ জেনে বাড়ীতে স্থান দিয়েছিলে এবং নিজের মেয়ের মতো আদর যত্নে রেখেছিলে।

—তারপর? সবই তো শুনেছিস দেখছি।

—তুমি যখন সে মেয়েটিকে বাঁচিয়েছিলে তখন তিনি নাকি সাতমাস গর্ভবতী ছিলেন। তিন চার মাস পরেই আমি এখানে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলুম। মা নাকি আমাকে এক বছরের মেয়ে তোমার হাতে ফেলে দিয়ে পরলোকে চলে গেছল। সেই থেকে তুমি আমায় বুকে করে মানুষ করেছো।

—তাই তো আর তোকে বুক থেকে নামাতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না 'নন্দ'!

—আচ্ছা দাদু, তুমি আমার নামও 'নন্দরাণী' রেখেছো কেন বলো না!

—সে খবরটা বুঝি বামুন-গিন্নী তোকে দেয় নি?

—না!

—তোকে যে অবিকল আমার সেই 'নন্দরাণীর' মতই দেখতে রে? অমনি ছিল তার চ'খের চাউনী, অমনি ছিল তার মিষ্টি গলা, ঠিক তোরই মতো হাসলে তার গাল দুটিতে টোল খেয়ে যেতো! তাই তো আমার মাঝে মাঝে মনে হয়—বুঝি সে-ই আজ আমার ঘরে নূতন হ'য়ে ফিরে এসেছে!

—ছাই! তাহ'লে তুমি কখনও আমাকে এমন করে তাড়াতে চাইতে না। আমি তোমার কাছ থেকে কেবল তোমার সেই 'নন্দরাণীর' নামটিই পেয়েছি বই তো নয়?

—আর ভালবাসাটা পাও নি বুঝি?

—সেটা স্বর্গে না গেলে কি আর পাবো?

—কিন্তু তার আগে যে আমি স্বর্গে চ'লে যাবো নন্দ!

—যে লোভে স্বর্গে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছো দাদু, কিন্তু এখন সে পরস্ত্রী মনে থাকে যেন!

—বড় বয়েই গেল! সেখানে কত উর্ব্বশী—মেনকা—রম্ভা—তিলোত্তমা রয়েছে—ভাবনা কি?

—বলি এখানেও তো অনেক উষারাণী উমারাণী লীলারাণী ছিল, তবে কেন সেই কায়েতদের মেয়ে নন্দরাণীর জন্য চিরজীবনটা একাদশী করে রয়েছো শুনি?

—তোর সঙ্গে বকতে বকতে অনেক বেলা হ'য়ে গেল—আমি চল্লুম; এর পর গেলে আর বেনোয়ারী বাবুর সঙ্গে

দেখা হবে না! ভাল পাত্রটি কি শেষে হাত-ছাড়া হ'য়ে যাবে?

দাদু চলে গেল, পিছন থেকে নন্দরাণী বলতে লাগ্‌ল—ভগবান করেন বেনোয়ারী বুড়োর সঙ্গে তোমার দেখা না হয়!

২

—কই রে নন্দরাণি! চল্‌ ভাই, নিয়ে যাই লগ্ন বয়ে যায়। সম্প্রদানের সময়ে হয়েছে—এই যে—বাঃ! চমৎকার দেখাচ্ছে ত! কে এমন সুন্দর করে তোমায় ক'নে সাজিয়ে দিলে নন্দ? বামুন-গিন্নী বুঝি? তা'নইলে এমন পাকা হাত কার! বেড়ে দেখাচ্ছে তো মুখখানি! এ যে আমারই বিয়ে ক'রে ফেলতে ইচ্ছে হ'চ্ছে! নাতজামাইয়ের দেখছি শুভদৃষ্টির সময়েই মাথা ঘুরে যাবে! ... ওকি? চোখ ছল ছল ক'রছে কেন, ইস্‌! এ যে টস্‌ টস্‌ ক'রে জল পড়ছে! ছিঃ ভাই, শুভদিনে কি কাঁদতে আছে?

—তোমার আপদ বালাই বিদেয় হ'য়ে যাচ্ছে—তোমার আজ শুভদিন বলে মনে হ'তে পারে দাদু, কিন্তু অন্য লোকের পক্ষে এটা যে শুভদিন নাও হতে পারে সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?

—আমারও চ'খের জল না দেখে বুঝি তুই ছাড়বি নি পোড়ারমুখী? ওরে আজ যে আমার কেবলই তার বিয়ের রাত্রের কথা মনে পড়ছে!—লক্ষ্মীদিদি চুপ কর, অনেক কষ্টে বুক বেঁধেচি! তার চোখের জলে যে আমার সব বাঁধ ভেঙ্গে চুরে ভেসে যাবে নন্দ!

এই সময় পুরোহিত ও পরামাণিক এসে ক'নেকে সম্প্রদানের জন্য নিয়ে যেতে তাড়া দিলে।

সালঙ্কারা সবস্ত্রা কন্যাকে ত্বরায় সম্প্রদানের জন্য নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেই সময় বেনোয়ারী বাবু নন্দরাণীর দাদুর কাছে গিয়ে কানে কানে কি বললেন, নন্দরাণীর দাদু একেবারে চটে আগুন হ'য়ে বলে উঠল—না বেনোয়ারী বাবু, তা কিছুতেই হ'তে পারে না। এ কি অন্যায় জুলুম আপনাদের? আমার যা-কিছু দেবার কথা ছিল তার অতিরিক্ত আমি দানে সাজিয়ে দিয়েছি! তার উপর হঠাৎ এখন এত রাত্রে আরও দু' হাজার টাকা আমি কোথায় পাই বল তো—

বেনোয়ারী বাবু বললেন—কিন্তু ওটা না দিলে যে এরা এখানে ছেলের বিয়ে দেবেন না বলছেন। বর তুলে নিয়ে চলে যাবেন—ভয় দেখাচ্ছেন।

পুরোহিত হেঁকে ব'ললেন—লগ্ন ব'য়ে যায়। কন্যা পাত্রস্থ করুন লোকনাথ বাবু, আর বিলম্ব করা চলে না।

লোকনাথ গর্জ্জে উঠে বললে—যাক্‌ লগ্ন ব'য়ে, আমি এ রকম অভদ্র ঘরে নন্দরাণীর বিয়ে দেবো না।

লোকনাথের এ কথা শুনে বরযাত্রীরা সব উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌ল!

বেনোয়ারী বাবু লোকনাথের পিঠ চাপড়ে বললেন—আঃ! কি পাগ্‌লামী ক'রছো লোকেন! এঁরা যে নন্দরাণীকে গ্রহণ করতে চাইছেন এইটেই তার ভাগ্য বলে মেনে নাও, দু' এক হাজার টাকাই কি তোমার কাছে বেশী হ'ল? মেয়েটার আখের-উমের নষ্ট হ'বে যে! ওর মায়ের কলঙ্ক-কাহিনী যে এঁরা সব জানতে পেরেছেন, এটা ভুলে যাচ্ছো কেন?

মুহূর্ত্তের জন্য একটু ইতস্তত করে লোকনাথ বলল—মিথ্যা কথা! ওর মা ছিল সতীলক্ষ্মী। তোমাদেরই মধ্যে কোনও দুর্ব্বৃত্ত তার সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। সে নিরপরাধিনী, কলঙ্ক তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

বরযাত্রীর দল অট্টহাস্যে উপহাস করে উঠ্‌ল।

বরকর্ত্তা এগিয়ে এসে গম্ভীর ভাবে বললেন—ও সব বাজে কথা আমরা শুনতে চাই নি, আপনি আরও দু' হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন কি?

লোকনাথ দৃঢ়কণ্ঠে ব'ললে—না। নির্দ্দিষ্ট পণের চেয়ে আমি আর এক কপর্দ্দকও বেশী দেবো না—

বাধা দিয়ে বরকর্ত্তা বললেন—টাকাটা আপনার কাছ থেকে বিবাহের পণ ব'লে তো আমরা দাবী করছিনি—এটা আপনাকে দণ্ডস্বরূপ দিতে হবে। আমাদের কাছে কন্যার সমস্ত পরিচয় গোপন ক'রে এক কুলটার মেয়েকে আপনি আমাদের ছেলের স্কন্ধে চাপাচ্ছিলেন—এ আপনার সেই অন্যায়ের জরিমানা।

বিবাহ-সভায় একটা হৈ চৈ পড়ে গেল একেবারে।

যেন মস্ত বড় কি একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'য়েছে ব'লে মনে হ'তে লাগল!

লোকনাথ একেবারে ক্রোধে অধৈর্য্য হয়ে উঠে বললে—কী!—আপনাদের যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা! এতদূর নীচ আপনারা!—যান, এখনি আপনাদের বর তুলে নিয়ে বেরিয়ে যান আমার বাড়ী থেকে,—নইলে অপমান হবেন—

চোর! জোচ্চোর! প্রতারক! প্রভৃতি সম্ভাষণে লোকনাথকে ভূষিত ক'রতে ক'রতে হট্টগোলের সঙ্গে বরযাত্রীর দল যখন বর ফিরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে—পুরোহিত কাতর হ'য়ে এসে লোকনাথকে বললেন, কি ক'রছেন? ফিরিয়ে আনুন শীগ্‌গির—অতি অল্পই সময় আছে,—এই রাত্রে—এরই মধ্যে আর দ্বিতীয় পাত্র কোথায় পাবেন? আজ রাত্রেই বিবাহ না দিতে পারিলে কন্যা যে পতিতা হয়ে যাবে!

লোকনাথ চম্‌কে উঠল! মিনতি ক'রে বললে—ঠাকুর! একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি অন্য পাত্র সংগ্রহ করে আনছি।

নন্দরাণী এতক্ষণ পাথরের মূর্ত্তির মতো নিশ্চল হ'য়ে বিবাহ-সভায় দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সে যখন দেখলে যে, লোকনাথ অন্য পাত্র সংগ্রহ ক'রে আনবার জন্য সত্যই শশব্যস্ত হ'য়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে—নন্দরাণী বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গিয়ে লোকনাথের পথরোধ ক'রে দাঁড়ালে,—রোদন রুদ্ধ কণ্ঠে বললে—দাদু, কখনই তুমি এমন ক'রে আর আমাকে অপমান করতে পাবে না! আবার যদি তুমি কোনও পাত্র খুঁজতে যাও, তা হ'লে ফিরে এসে কিন্তু আমায় দেখ্‌তে পাবে না! আমার মাকে তুমি সাগরদীঘি থেকে তুলে এনে বাঁচিয়েছিলে বটে, কিন্তু আমি তোমাকে সে সুযোগও দেবো না—এই বলে রাখলুম—

লোকনাথ একান্ত অসহায় ও নিরুপায়ের মতো কাতর দৃষ্টিতে নন্দরাণীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

একটু পরে নন্দরাণী যেন তার ফুঁপিয়ে ওঠা কান্না চেপে বললে—বিবাহের পরও যে আমার মায়ের চরিত্রে সন্দিহান হ'য়ে যে-কোনও লোক আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারে—এ কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন দাদু? ... সকলেই কি মনে করো তোমার মতো মাকে আমার নিরপরাধিনী বলে বিশ্বাস করতে পারবে?—

লোকনাথ শিউরে উঠ্‌লো।

পুরোহিত একটু কাছে এগিয়ে এসে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিলে—সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

লোকনাথ তথাপি আরও ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে তারপর দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বললে—ঠাকুর, আপনার প্রাপ্য নিয়ে আপনি এখন যেতে পারেন, আমি নন্দর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বিবাহ দিতে পারবো না।—

নন্দরাণীর বিশুষ্ক পাংশু মুখে এবার রঙীণ হাসি দেখা গেল, সে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে তার দাদুর দুই পায়ের উপর মাথাটি লুটিয়ে অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে প্রণাম করলে।

পাষাণ মানব

(ময়মনসিংহ গীতিকা—কেনারামের পালা অবলম্বনে)

শ্রীচন্দ্রকুমার দে

১

পরশমণির স্পর্শে রাং রূপা হয়। লোহা সোনা হইয়া যায়। মানুষের মধ্যেও এইরূপ স্পর্শমণির আবির্ভাব দেখা যায়। পাষণ্ডের ভাগ্যে সেই দুর্লভ স্পর্শ-সৌভাগ্য কচিৎ ঘটিয়া থাকে। কবিগুরু বাল্মীকির জীবনে একদিন এই স্পর্শযোগ ঘটিয়াছিল। এই স্পর্শগুণে দুরাত্মা দস্যু জগাই মাধাই ভ্রাতৃযুগল দেবতার আসনে স্থান পাইয়াছেন। আজ তাঁহারা জগতে একরূপ অবতার বলিয়া পূজিত। মহাপুরুষের পাদস্পর্শে দস্যু কেনারামের ভাগ্যে কিরূপে জীবন্মুক্তি ঘটিয়াছিল—প্রাচীন কবিগণ সেই ভক্তিমূলক উপাখ্যানভাগটি নিয়া এই পালা গান রচনা করিয়াছেন।

কেনারামের জন্ম

যশোধারা সংসারের সারসুখ পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত। এই দুঃখে তিনি পাড়াপরশী সঙ্গিনীগণের সঙ্গে ভালরূপে মিশিতে পারিতেন না। রাত্রে তাঁহার ভাল ঘুম হইত না। একদিন যশোধারা স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া এক অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি।

“চতুর্ভুজ ত্রিনয়নী পদ্মা মূর্ত্তিমান
দেবী আগমনে হইল ঘর উজালা
সুগোল সুঠাম অঙ্গ পাকা শবরী কলা
অষ্টনাগ সঙ্গে তার হেলায় দুলায়—
পদ্মের উপরে বইসা ধীরে ধীরে কয়।—”

দেবী আদেশ করিলেন—তুমি আমার পূজা কর তোমার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইবে।

যশোধারা বলিলেন, আমি অজ্ঞান অবলা, বলে দাও না মা, কি করিয়া তোমা’ পূজা করিতে হয়।

ঘুমের ঘোরে যশোধারার চক্ষের পাতা ভিজিয়া অশ্রুধারা ছুটিল। দেবী আদেশ করিলেন—

“আষাঢ় সংক্রান্তি দিনে লো শুন দিয়া মন।
উপাস থাকিয়া করলো ঘট সংস্থাপন॥
মণ্ডপেতে প্রতিদিন দিও ধূপ বাতি।
স্মরণে রাখিয়া মোরে প্রতি দিবারাতি॥
এইমতে একমাস করিয়া পালন।
শ্রাবণ সংক্রান্তি দিনে করহ পূজন॥”

রাত্রিতে স্বপ্নের কথা কহিতে নাই। শেষ রাত্রটা যশোধারার আর ঘুম হইল না। সকালবেলা উঠিয়া স্বামীর কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসটা তাহার দীর্ঘ দেহ লইয়া ধরা হইতে অবসর গ্রহণ করিল। আসিল আষাঢ় মাস। কাল মেঘে সারাটা আকাশ ছাইয়া ফেলিল। অপুত্রক দম্পতি ভাবিয়া চিন্তিয়া আষাঢ়ের শেষ সংক্রান্তি দিবসে ভক্তিমনে ঘটস্থাপন করিয়া বসিলেন। বৎসরের মধ্যেই যশোধারা এক পুত্র প্রসব করিলেন। পাড়াপরশী নবজাত শিশুকে দেখিতে আসিল। শিশুর গায়ের রং কালো,

বামুনের ঘরে কালো ছেলে অমঙ্গলের কথা। কিন্তু পরের কাছে যাহা ছাইকাল, মায়ের কাছে তাই কালমাণিক, কেলেসোনা। অল্পদিন পরে শিশুর নামকরণ হইল। দেবতার বরে কেনা এইজন্য যশোধারা পুত্রের নাম রাখিলেন কেনারাম। কিন্তু এই কেলেসোনাকে বুকে ধরিয়া মাতা অধিক দিন ধরাধামে টিকিয়া থাকিতে পারিলেন না। উপর হইতে তাহার ডাক আসিল। তারপর স্বামী-পুত্র রাখিয়া সেই সধবা সিমন্তিনী ললাটের সিন্দুর বিন্দুটি আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া নদীসৈকতে শয্যা পাতিয়া শুইলেন। অঞ্চলের ধন কালমাণিকটি বাল্যজীবনে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিল।

গৃহ-শূন্য উন্মত্ত পিতা মাতৃহীন শিশুকে কোলে করিয়া দেবীপুরে উপস্থিত হইলেন। এই গ্রামে কেনারামের মাতুলালয়। মাতুল শিশুকে আশ্রয় দিলেন। পত্নীর মৃত্যুতে কেনারামের পিতার মনে সংসারের প্রতি এমনই একটা বৈরাগ্য আসিয়াছিল যে, তিনি আর ঘরে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিলেন না। আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কিছু কালের জন্য তীর্থ যাত্রা করিলেন। সেই যাত্রাই তাঁহার মহাযাত্রা হইল। তিনি আর ফিরিলেন না।

দেশে বড় আকাল পড়িয়াছে। ছয় মাস ধরিয়া মাটির বুকে এক ফোটা বৃষ্টিও পড়ে নাই। আউস ধান জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে অতি বর্ষণে শীলাবৃষ্টিতে সালিধান সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গৃহস্থেরা তার কণাটিও গৃহে তুলিয়া আনিতে পারে নাই। ক্ষেতে অবশিষ্ট যাহা ছিল আষাঢ়ের নূতন জল রাক্ষসের মত আসিয়া সব গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। অতি বর্ষণে শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিনেও জল কমিল না সুতরাং হৈমন্তিক ধানের আশাও সমূলে নষ্ট হইয়াছে। মানুষ গাছের পাতা ও নল খাগড়া চিবাইয়া খাইতে লাগিল—তাতে কতদিন বাঁচে! গরু বাছুর লাঙ্গল বেচিল। স্ত্রী, পুত্র বেচিল—এই দারুণ দুর্দ্দিনে কেনারামেরও ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল। নির্দ্দয় মাতুল মাত্র পাঁচ কাঠা সালিধান্য বিনিময়ে তাহাকে পরের হাতে সঁপিয়া দিলেন। মাতুল পরের ছেলেকে বিকাইয়া যাহা পাইলেন তাই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি কেনারামকে কিনিয়া লইয়া গিয়াছিল—তাহার নাম হাপুয়া। হাপুয়া দস্যুদলের সর্দ্দার। তার সাত পুত্র। কেনারাম তাহাদের দলে মিশিয়া অল্পদিন মধ্যেই সর্দ্দারের পদে অধিষ্ঠিত হইল।

> 'কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার পর্ব্বত প্রমাণ
> রাবণের মত হইল অতি বলবান।'

সূতিকাগারে কৃষ্ণবর্ণ শিশুকে দেখিয়া প্রতিবাসিনীরা যে যে অনুমান করিয়াছিল তাহা মিথ্যা হইল না। কেনারাম পূর্ব্ব মৈমনসিংহের নলখাগড়ার বনে—দুর্দ্দান্ত মহিষাসুরের মত বিচরণ করিতে লাগিল। এক্ষণে কেনারামের নাম শুনিলে বর্ষার দরিয়া শুকাইয়া যায়। পাষাণের দেহ রোমাঞ্চিত হয়।

২

একদিন চৈত্রমাসের অপরাহ্ন বেলায় একদল ভাসান গায়ক ভয়ে ভয়ে প্রান্তর-পথ অতিক্রম করিতেছিল। ভয়ে ভয়ে, কেন না তদানিন্তন দেশের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। লোকসংখ্যা ও বসতি অতি বিরল ছিল। যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া দীর্ঘ প্রান্তর হেমন্তের বৃক্ষলতা সমাবৃত নল খাগড়ে আচ্ছাদিত মহাবনে পরিণত হইত, আবার গ্রীষ্মাবসানে সেই বিপুল বনভূমি বর্ষার জলে দিগন্ত পর্য্যন্ত ডুবিয়া মহাসাগরের মত কল্ কল্ করিত। সমধিক উচ্চভূমিতে বহুলোক এক সঙ্গে মৌমাছির ন্যায় বাস করিত। এই রূপ বসতিকে লোকে সেকালে "আটী" বলিত। পরিণয়াদি যাহার যাহার আটিতেই সম্পন্ন হইত। দু'চার মাইল দূরের এক আটীর লোক অন্য আটীর লোককে চিনিত না। অথবা চিনা দিতে ইচ্ছাও করিত না। লোক চলাচলের তেমন রাস্তাঘাট ছিল না। প্রকাশ্য রাস্তা অপেক্ষা গোপনে জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলাফেরা করার রীতি ছিল। বড় বড় বৃক্ষতল মনুষ্যের অতিথিশালা ছিল। তেমন বৃক্ষ অধুনা আর দেখা যায় না। দূরদেশে যাইতে হইলে পান্থগণ প্রায়ই বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিত। প্রাণান্তেও কেহ কোন গৃহস্থের বাসভূমিতে আশ্রয় লইত

না, পাছে গৃহস্থ নিদ্রিত পান্থের বুকে ছুরি বসাইয়া ধন প্রাণ হরিয়া লয়, আবার গৃহস্থও কোন দিন স্বীয় বাসভবনে অতিথিকে আশ্রয় দিত না, পাছে সেই অতিথি দস্যুরূপ ধরিয়া গৃহস্বামীর ধন প্রাণ লুণ্ঠন করে। রাজ্য একরূপ অরাজক ছিল। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না। মানুষ দস্যুর নামান্তর ছিল মাত্র। দূরদেশে যাইতে হইলে জীবনের আশা ছাড়িয়া দিতে হইত। মাসাধিক পূর্ব্ব হইতে আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়া শুরু হইত। যাত্রার দিন মহাযাত্রার ন্যায় কান্নাকাটির রোল পড়িয়া যাইত। ডাকাত দেশের সর্ব্বময় প্রভু ছিল। লোক টাকা পয়সা মাটীর নীচে রাখিত। কিন্তু তাহাও নিরাপদ ছিল না।

> "টাকা পয়সা রাখে লোক মাটিতে পুতিয়া
> ডাকাত কাড়িয়া লয় গামছা মোড়া দিয়া।
> ডাকাত দেশের রাজা-বাদশায় না মানে,
> উজার হইল রাজ্য কাজীর শাসনে।
> দৈচ্ছত পাইয়া সবে ছাড়ে লোকালয়,
> ধনে প্রাণে মরে প্রজা চন্দ্রাবতী কয়।"

দেশের অবস্থা যতই অরাজক হউক না কেন, মানুষ তখন একেবারে অসুখী ছিল না। পেটের দায়ে লোকে এক্ষণে যেমন উঠান পর্য্যন্ত চষিয়া খায়, তখনকার অবস্থা তেমন ছিল না। ভূমি প্রচুর শস্য দান করিত, অতি সামান্য মাত্র স্থানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত। পালিত পশুর সংখ্যা অত্যধিক ছিল—গরুতে প্রচুর দুগ্ধ দান করিত, দুধের কোনও মূল্য ছিল না, চাহিলেই পাওয়া যাইত।

> "বাথানে মহিষ আর পালে যত গাই,
> কত সে চড়িত তার লেখা জোখা নাই।"

সেই বিপদসঙ্কুল সময়ে গায়কগণ ধীরে ধীরে প্রান্তর-পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। তাঁহাদের কাহারও হাতে মৃদঙ্গ, কাহারও হাতে করতাল, কাহারও হাতে একতারা; সকলেরই বেশভূষা সন্ন্যাসীর মত। ইহাদের মধ্যে যিনি দলের নায়ক, তাঁহারই উপর সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি নিশীথ-যজ্ঞানল শিখার ন্যায় উজ্জ্বল, প্রশান্ত মহাসাগর তুল্য অচঞ্চল। যেমন শান্ত, তেমনি গম্ভীর। মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল জ্যোতি বিভাসিত। বিশাল ললাটে চন্দন-পুণ্ড্র, দেখিলেই মহাপুরুষ বলিয়া ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। মনে হয় সশিষ্য দুর্ব্বাসা যেন অতিথি বেশে পাণ্ডবসদনে চলিয়াছেন।

বিশাল প্রান্তর পুতনা রাক্ষসীর মতন যোজনব্যাপী দেহ লইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, দিগন্তে বনরাজিনীলা কালো পাহাড়ের মত আকাশ প্রান্তে মিশিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে মঞ্চোপরি বসিয়া কৃষক-শিশু গান ধরিয়াছে। সালিধান্য প্রায় পাকিয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে বিশাল প্রান্তর-তরু ক্ষুদ্র বনের পিতৃতুল্য সুদীর্ঘ, সুপক্ক, শোভাময়, তাহাতে বসিয়া প্রকৃতির পোষমানা পাখী সকল গান গাহিতেছিল—তাহা সরল, সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী ও ভাবময়।

গায়কগণের মধ্যে কেহ কেহ সেই তানে তান মিলাইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্যের বিপুল দূরতা মুক্ত করিয়া দেবতা ও মানুষের মাঝখানে একটি মিলন-রেখা টানিয়া দিতেছিল। ক্রমে তাঁহারা একটি নিবিড় বনের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময় সহসা পার্শ্ববর্ত্তী নল খাগড়া বন নড়িয়া উঠিল, পাছে কোনও হিংস্র জন্তু তাঁহাদিগকে দল বাঁধিয়া আক্রমন করে, সেই ভয়ে সকলেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কোথায় হিংস্র জন্তু! সহসা একদল বন্য লোক আসিয়া তাঁহাদিগের চারিদিক ঘেরাও করিল। দস্যুদিগের প্রত্যেকের হাতে শাণিত খাণ্ডা, পরিধানে মালকোচা ধুতি, যেমন দৃঢ় দেহ, তেমনি বলিষ্ঠ চেহারা; তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দলপতি সে দেখিতে একটি কালো পাহাড়ের মত; দীর্ঘ দেহ, সুদৃঢ় মাংসপেশী, আজানুলম্বিত ভুজ, দীর্ঘ নাসিকা, বিশাল ললাটের উপর যেন নরহত্যা নাম লেখা রহিয়াছে। সুদৃঢ় বক্ষস্থল যমপুরীর কবাটের মত দয়ামায়া শূন্য, নিরেট পাষাণ।

দলপতি অগ্রসর হইয়া বলিল—চিনতে পারছ আমরা কে?

মহাপুরুষ বলিলেন—বিষধর সর্পকে কে না চেনে? বেশ চিনেছি, তোমরা নরহন্তা দস্যু!

দস্যুপতি বলিল—তবে দাও সঙ্গে যা আছে—টাকা কড়ি।

মহাপুরুষ বলিলেন—কিছুই নেই, এই কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় মাত্র।

দস্যু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—সে কি! বাড়ী বাড়ী গান গেয়ে ফির, পয়সা পাও নি?

মহাপুরুষ বলিলেন—গান শুনে পয়সা দিবে এ অঞ্চলের লোক আজও তেমন হয় নি; দেবতার লীলা গেয়ে সবে মানুষের মন গলাবার চেষ্টা করছি মাত্র।

রুক্ষ স্বরে দলপতি বলিল—তা হোক, কিছু চাই নে, নরহত্যায় নরহত্যাই পরমানন্দ। আমরা তোমাদিগকে হত্যা করব।—জয় মা কালী! জয় মা শ্মশানকালী!

দস্যুগণের বিকট করতালি ও হুঙ্কারে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইল।

মহাপুরুষ বলিলেন—সাধু! নরহত্যা মহাপাপ, তা তুমি জান না?

বিকট হাসিয়া দস্যুপতি বলিল—পাপ? নরহত্যা পাপ? নরহত্যা যদি পাপ হয়, তাহলে আমার পাপ ওজন করলে পৃথিবীর চাইতে অধিক হবে। জীবনের তিন ভাগ নরহত্যা করে কাটিয়েছি, এই অল্প কয়েক দিনের জন্য তোমার কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা করব? আমি পাপ-পুণ্য মানি নে।

মহাপুরুষ বলিলেন—সাধু, তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

আবার সেই হাসি। প্রান্তরের পশু-পক্ষী কাঁপিয়া উঠিল—হো হো! আমাকে চেন না? আমি কেনারাম!

নাম শুনিয়া যেন গাছের শুক্‌নো পাতা ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। ডালের পাখি সভয়ে পালাইল। ভীত ত্রস্ত ভাবে অন্যান্য গায়কগণ পেছন ফিরিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ হয় সশরীরে কৃতান্তকে দেখিলেও তাঁহারা এতদূর চমকিত, এমনিধারা ভয়ত্রস্ত হইতেন না। সকলেরই মুখ শুকাইয়া উঠিল। মহাপুরুষ কিন্তু স্থাণুবৎ অচল, অটল, হিমাদ্রি-শৃঙ্গবৎ অকম্পিত। কেনারাম চমকিত হইয়া বলিল—সে কি ঠাকুর! বসুন্ধরার যদি চেতনা থাকত, তা হলে সেও আমার নামে শিউরে উঠত, আর তুমি ঠাকুর, একটুকুও চমকালে না?

মহাপুরুষ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—ভয়? জীবনে ভয় কাকে বলে জানি নে, আমি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় করি নে, তোমাকে ভয় করব?

কেনারাম তাঁহার সহাস্য বদনমণ্ডল, প্রশান্ত চন্দন-চর্চ্চিত চিন্তাবর্জ্জিত ললাটের দিকে চাহিয়া যেন বিস্মিত ভাবে বলিল—ঠাকুর, তুমি কে?

ঠাকুর বলিলেন—আমি ব্রাহ্মণ।

কেনারাম বলিল—তা' ত দেখছি, নাম বল না।

উত্তর হইল—দ্বিজ বংশী।

নিস্তব্ধ প্রান্তরের উপর দিয়া বায়ু হা হা করিয়া বহিয়া গেল। কেনারাম আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—ঠাকুর, তুমি কি দ্বিজ বংশী? তোমার গানেই না নদী উজান বয়, পাষাণ গলে যায়, আকাশের মেঘ কেঁদে বর্ষে?

মহাকবি বলিলেন—পাষাণ গলান সহজ কথা, কিন্তু মানুষ যদি একবার পাষাণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাকে গলান তেমনি কঠিন হয়ে পড়ে।

কেনারাম বেশ বুঝিতে পারিল, এ কথা কেবল তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে, বুঝিয়াও কোন উত্তর দিল না, মুগ্ধভাবে মহাপুরুষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন—কেনারাম, তুমি ধন নিয়ে কি কর?

কেনারাম বলিল—কি করব?

ঠাকুর বলিলেন—ভোগ কর, না, পরকে বিলাও?

কেনারাম বলিল—কাকে বিলাব, বাঘ ভালুককে? ওঁরা ধন নিয়ে কি করবে ঠাকুর!

মহাপুরুষ উত্তর করিলেন—কেন দরিদ্রকে?

কেনারাম বিরক্তির সহিত বলিল—দরিদ্রকে দান করব? দেখ ঠাকুর, ধন পেলে দরিদ্র আর দরিদ্র থাকবে না। সে তখন অহঙ্কারী, অবিনয়ী—ধরার কলঙ্ক-স্বরূপ হবে। ধনে লোভ, লোভে মত্ততা। আমি ধন-

লোভে মত্ত হয়ে যে কুকার্য্য করছি, তার জন্য নিজেকে নিজেই অনেক সময় ধিকার দিই।

মহাপুরুষ বলিলেন—তবে ভোগ কর।

কেনারাম বলিল—তাই ভাবি, যে ধন উপার্জ্জন করেছি, বসে বসে খেলে সাত পুরুষেও ফুরাবে না। কিন্তু লোভের এমনি টান, তবু কেবল উপার্জ্জনই করছি। ভোগ করবার অবসর কোথায়?

ঠাকুর বলিলেন—তবে কর কি?

কেনারাম বলিল—যার ধন তার কাছে লুকিয়ে রাখি।

ঠাকুর আবার বলিলেন—ধন কার?

কেনারাম বলিল—কেন?—বসুন্ধরার ধন বসুন্ধরার কাছে লুকিয়ে রাখি।

ঠাকুর—তাতে লাভ কি?

কেনারাম—লাভ ক্ষতি আমি ঠাকুর, জানি নে। দেশে এত এত ধনী রয়েছে, তাদের ধনে কাঙাল গরীবের কি লাভ হচ্ছে? কথায় কথায় অনেকটা সময় বয়ে গেল। এইবার ঠাকুর, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

মহাকবি বলিলেন—কেনারাম, একটু সবুর কর, আজ আমার জীবনের শেষ দিন, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছি, একবার জন্মশোধ গেয়ে নিই এই জীবনের শেষ গান।

কেনারাম বলিল—তবে গাও ঠাকুর, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আবার খাণ্ডা হাতে না নিই।

তখন—

"আকাশ চাঁদোয়া হইল, শুনে পশু পাখী
কেনারাম বসিল হাতের খাণ্ডা রাখি,
উড়ে যায় পাখী আসি বসিল ডালেতে
মনসা ভাসান গায় অঙ্গনার সুতে।"

বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দূর্ব্বাদলের গালিচা পাতা, তার উপর কেনারাম দলবল সহ বসিয়া গেল। গীত আরম্ভ হইল। আজিকার এই গান ইহজীবনের শেষ গান। তাহার প্রতি কথায়, প্রতি অক্ষরে, অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। শ্রোতা গায়ক সকলেরই মন গলিয়া গেল। আজিকার এই গান কেনারামের জন্য নহে—এ মর জগতের জন্য নহে, আকাশ প্রান্তর প্লাবিত করিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে পিছন ফেলিয়া গায়কের কণ্ঠস্বর বিধাতার সিংহাসনতল পর্য্যন্ত পৌঁছিল। সন্ধ্যা মিলাইয়া গেল, নীল চন্দ্রাতপ-তলে হীরার ঝাড় জ্বলিতে লাগিল। অন্ধকার যখন ঘনীভূত হইয়া আসিল তখন প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া দস্যুগণ মশাল জ্বালিয়া দিল।

গীত চলিল।—

ঐশ্বর্য্যের উচ্চচূড়ে প্রতিষ্ঠিত মহারাজ চন্দ্রধর। তার ছয় পুত্র, চৌদ্দডিঙ্গা, জলে স্থলে অক্ষুণ্ণ প্রভাব। সে রাজবতী চম্পক, দেবতারও আকাঙ্ক্ষিত। এত রূপ-সৌভাগ্য জগতে আর কাহারও নাই। শত শত সামন্ত রাজা তাঁহার আজ্ঞাবহ দাস। দাম্ভিক অঘোরপন্থী চিরনির্ব্বিকার হৃদয় মহারাজ চন্দ্রধর, অদ্বিতীয় রাজ রাজেশ্বর।

পরক্ষণেই আবার এ কি? মহাস্রোতে চন্দ্রধরের সেই ষড়ৈশ্বর্য্য কোথায় ভাসিয়া গেল। চির-চঞ্চলা লক্ষ্মী তাঁহার ধনরত্ন সুখ সৌভাগ্য লইয়া পলাইয়া গেলেন। হতভাগ্য চন্দ্রধরের ছয় পুত্র মরিল, চৌদ্দডিঙ্গা ডুবিল, একুশরত্ন ভাঙ্গিয়া পড়িল। কোথায় গেল সেই রূপ সৌভাগ্য? মহাস্রোতে নিপাতিত বালীর বাঁধের মত দেখিতে দেখিতে কোথায় ভাসিয়া গেল। রাজবতী অমরবাঞ্ছিত চম্পক আজ শ্মশান। সামন্তপতি চন্দ্রধর আজ পথের ভিখারী। ঝরে পড়া ফুলের মত রহিল কেবল তাঁহার ছয়টি বিধবা পুত্রবধূ। ঐ দেখ ধীরে ধীরে বাণিজ্যলক্ষ্মী আবার চন্দ্রধরের অঙ্কগতা হইলেন, সপ্ত সমুদ্র চন্দ্রধরকে আবার ভাণ্ডার ভরিয়া ধনরত্ন দান করিল, কমলা আবার রত্নভাণ্ডার জমকাইয়া বসিবেন। অভ্রভেদী একুশরত্ন আবার সূর্য্যকিরণের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল, অসীম সমুদ্রও তাঁহার প্রভাবে সসীম। বায়ু তাঁহার আজ্ঞাবহ, বাণিজ্যলক্ষ্মী তাঁহার করতলগত। সুখ যখন আসে, তখন মানবের কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকিতে দেয় না।

শ্মশানে আবার ফুল ফুটিল। একদিন পূর্ণিমার চাঁদের মত একটি নবকুমার পাটেশ্বরী সনকার শূন্য অঙ্ক জুড়িয়া

বাজিল। হুকার* ও মঙ্গলগীতে আবার চন্দ্রধরের নবনির্ম্মিত পুরী মুখরিত হইয়া উঠিল।

আবার সেই কালস্রোতের টানে সব ভাসিয়া গেল। যুবরাজ লক্ষীন্দর সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলেন, কোথায় রহিল তাঁহার লোহার মাজস! দাম্ভিক রাজা আগে বুঝিতে পারেন নাই যে, জগতে কালের অগোচর কোন পদার্থই নাই।

"দ্বিজ বংশী গায় গীত, বেউলা হইল রাড়ী,
কেনারামের চক্ষের জলে বহে দরদরি।
যখন গাহিল পিতা বেহুলা ভাসায়,
হাতের খাণ্ডা ভুমে থুইয়া কান্দে কেনারাম।"

পাষাণ গলিয়া গেল, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, দস্যুগণের মশাল জলিয়া জলিয়া আপনা হইতেই নিবিয়া গিয়াছে, আকাশের হীরার ফুল শিশিরাকার দূর্ব্বাবনের উপর ঝাড়িয়া পড়িয়াছে। কেনারাম বলিল- ঠাকুর, তোমার গান অমূল্য, বুঝি দেবতার ভাণ্ডারেও তাহার মূল্য মিলবে না। আমি তোমাকে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিব, যদি দস্যু বলে ঘৃণা না কর—কিন্তু জেনো আজ হতে আর আমি দস্যু নই, সে খাণ্ডা ত্যাগ করেছি, ইহজীবনে আর তা গ্রহণ করব না।

প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া দস্যুগণ বনভূমি হইতে ঘড়ায় ঘড়ায় ধন বহিয়া আনিতে লাগিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে কেনারাম কুবেরের ভাণ্ডার সাজাইয়া বলিল—ঠাকুর এই নাও।

মহাপুরুষ দস্যুর রক্তমাখা ধনভাণ্ডার হইতে চকিত দৃষ্টিতে নয়ন ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন—কেনারাম, তোমার এ ধন বসুন্ধরার অঙ্কেও স্থান পাবে না, এ মহাপাপের ধন নিয়ে আমি কি করব! তোমার ধন তুমিই নাও, গৃহস্থের মুষ্টিভিক্ষাই আমার পক্ষে স্বর্ণ মুদ্রা।

কেনারাম অনেকক্ষণ নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, সে যেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার জন্মার্জ্জিত পাপের সংখ্যা এক দুই করিয়া গুণিতেছিল। তাহার বিশাল ললাটে আত্মগ্লানির বিষম জ্বালা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—তবে চল ঠাকুর, আজ আমার সারাজীবনের অর্জ্জিত ধনের সদ্ব্যবহার করব।

(৩)

বিপুল জলরাশি লইয়া ভৈরব কল্লোলে মহানদী ফুলেশ্বরী (বর্ত্তমান ফুলিয়া) বহিয়া যাইতেছে। মহাস্রোতে ঐরাবত ভাসিয়া যায়। ঐ দেখ কেনারাম তাহার জীবনের উপার্জ্জিত সমস্ত ধনরাশি মহাস্রোতে একে একে ভাসাইয়া দিতেছে, কত টাকাকড়ি মোহর জহর, কত ছিন্নকণ্ঠা কামিনীর রত্নালঙ্কার একে একে সব ভাসিয়া গেল। কেনারাম তাহার নরঘাতী ভীষণ খাণ্ডা মহাস্রোতে ফেলিয়া দিয়া বলিল—ঠাকুর, সব বিসর্জ্জন দিয়েছি, বাকী মাত্র এই জীবন, দাঁড়াও ঠাকুর, আজ তোমার সম্মুখে তোমার ঐ পুণ্যময় দেহ দেখতে দেখতে কেনারাম তার জীবনস্রোত এই মহাস্রোতে মিশাবে। ঠাকুর,

'পাঁচ কাঠা সাইল ধান কিস্মত আমার
কুসঙ্গে মজিয়া হইনু এত দুরাচার।'

মহাকবি বাধা দিয়া বলিলেন—কেনারাম, আর তোমাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হবে না। তোমার জীবনের দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হল। সে নরঘাতী দস্যু কেনারাম আর নেই। ফুলেশ্বরীর জলে ডুবে মরেছে। পুণ্যস্রোতে অবগাহন করে এসো, আমি তোমাকে মুক্তি মন্ত্র দান করব। আজ হতে তুমি আমার প্রিয়তম শিষ্যমধ্যে গণ্য হলে।

কেনারাম স্নান করিল, পুণ্যস্রোতে যেন তাহার পাপজীবনের সমস্ত কলঙ্ক ধৌত হইয়া গেল; মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আকৃতিরও সহসা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিল। এইরূপে মহাপুরুষ-সংস্পর্শে কেনারাম অচিরেই নবজীবন লাভ করিল, এবং মহাকবির প্রিয়তম

---

* হুকার শব্দটার অর্থ বোধ হয় জয় জয়কার। পূর্ববঙ্গে হুলুধ্বনিকে হুকার বলে।

শিষ্য ও সুকণ্ঠ গায়ক বলিয়া দিন দিন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে লাগিল। তারপর প্রভুর সমস্ত সদ্‌গুণরাশির অধিকারী হইয়া একদিন—

> 'কেনারাম কহে প্রভু ঘরে যাও তুমি
> চাউল কড়ি যাহা পাই লয়ে আসি আমি।'

মহাকবি তাঁহার জীবনের সমস্ত কার্য্যভার কেনারামের উপর অর্পণ করিয়া ঘরে গেলেন, কেনারাম গ্রাম ঘুরিয়া "মনসা ভাসান" গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে কেনারামের নাম শুনিলে লোকে প্রাণভয়ে শিহরিয়া উঠিত, সেই কেনারামের গানে আজ সমস্ত দেশ পুলকে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল।

> 'এইরূপে ভাসান প্রচারে ঘরে ঘরে,
> পাষাণ গলিয়া জল বহে শতধারে।
> কেনারাম গান গায় ঝরে বৃক্ষের পাতা
> পয়ার প্রবন্ধে ভনে দ্বিজ বংশী-সুতা।'

যে প্রান্তরে মহাকবি দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহার নাম 'জালিয়ার হাওর।' সেই বিশাল প্রান্তর ময়মনসিংহ জেলায় আজও বর্ত্তমান আছে, কবি চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন—

> 'জালিয়া হাওর নাম ব্যক্ত ত্রিভুবন,
> দিনেকের পথজুড়ি নলখাগড়া বন॥
> ভাসান সহিতে পিতা যান দেশান্তরে,
> পথে পেয়ে কেনারাম আগুলিল তারে।'

'দস্যু কেনারামের পালা' এতদঞ্চলে একটি কৌতুহলপূর্ণ ঘটনা। সুকণ্ঠ গায়কগণ আজও কেনারামের পালা গাহিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করেন। ইহার সঙ্গে দেশের বহুকালের বিগতস্মৃতি বহুপরিমাণে জড়িত আছে। আজ আমরা তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস প্রদান করিলাম।

মন্থন

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

ঘাটশিলায় পিতলের একটা কারখানা খোলা হইতেছে মামার মুখে শুনিলাম। ভিতরের অস্থির যাযাবরটি সেই মুহূর্ত্তেই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শুনিয়াছিলাম, মামার কোনো দূর সম্পর্কের শ্যালক সেখানকার মাননীয় বাসিন্দা। কিছুকাল আগে ইঞ্জিনিয়ার এবং কণ্ট্রাকটার-হিসাবে ইহার সবিশেষ খ্যাতি ছিল। এখন কাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া সেইস্থলে বসবাস করিতেছেন। বয়স বেশী না হইলেও পয়সাটা খুবই বেশী হইয়াছিল। সেই কারণেই নিষ্কর্ম্মা সাজিয়া বনবাস করিতেছেন।

মামাকে ধরিয়া একটা চিঠি লিখাইয়া লইলাম।—শচীশ আমার ভাগ্নে, অবশ্য অবশ্য একটা চাকুরী করিয়া দিবে, তোমরা না দেখিলে ইত্যাদি।

অনেক দিন হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকায়, নিজের উপর বিরক্তি ধরিতেছিল। তাই নিশ্চিত বন্ধনমুক্তির লোভে দেহমন নাচিয়া উঠিল।

পরদিন ঘাটশিলা যাত্রী এক ট্রেণের কক্ষে উঠিয়া বসিলাম। মামা ট্রেনভাড়া বাবদ দশটি টাকা হাতে দিয়াছিলেন। এক কৌটা ষ্টেট এক্সপ্রেস এবং শ্রীকান্তর তৃতীয় পর্ব্ব একখণ্ড কিনিতে হইল।

ঘাটশিলায় পৌছিতে রাত হইয়া গেল। ষ্টেশনে কুলী বা গাড়ীঘোড়ার বালাই নাই। ষ্টেশনের অদূরেই মাঠ সুরু হইয়াছে; তার পরপারে কুয়াসাবৃত অস্পষ্ট গিরিশ্রেণী। রাতের অন্ধকারের মধ্যে পাথর-গাঁথা ষ্টেশনটি স্তব্ধ হইয়া আছে। মাষ্টার মহাশয়ের সহিত বহুবিধ সওয়াল-জবাবের পর ইঞ্জিনীয়ার নবীন চৌধুরীর বাসভবনের সন্ধান মিলিল।

বাংলো ফ্যাসনের সুন্দর বাড়ী। ভিতরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই চৌধুরী মহাশয়ের সহিত দেখা হইয়া গেল।

মামার চিঠিখানি দাখিল করিয়া দিলাম। ...

চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া নবীন কহিলেন, ওহ্ গড্! তুমি বিলাসের ভাগ্নে? ··· এস, এস ...

আসিবার উদ্দেশ্য চিঠিতে লেখাই ছিল। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নোত্তর হইল না।

বিলাস কোথায় আছে, উপস্থিত কি করচে, ননী—বিলাসের স্ত্রী, অর্থাৎ আমার মামী, কেমন আছে এই সব অপরিহার্য্য প্রশ্নাবলী শেষ হইলে বলিলেন, ফ্যাক্টরী শেষ হ'তে এখনো দেরী লাগ্‌বে। আমিই কন্ট্রাক্ট নিইচি। এরি মধ্যে লোক নেয় বলে মনে হয় না।

··· তা হ'ক, কাল একটা এ্যাপ্লিকেশন লিখে দিও ... কাজ হয় ভালই, না হয় নতুন একটা জায়গা—দেখে শুনে ··· যবে হ'ক গেলেই চলবে।

উভয়ে পাশাপাশি আহারে বসিয়াছিলাম। বলিলেন, খাওয়া-দাওয়ার বড্ড অসুবিধে এ সব জায়গায়। চালের মধ্যে কাঁকরের ভাগই বেশী, কাজেই ওটা কলকাতা থেকে আনিয়ে নিতে হয়। মাছ মেলে না; মাংস মেলে—দুই ক্রোশ হেঁটে গেলে। সুতরাং খাওয়ার খুবই কষ্ট হ'বে।

বলিলাম, কলকাতার মেসে আমরা এর চেয়ে ভাল খাইনে।

নবীন ঈষৎ উৎসাহিত কণ্ঠে কহিলেন, রান্না কেমন লাগচে?

বলিলাম, চমৎকার ...! কলকাতার রাঁধুনী বোধ হয়—?

নবীন চৌধুরী ক্ষুব্ধ হইলেন। কহিলেন, রামঃ! রাঁধুনী এমন রাধতে পারে! এ স্বয়ং শ্রীহস্তের ...'

নবীন অন্তঃপুর নির্দ্দেশ করিলেন।

মনে মনে বিস্মিত হইলাম। আসিবার পূর্ব্বদিনও মামার নিকট শুনিয়াছি নবীন বিপত্নীক। ঐ পর্য্যন্ত আর দারপরিগ্রহ করেন নাই।

নবীনের শয়নগৃহেই আমাদের আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। দেখিলাম প্রশস্ত শুভ্র শয্যার উপর রাশীকৃত যুঁইয়ের মত ঘুমন্ত শিশু।

শিশুর চোখ মুখ বর্ণের প্রতি চাহিয়া এক অদেখার রূপের রেখা আঁকিতে লাগিলাম।

ভৃত্য শয্যা প্রস্তুত করিতেছিল—

জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবুদের দেশের লোক বুঝি?

গোবিন্দ জবাব দিল, না; মায়ের বাড়ীর নিকটেই আমাদের গাঁ। গরীব দুঃখী মানুষ দেখে মা এবার সঙ্গে করে নিয়ে এসেচেন, বাবুকে বলে একটা চাকুরি বাহাল করিয়ে দেবেন।

এখন কি করো?

ঘরদরজা পরিষ্কার করি, বিছেনাটা ঝাড়ি। বাঁ হাতটা অকেজো, ভারী কাজ সহ্য হয় না।

অল্পকালের মধ্যেই আমাদের আলাপ পাকা হইয়া গেল।

গোবিন্দ কহিল এই মাস কয়েক পূর্ব্বে সে বিবাহ করিয়াছে। কথাবার্ত্তায় অনুমান করিলাম তার পরিণীতার বয়স এখনো নয় উত্তীর্ণ হইবার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করে নাই। এই বিবাহে তার তিন কুড়ি দশ টাকা দেনা হইয়াছে। অথচ জমীটুকুও এবার শত্রুতা করিতেছে—ফসল দিতে নারাজ। এ অবস্থায় সুবিধামত একটা কাজ মেলে তবেই—

নিজের চাকরী পাওয়ার অনিশ্চিত সুদূরতা সম্বন্ধে মনে মনে যথেষ্ট সজ্ঞান থাকিলেও মুখে নিশ্চয়তার আলোক

আনিয়া গোবিন্দকে বলিলাম, চাকরী নিশ্চয় মিলবে গোবিন্দ ; তোমারও, আমারও।

তখন আমরাই এক একটা এই ফ্যাসানের বাংলো তৈরী করব, তোমার আমার মত এমন ক'জন চাকরই থাকবে আমাদের—

গোবিন্দ হাসিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য এটি সে পরিহাসই মনে করিয়াছে। কিন্তু আমি সত্যই পরিহাস করি নাই। মনে মনে এ ছবি ত' এর আগেও কতবার আঁকিয়াছি।

ভোরে উঠিয়া দেখি সমুখের প্রশস্ত ময়দানে কাল রাত্রির সেই ছেলেটি কাঠের ব্যাট-বল লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে।

আমি ঘরের বাহির হইতেই ছুটিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি কে?

আমি কে!

সহসা সৃষ্টির কঠিনতম একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না ; মীমাংসাও করিতে পারিলাম না।

পুনরায় প্রশ্ন হইল, তোমার নাম কি ?

বাঁচিয়া গেলাম। কোনোমতে আপনার নামটা শুনাইয়া পাল্টা প্রশ্ন করিলাম, তোমার নামটি ?

আমার নাম ?—কাঁচা।

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাঁচা একছুটে দৃষ্টির বাহিরে সরিয়া গেল।

অন্যমনস্কের মত দাঁড়াইয়াছিলাম একভাবেই। কাঁচা আসিয়া প্রশ্ন করিল, কখন এলে গো ?

রাত্রে।

আমি দেখি নি যে ! ... লুকিয়ে এলে বুঝি ?

না।

তবে ?

তখন ঘুমুচ্ছিলে যে !

কিসে এলে ?

গাড়ীতে।

কি গাড়ী ?

রেল গাড়ী।

আর কি গাড়ী ?

আর কি গাড়ী তাহা স্মরণ হইল না। কহিলাম, আর কিছু নয়।

কাঁচা সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, বাঃ সে কি করে হ'বে! আমরা যে দুরকম গাড়ী চড়ে এলাম—ঘোড়ার—আর রেলের।

বলিতে পারিতাম, পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে, সে এই কাঁচার মত ছোট্ট শিশুটি নয়। তাই চড়িবার সুযোগ সকলের হয় না। পায়ে হাঁটার দলই এখানে বেশী। কিন্তু যার সন্দিগ্ধ বিস্ময়ের ফলে ওই কথা ক'টা আমার মনের মধ্যে আজ সহসা জাগিয়া উঠিল, তার বয়স অত বড় একটা তথ্য উপলব্ধির অনুকূল নয় বলিয়াই নিঃশব্দে রহিয়া গেলাম।

হঠাৎ কাঁচা বলিল, ও কি! বাবা ডাকচেন তোমায়, তুমি শুনতে পাচ্ছো না ? যাও, এক্ষুণি চা' খেয়ে এস।

হুকুম দিয়া কাঁচা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

প্রাতর্ভোজনের আয়োজনটা গুরুতর হইয়াছে দেখিয়া চৌধুরী মহাশয়কে বলিলাম, এ কি! এই ভোরেই এত সব ...

নবীন কহিলেন, কিছু না। এ আয়োজন নিত্যকার, বিশেষত্ব কিছুই নেই। তিনমাস এখানে ছিলেন না ; ইক্‌মিক্ কুকারের রান্না খেয়ে দেহখানি লিক্‌লিকে হয়ে উঠেছিল। তারি ক্ষতিপূরণস্বরূপ এসে পর্য্যন্ত—আজ ছ' মাস নিত্য এই রাজসূয়যজ্ঞের আয়োজন। হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু উনি তুষ্ট হলেন না। ...

নবীনের ওষ্ঠপ্রান্তে পরিতৃপ্তির সুখোজ্জ্বল হাস্যরেখা খেলা করিতে লাগিল। পাশেই খাটের উপর একখণ্ড সংস্কৃত গ্রন্থ খোলা অবস্থায় পড়িয়াছিল। অন্যমনস্কের মত তাহারই পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম ভট্টির কাব্য-গ্রন্থ।

তাহারই উপরে স্পষ্ট দেবনাগরীতে লেখা অধিকারিণীর নাম—সুলতা দেবী।

গন্ধে অন্ধ মধুপের মত কল্পনায় মন যখন এই অদেখা সুলতা দেবীর চারিধারে অকারণ-পুলকে গুঞ্জন তুলিয়াছে, নবীন চৌধুরী সেই সময়ে স্মরণ করাইয়া দিলেন খাদ্যদ্রব্যগুলি পড়িয়াই আছে; এখনও স্পর্শ করা হয় নাই।

সুলতাকে দেখি নাই। দেখার প্রয়োজনটা এতক্ষণ যেন লক্ষ্যই করি নাই! এই গৃহের সুসজ্জিত সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলার ভিতরেই মনে হইত তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয় পাইতেছি। চোখে দেখার আর প্রয়োজন নাই। আজ এক হঠাৎ বিপর্য্যয়ে প্রথম অনুভব করিলাম, আছে, চোখে দেখার প্রয়োজন আছে। নহিলে মানুষের চেয়ে তার প্রতিকৃতিই আজ বড় হইত; কবির আঁকা ছবি, মানুষ প্রকৃতির লিপির চেয়ে বড় বলিত।

মানুষ মানুষকে চিরকালই কি এমনি করিয়া কাছে টানে?

প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম।

রোদ বেশ প্রখর হইয়া উঠিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

কাচা ডাক দিল, ও ভদ্রলোক! বেলা হ'য়ে গেল যে, মা নেয়ে নিতে বল্লে—

তাকে কাছে টানিয়া বলিলাম, আমি ভদ্রলোক কে বলে তোমায়?

—বাঃ! মা বলে দিলে যে। তুমি ভদ্রলোক, তোমায় আপনি বলতে হয়।

পরক্ষণেই বোধ করি তার মনে পড়িয়া গেল মা'র আদেশ এ পর্য্যন্ত পালন করা হয় নাই।

কহিল, আপনি উঠে নেয়ে নাও। মা রান্না করে উঠে বসে আছে—

অকারণেই আরও বার কতক আমাকে ভদ্রলোক সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া কাচা ভিতরে চলিয়া গেল।

পরিষ্কার ছোট্ট একটি কাঁচের বাটীতে স্নানের জন্য তেল এবং গলায় একটি গামছা জড়াইয়া কাঁচা ফিরিয়া আসিল।

কুপিতকণ্ঠে কহিল, নাও, শিগ্‌গির নাও এগুলো। আপনার জন্যে মা আমায় কত বকলে।

কাঁচা ঠোঁট ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার গলার গামছা এবং হাতের তেলের বাটী হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি দোষ করেছিলে?

কাঁচা কহিল, তুমি যে দাদা! তোমায় দাদা বলি নি, তাই ...

হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তা'হ'লে আর ভদ্রলোক নই ত?

না, তুমি দাদা।

তেল মাখিয়া, গামছা কাঁধে ফেলিয়া কাঁচার নির্দ্দেশ মত ইঁদারার ধারে হাজির হইলাম। গোবিন্দ বালতি ভরিয়া জল তুলিয়া দিল। সেইখানেই স্নান শেষ করিলাম।

জীবনে যাহা প্রায়ই হয় না, আজ তাহাই হইল। বেলা এগারটার ভিতর স্নানাহার শেষ হইয়া গেল।

এমন কিছুই হয় নাই, যার জন্য চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইতে পারে। অথচ, মনকে সংযত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এক অলখ্-হাতের পরশের রঙে আমার সারা চিত্ত আজ রঙীন হইয়া দেখা দিল। এই রঙীন হৃদাবেগের চঞ্চল নৃত্যে বাধা দিবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

যার শুষ্ক ছন্নছাড়া জীবনের সঙ্গে কোনোদিন কারো স্নেহ হস্তের স্পর্শ লাগে নাই, ছোট্ট একটু আত্মীয়তা ছোট্ট একটু স্নেহ যদি তাকে এমনি করিয়া আকুল করে ত' দোষ দিব কাকে?

সাতটি দিন কাটিয়াছে।

কাজের জন্য আবেদন করিয়াছি, এ পর্য্যন্ত উত্তর আসে নাই।

খাওয়া, শোওয়া, ঘুড়িয়া বেড়ান ছাড়া অন্য বিশেষ কাজ এখানে আমার নাই। যেখানে যেটুকু দেখিবার ছিল, দেখিয়া দেখিয়া সব পুরাতন হইয়া গিয়াছে।

বিছানায় পড়িয়া এক একদিন মনে হয়,—ভিতরে যাইবার অধিকার মিলিয়াছে। একটি কর্ম্মনিরতা শ্যামলা মেয়ের সম্মুখে বসিয়া আমার অভাবমলিন জীবনের জীর্ণ পাতাগুলি খুলিয়া দিই, শুনিতে শুনিতে কর্ম্মচঞ্চল হাতদুটি থামিয়া যায়—চোখে বাদল-মেঘের ছায়া ঘন হইয়া ওঠে।

অলস দ্বিপ্রহর বেলায় সাথীহীন নিঃশব্দ শয্যা বিরক্তিকর হইয়া ওঠে। কক্ষান্তরের ছবি আঁকি। দেখি সারা প্রভাতের দৌরাত্ম্যের ক্লান্তিতে কাঁচা নবীনের পাশটিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—একগাছি শ্বেতশুভ্র পুষ্পমাল্যের মত। আর তারই অদূরে ভূমির উপর আঁচল বিছাইয়া একটি মেয়ে একমনে ভট্টি-ভারবি-কালিদাসের শ্লোকমালার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মগ্ন হইয়া আছে।

পাশের ঘরের ঘড়ির টুকটাকটুকুও শুনিতে পাই, ফাঁকে ফাঁকে সুলতার মিষ্টি কণ্ঠস্বরটুকুও!

গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁ গোবিন্দ, তোমার বাবুর এবারকার বিয়ে কতদিন আগেকার কথা?

গোবিন্দ বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করে, আপনি জানেন না?

না।

গোবিন্দ খানিক চুপ করিয়া থাকে, তারপর বলে, বিয়ে ত হয় নি!

আমিও বিস্মিত হই! জিজ্ঞাসা করিয়া বসি, তবে? ...

গোবিন্দর মুখে তখন সুলতার বাল্যের ইতিহাস শুনি।—

বাঙলার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ কোনো এক গণ্ডগ্রামের বেদজ্ঞ পণ্ডিত শঙ্করনাথ বাচস্পতির কন্যা এই সুলতা। অতি-শৈশবে যখন বিবাহের কোনোরূপ ব্যাখ্যাই সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, সেই সময় বাচস্পতি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন কুলশীল ও ধনমানে সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয় নয়বৎসরের কোনো কুলীন সন্তানের সহিত। বিবাহের পর কন্যা পিতৃগৃহেই বাস করিতেছিল। সেই সময়ে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একখানা চিঠি আসিয়া সুলতার বৈধব্যের পরওয়ানা জারি করিয়া গেল। ... বৃদ্ধ বাচস্পতি কন্যাকে নিজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অংশ দিতে লাগিলেন। শৈশব ছাড়াইয়া সুলতা একদিন কৈশোরে পদার্পণ করিল এবং অচিরেই কৈশোর মুকুল যৌবনের গন্ধবর্ণে পুষ্পিত হইয়া উঠিল।

শঙ্করনাথের শিষ্য-সম্পত্তি কিছু কিছু ছিল। প্রয়োজন হওয়ায় একদিন তাঁহাকে গ্রামান্তরে কোনো শিষ্যগৃহে যাইতে হইল। একবৃদ্ধা প্রতিবেশিনীর উপর বাচস্পতি কন্যার ভার দিয়া গেলেন। কিন্তু সে ভার তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। শিষ্যগৃহ হইতে সোপকরণ দক্ষিণাদি সমেত বাচস্পতি যেদিন গৃহে ফিরিলেন, কন্যা সুলতার কোনো চিহ্ন সেদিন সেথায় মিলিল না। প্রতিবেশীরা সখেদে জানাইল—

একরাত্রে কয়েকজন ..

সংবাদ শুনিয়া বাচস্পতি কি করিয়াছিলেন গোবিন্দ তাহা সবিশেষ জানে না। হঠাৎ একদিন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সুলতাকে বাচস্পতির গৃহসমীপবর্ত্তী পুষ্করিণীর পাড়ে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল ...

বাচস্পতি বন্ধন খুলিয়া কন্যাকে গৃহে তুলিয়া আনিলেন; এবং সেই সঙ্গে পাড়া প্রতিবাসীরা এক যোগে এই মোহান্ধ বৃদ্ধের বিরুদ্ধে জাতঃপাতের ও ধর্ম্মহানির শমন রুজু করিয়া দিল। ... কন্যার প্রতি স্নেহের অন্ত না থাকিলেও সমাজের ভয় বাচস্পতির কোন গ্রামবাসীর অপেক্ষা কম ছিল না। সুতরাং শীতের এক মধ্যরাত্রে গ্রামের সমস্ত শীর্ষস্থানীয়দের চোখের সামনে সুলতাকে পিতৃগৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। ...

নবীন চৌধুরী তখন সেই গ্রামে একটা দাতব্য চিকিৎসা-গৃহ নির্ম্মাণের কন্ট্রাক্ট লইয়া কিছু কাল হইতে

সেখানে বাস করিতেছিলেন। সংবাদ শুনিয়া বাচস্পতির সমাজ-বিচ্যুতা কন্যাকে তিনি সেই দিনই স্বগৃহে স্থান দিলেন। সে দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনো দিনই নবীনের গৃহে সুলতার জন্ত স্থানাভাব হয় নাই।

উপসংহারে গোবিন্দ কহিল, বাবু, মায়ের মত এমন নরম প্রাণ কারো দেখলাম না। গ্রাম ছেড়ে এলেও গ্রামের সবার তরে আজও তেনার মন কাঁদে। ... আর দু'জনের মনের মিলও বাবু, কোন সোয়ামী-স্ত্রীর চেয়ে এতটুকুন কম নয়। আমি ত' বলি, বাবুই তেনার পিকিত সোয়ামী।

গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাচস্পতি এখনো বেঁচে আছেন?

গোবিন্দ কহিল, হাঁ। মা এখান থেকে মাসহারা পাঠান, তাতেই তাঁর চলে। শিষ্যশাহিদের বিদেয় দিয়েচেন। ... বাবুও বছরে দু'চার বার তেনার সঙ্গে দেখা করতে যান। মা'র যাতায়াত লেগে আছেই। ... একবার পেল্লায় ভোজ দিয়ে আর বড়কালীর খাতায় মোটা রকম চাঁদা জমা করে বাবু সেখানকার মাতব্বরদের চুপ করিয়েছেন, তেনারা আর কিছু বলেন না।

গোবিন্দ চুপ করিল।

আমি মনে মনে বলিলাম, তোমায় কোনোদিন দেখিলাম না, কোনো দিন দেখিব কি না তাও জানি না! তবে একটিবার দেখা বোধ করি আমার প্রয়োজন ছিল!

অন্তঃপুরিকা বিধবার মহিমা যত বড়ই হউক না, সে বিষয়ে এতটুকু আপত্তিও আমি করি না। কিন্তু তোমাকেও আমার সমাজের একান্ত আপনার বলিয়া বরণ করিতে এতটুকু দ্বিধা আমার হয় না।

আপনার মধ্যে আর একটির অনাগতের কামনাই মানুষকে সুন্দর করে, শুচি করে। বিবাহের যে বাঁধন তারও সার্থকতা কেবল এই খানেই। নহিলে অতি স্থূল ভোগ ছাড়া ওটার অন্য ব্যাখ্যা হয় না। যাদের মিলন আজ এক অমূর্ত্তকে রূপ দিল—ধরণীর ধনাগার আরও একটা প্রাণীর সহায়তায় সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল, এক রমণীর অতি অন্ধকার পথযাত্রার গতিরোধ করিয়া তাহাকে নারীত্বের পরিপূর্ণ মহিমায় বিকশিত করিল—তাহাকে কোনো যুক্তিতেই অশুচি ও অশাস্ত্রীয় মনে হইল না। ভাবিলাম, মানুষকে শাসন করে বলিয়াই শাস্ত্র—শাস্ত্র। এও এক নারীর উচ্ছৃঙ্খল জীবনপথের যাত্রায় প্রতিরোধ করিয়াছে, তার সম্ভাবিত ব্যর্থ ভবিষ্যৎকে ব্যর্থ করিয়াছে, এও শাস্ত্র। উষর নিষ্ফলতার নিশি ভোর করিয়া মানুষ যদি সাফল্যের সার্থকতার ঊষালোকে আপনাকে পুণ্য করিয়া লইতে চায় ত' অপরাধ কাহাকে দিব? মানুষের গোপন বুকে যিনি চিরন্তন সৃষ্টির অমৃত লুকাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহাকে, না অন্য কাহাকে?

আরও ক'টা দিন কাটে, ধীরে ধীরে—মন্দাক্রান্তা ছন্দের তালে।

সন্ধ্যার বাতাস স্পর্শে গাছের কচি পাতায় কাঁপন জাগে। মনে হয় কোনো গোপন অভিসারিকার কাঁকন বাজে। নীলাম্বর ললাটে চাঁদের টিপ্‌টি ঝক্‌ঝক করে। প্রকৃতি মেয়েটিকে ভারি ভাল লাগে, ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়।

বুকের খানিকটা অংশ—বেদনায় টন্‌টন করে। জীবনের যাত্রাপথে সাথী চাই!

এ ফাঁকির কারবার ভাল লাগে না। আমার দোসর, আমার দরদী কই? ...

সুলতাকে কাছে আনিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রত্যেকটি কাজে, প্রত্যেকটি অলক্ষ্য-আচরণে ওর যে পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই সে আমাকে দিয়া বসিয়াছে, এই অদর্শনের আড়াল রচিয়া ও কি সেটা মিথ্যা করিয়া দিতে চায়?

একদল দুরন্ত ছেলের সঙ্গে কাঁচা সামনে দিয়া ছুটিয়া যায়।

মনে হয়, ওরি মত একটি দুরন্ত চঞ্চল প্রাণসত্তার হইতে ধরণীকে আমি বঞ্চিত করিয়া চলিয়াছি, সেই সঙ্গে আপনাকেও ...

উদাস মরু-বাতাসের একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়া পড়ে। অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আবৃত্তির সুরে বলি—

‘কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে … …’

ছায়াম্লান আকাশে সন্ধ্যার তন্দ্রাতুর তারাটি ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে … যেন আমারই অন্তরের কুমারী কামনা;

গোধূলি আকাশের উদ্দেশে আঁখি তুলিয়া বলি, ‘আকাশ-ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই!’

বিদেশে একটি মাস প্রায় শেষ হয়।

আবেদন-পত্রের উত্তর আজও আসে নাই। কোনো দিন যে আসিবে এ ভরসাও নাই।

গোবিন্দ আসিয়া বলিল, হাতের উপর মাথা রেখে কে না শোয় বাবু! কিন্তু, এমন কার হয়!

বুঝিলাম, যে কথাটা সে বলিল সেইটাই তা'র মুখ্য বক্তব্য নয়। গোবিন্দ আরও কিছু বলিবে। কহিলাম, ব্যাপার কি গোবিন্দ?

গোবিন্দ কহিল, মায়ের সাথে গাঁ ছেড়ে যে দিন আসি বাবু—সে দিন মনে কত আনন্দ, কত ভরোসা। হাতের ব্যথাটাও মনে ছিল না। আজ আর কিছু ভালো লাগে না।

বেদনাটা বাড়্‌ল বুঝি?

হাঁ বাবু, শরীরটায় জুত লাগচে না। গাঁয়েই যেতে হ'ল বুঝি!

বুঝিলাম, শরীর খারাপের পরিমাণ যেরূপই হোক, গাঁয়ে ফিরিবার ইচ্ছাটাই গোবিন্দর এখন তার চেয়ে বেশী! কহিলাম, শরীরের সঙ্গে মনের সম্পর্ক বড় ভয়ানক, গোবিন্দ। মন খারাপ হয় নি ত?

গোবিন্দ ম্লান হাসিয়া বলিল, না বাবু, গরীবের আবার মন!

বলা যায় না গোবিন্দ, আর একটি ছোট্ট মন হয় ত তোমায় দূর থেকে ডাক দিয়েছে। খেলাধূলো, ছুটোছুটি সবই সেখানে বেসুরো হয়ে উঠ্‌ছে।

গোবিন্দ ইঙ্গিতটা বুঝিল এবং বিব্রত হইয়া পড়িল। কহিল, তা'র কি আমায় মনে করবার বয়স বাবু! ছুটোছুটিতেই তা'র আনন্দ!

বলিলাম, তুমি কাছে থাকলে ছুটোছুটি করেও আনন্দ। নইলে স্বর্গে গিয়েও সুখ নেই! … মন না টানলে শরীরে টান পড়া শক্ত গোবিন্দ!

গোবিন্দ গম্ভীর হইয়া বলিল, তা হ'বে। … শরীর আর মনের কোন্‌টা বেজুত হ'ল কে জানে! ক'দিন রেতের বেলায় ঘুমুতে পারি নি!

কহিলাম, তাই কর গোবিন্দ, দেশেই যাও। মাটীর টান, মনের টান উপেক্ষা করবার মত সভ্য হয়ে কাজ নেই তোমার। গাঁয়ের মাটীকে ভালবেসো, রত্ন যদি মেলে ত' তাতেই মিলবে। নইলে কারখানার পাষাণে নিজেকে আছড়ালেও রক্ত-বমন ছাড়া কিছু হ'বে না। বাংলো তৈরী, চাকর পোষা—এ সব তোমার কাছে উপহাস হয়েই থাক্।

অনেকটা আপন মনেই গোবিন্দ বলিল, যেতেও ইচ্ছে করে না! একদিনেই মা আপনার করে নিয়েছেন, যেন ঘরের ছেলে! … অসুবিধে কেমন, সেটা ভুলেই ছিলুম একেবারে। রাজার হালে বসে বসে খাওয়া চলছিল! … কিন্তু যেতে আমার হবেই বাবু, এতখানি যত্নআত্যি আর সহ্য করতে পারি না …

মনে মনে বলিলাম, সত্যি কথা গোবিন্দ! যেতে ইচ্ছে সত্যিই করে না! তবু যেতে হ'বে! … বিদায়ের দিন আমারও বুঝি আসন্ন! এতখানি যত্ন এতখানি আত্মীয়তা —সবই ভুলিতে হইবে। আজ যাহাদের সাথে স্নেহের এতখানি নিবিড়তা—অবশিষ্ট জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে

আর হয় ত কোনোদিন তাহাদের দেখাও মিলিবে না।

কিন্তু দুঃখ করিয়া লাভ নাই!

জীবনে এমন ত' কত গিয়াছে, আরও কত যাইবে কে জানে!

মানুষের সমস্ত জীবনটাই ত এই পাওয়া আর হারানোর ইতিহাস!

আরও ক'টা দিন কাটে—গঙ্গাযাত্রার পর মৃত্যুর বিলম্বের মত! গোবিন্দ এখনও যায় নাই, যাওয়ার দুই চারদিন বিলম্ব আছে। আমাকেও যাইতে হইবে স্থির করিয়াছি—পরের সংসারে নিশ্চিন্ত সুখে এমন করিয়া আর কতদিন কাটানো যায়! ... কিন্তু কবে যাইব তাহা আজও স্থির করিতে পারি নাই।

কাঁচা আসিয়া বলে, উঃ। তোমার কি প্রকাণ্ড চুল!

তুমি নাকি মেয়েমানুষ?

বলি, তোমার কি মনে হয়?

কাঁচা কিছুক্ষণ আমায় ভাল করিয়া দেখে—তারপর বলে, না গো, তুমি ত' বেটাছেলে!

কিসে বুঝলে?

তুমি যে কোঁচা করে কাপড় পর, তুমি যে দাদা! দাদা বুঝি মেয়েমানুষ হয়।

তাহার এই যুক্তিগর্ভ বাণীর প্রতিবাদ করি না, কিন্তু এতটা আত্মীয়তা যেন গুরুভার ঠেকে; সহ্য করিতে পারি না।

মনে মনে বলি, বিদায়ের অনাগত মুহূর্ত্তে কাঁচা যেন সামনে না আসে! আমার পথ-চলা দুর্ভার না করে।

তারপর শচীশকে কি তার মনে পড়িবে?

বিদায় লইবার দিনটি কেন স্থির করিতে পারি না কে জানে!

একজনকে দিদি বলিয়া ডাকিতে সাধ হয়! .. অন্তত, বিদায়ের দিনটিতে সামনে গিয়া যেন প্রণাম করিয়া আসিবার অধিকারটুকু পাই! ... চাষার ছেলে গোবিন্দকে যে মায়ের স্নেহে আপনার করিয়া লইয়াছে তারই কাছে ভায়ের অধিকারটুকু প্রত্যাশা হয় ত খুব বড় লোভ হয়।

কিন্তু এ লোভ আমার একদিন তীব্র কশাঘাতে মুহ্যমান হইয়া পড়ে।

শয্যায় পড়িয়া সুলতার কণ্ঠস্বর শুনিলাম, বেশ স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ। সে কণ্ঠস্বর যে এতখানি উচ্চ হইতে পারে এ ধারণা আমার পূর্ব্বে ছিল না। ...

আমার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত প্রত্যাশা ধূলায় ধূলা হইয়া গেল।

কিন্তু অপ্রত্যাশিত হইলেও অস্বাভাবিক নয় আঘাতটা। নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়—এক অতি দূরের আত্মীয় যদি দিনের পর দিন স্বামীর অন্ন ধ্বংস করিতে পারে—তাহাকে অনুযোগ করা অভিযুক্তের পক্ষে কঠিন হইলেও, অন্যায় ত' নয়!

আমিও তা' মনে করি না! এ আঘাত আমাকে কাতর করে না; জীবনের নতুন যাত্রাপথ নির্দ্দেশ করে' নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে।

সুলতাকে উদ্দেশ করিয়া বলি, দিদি, সমুদ্রমন্থনে কতখানি বিষ এবং কতখানি সুধা উঠিয়াছিল তার হিসাব আজ করিব না! লক্ষ্মী আমার অন্তরেই আছেন, সুতরাং নারায়ণের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। ঐরাবতের মত শক্তিটুকুই চাই—

তোমার আঘাত আমার সে শক্তি ধারণের উপযোগী করিয়া তুলুক। আর—

আঘাত ত' শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়! শরাহত ধরণীর ভোগবতী ধারা মুমূর্ষু ভীষ্মের প্রাণে কতখানি শান্তি ঢালিয়াছিল তাহাও আমি ভুলি নাই।

সুতরাং, যাত্রা আবার সুরু হোক। তাহাতে এতটুকু ক্ষতি নাই।

কথা শুনিয়া নবীনের চোখে জল আসিল। তবু সত্যিকার ঘটনাটা তাঁহাকে বলি নাই!

নবীন কহিলেন, বুঝতে পারলুম না শচীশ, যাওয়াটা তোমার হঠাৎ এতখানি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠ্‌ল কেন! কিন্তু যদি আড়ালের কোনো কথা শুনে তুমি যাবার জন্যে তৈরী হয়ে থাক ত' তাকে আমি মূর্খতাই বল্‌ব। কারণ তোমার মামা তোমায় যার কাছে পাঠিয়েছিলেন সে সুলতা নয়, আমি। আর তুমি জানো—চিত্তের উদারতা যতখানিই হোক, মেয়েমানুষ সংসারের ব্যয়সংক্ষেপ করতে পারলে যত খুশী হয় তত আর কিছুতে নয়! কিন্তু আমি তা মনে করি না। গোবিন্দও আমার আশ্রয়ে বাস করে।...

কিন্তু তা সত্বেও থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হইল না। আমার দারিদ্র্যকে আমি অপমান করিতে চাই না।...

যাত্রার সময় আসন্ন হইল। কিন্তু বিদায়ের নয়!

ময়লা কাপড় দু'খানা ভাঁজ করিয়া বগলে লইলাম, শ্রীকান্ত এবং সিগারেটের নূতন কেনা টিন্‌টা পকেটে।...

নবীনকে প্রণাম করিয়া কহিলাম, মামীমাকে আমার প্রণাম জানাবেন। আমি দুঃখ করি নি! যেতে ত' আমাকে হতই—

কি জানি, সুলতা একথা শুনিয়া কি বলিবে!

কালিদাস-ভট্টি-পড়া-মনে এতটুকু আঁচড়ও লাগিবে না?

গোবিন্দ দাঁড়াইয়াছিল; তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, চল না গোবিন্দ, দু'জনে এক সঙ্গে যাই।

গোবিন্দ বলিল, যেতে হবেই বাবু! কিন্তু আজ নয়। মা তা হ'লে ভাববেন—আপনার জন্যে আমিও পালালাম। মাকে দুঃখু দিতে আমি পারব না।...

কাঁচা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই। আরক্ত চোখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। গোবিন্দ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই কহিল—

দাদা, চলে যাচ্ছ বুঝি!

কি একটা উত্তর দিতে গেলাম, স্বর ফুটিল না।

—না, তুমি যেও না দাদা।... তুমি যেও না। আমি তাহ'লে পাহাড় দেখতে যাব কার সঙ্গে!

গোবিন্দকে দেখাইয়া বলিলাম, গোবিন্দ তোমায় পাহাড় দেখাবে। আমি যাই, কেমন?

না।

এই ছোট্ট 'না'-টুকুর আবেদন কতখানি তাও জানি, দাদা যে তা'র কতখানি আপনার তাও অজানা নয়।

কিন্তু এ জানাজানির যে এই শেষ! তাই আমার চলা সুরু হয়।

দুটি কালো কাতর চোখের কান্না আমার পথ চলাকে ভারি করিয়া তোলে—

তবু চলিতে হয়।

কাঁচার মুখের 'না'-কে ত অবহেলা করিলাম। কিন্তু আমার এই বিদায়টাই যে আমার মস্ত বড় মিথ্যা। নিজেকে যে রাখিয়াই গেলাম।...

পরিশ্রান্ত বলদের মত যখন ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখনো ট্রেণের বিলম্ব ছিল। কেবল টিকিটের ঘণ্টা পড়িয়াছে।

পকেটে হাত দিয়া গণ্ডা কয়েক পয়সা পাওয়া গেল। দু'টা ষ্টেশনের ভাড়া।...

তাই দিয়াই একখানা টিকিট কিনিলাম।

যতদূর যাওয়া যায়।...

তারপর হাঁটা ত' আছেই।

টাকা পয়সাগুলো কেবল ষ্টেট এক্সপ্রেসের পিছনেই গিয়াছে।...

ঠাট্‌-টা

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

মাছের মা ; বিয়োয় কিন্তু পালে না—

হয়ত মা বসুমতীর ব্যাভিচারের মরা-হাজা সন্তান সব ! অনাহারের শীর্ণতা, জীর্ণ প্রাণের ব্যাকুলতা, বুক নিঙ্‌ড়ানো দীর্ঘশ্বাস,—এরাই সম্বল শুধু।

আকাশের দিকে চায় হয়ত, হয়ত হাতও বাড়ায়। আঙুলের ডগায় দখিনা বাতাস ছোঁয়—ওইটুকুই।

দীন আবেদন,—অকারণ, নিষ্ফল !

... মেঘলোক বিঁধিয়াছে ওই মন্দিরের চূড়াটা ; আকাশের বুক ফুটা করে নাই এখনও। কান্নার সাগর মন্থন করিয়া উঠিয়াছে যেন,—যেন ব্যর্থ নিঃশ্বাসের হাওয়া-পোরা স্তম্ভ একটা।

চাঁদ ওঠে মেঘে ঢাকা, আবছা—অস্পষ্ট ! দেখা যায় না, বোঝা যায় শুধু। তারই মরীচিকায় লুব্ধ চকোরীর বুক বিঁধে হয়ত ওই চূড়ার ফলাটায়। ব্যাধের খোঁচা !—দেবতার ফাঁদ !

জানোয়ারও পড়ে ও-ফাঁদে ; অসহায় নির্বোধ জানোয়ার ! কথা বলে, কাপড়ও পরে সে। আর যারা শব্দ করে, লেজ আছে যাদের,—তারাও।

অন্ধকার মন্দিরের মাঝে লক্‌লক্‌ করে ওই রক্তাক্ত রসনাটি। ওর ক্ষুধা মিটায় পাণ্ডারা। ছাগল আনে, ভেড়া আনে, বাগানের কুমড়া,—আখ্‌ পর্যন্ত। গলায় রাঙা সূতার ফাঁসা লটকাইয়া মানুষকেও টানিয়া আনে। বলে, "বহুৎ পুণ্যি হবে, দোরে পয়সা ফেলে ঠাকুর দর্শন কর।"

কপালে সিঁদুরের রক্ত-ফোঁটা, রুদ্রাক্ষের মালা, চন্দন-লেপা দেহের সাজ। হাতে সোনার শিকলি-বাঁধা কবচ, সোনার অঙুরী ত আছেই।—এখানকারই পাণ্ডা।

"দাও হে বাপু দাও, ঝামেলা রেখে পয়সা দুটো এখন ছাড়ো। মন্দিরে রাত কাটাতে আবার কে দেয়, শুনি ?—হাঁ করে দেখ্‌ছ কি ? দাও।"

ভিখারীটা নূতন আমদানী, আইন জানে না। মাথা পিছু দু'পয়সা রোজ !

দুটি পয়সাই আছে, আগামী কালের সঞ্চয়। তবু বাহির করিয়া দেয়, হাত কাঁপে,—কথা কয় না। বোবা,—হাবাও হইতে পারে !

নিঝুম রাত ; টিপি টিপি বাদল।

পায়ের শব্দ হয় তার।

"হরিবোল হরিবোল !—আধ্‌লা একটি দেবে গা ? কি, চাল দুটি ? তিন আঙুলে দাও না চিবিয়ে খাই বাছা ?—চ'লে গেল !"

ঝাঁপির তলায় কাঠির মত আর একজনের সরু গলাটি উঁচু হয়, কর্ণমূলের শির দুইটা ফুলিয়া ওঠে,—ছিঁড়িবে কোন্‌ দিন।—ঠুক্‌ঠুকে লাঠিটি লইয়া বুড়া ভিখারীটা মন্দিরেই রাত কাটায়। অন্ধ,—আতুর !

কিন্তু আইন-কানুন সে জানে তাই আর চেঁচায় না। আর যাহার কাছে সে ভিক্ষা চায় সেও আসিয়া ঝাঁপের তলায় ঢোকে। হাত পা সাঁটিয়া গুড়ি মারিয়া শোয়। অনাহার, তাই হয় ত কথাও আসে না মুখে।

হাঁস্‌ফাঁস করিয়া বৃষ্টি তখন একটু জোরেই আসে। ছমছমে রাতটাও তেমনি।

আরও একজনকে দেখা যায় অন্ধকারে,—যেন দেবতার প্রেতাত্মা। ভোগের ফুকার স্বর্গে হয়ত স্থান হয় নাই।

প্রেতাত্মা নয়, মানুষের দেহ। আল্‌টপ্‌কা ঝাঁপের তলায় আসিয়া শোয়, তারপর চোখ বুজিয়া বুজিয়াই

গুড়ি গুড়ি হাবা, ভিখারীর থলিটার ভিতর হাত চালাইয়া দেয়।

অন্ধকার বলিয়াই আব্‌দারটা নিঃশব্দে চলে।

কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ির ভিতর কদাকার মুখখানায় সে একটুখানি হাসিয়া হাতটা আবার সরাইয়া লয়।—খালি হাত!

দেবতাই যে সে-দুটি পয়সা আত্মসাৎ করিয়াছে আগেই।

জলের ছাটে ঘুমন্ত দেহগুলি নড়িয়া ওঠে। লোকটার স্নান হয় না, নিঃশব্দেই আবার উঠিয়া পড়ে।

হঠাৎ একজনের গায়ে পা ঠেকে,—হয়ত ইচ্ছা করিয়াই।

মুখ তুলিয়া সে চায়। নাটমন্দিরের ছোট দেউটির জলে-ভেজা মরা একটুখানি আলো আসিয়া পড়ে। একগোছা চুলের ভিতর হইতে মেয়েটি মুখ বাড়াইয়া ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে, "কি?"

একটি চোখ তাহার কাণা। বাঁ-গালে একটি বড় কাটার দাগ। হিংস্র কোনও ব্যাঘ্রের দাঁতের দাগ হয়ত!

হাত বাড়াইয়া লোকটা যাইবার সময় তাহাকে ডাকে। কিন্তু মেয়েটা ওঠে না, চিৎ হইয়া শুইয়াই ডান হাতটি বাড়াইয়া বলে, "কালকের পাওনাটা?"

"আয় না, দেবো রে।"

মেয়েটি নিঃশব্দেই হাসে। বাঁ-হাতের বুড়া আঙুলটা দেখাইয়া বলে, "কলা!—ভাগ্।"

লোকটা আর দাঁড়ায় না।

মেয়েটি আবার কাৎ হইয়া ভিজা আঁচলটা গায়ের উপর টানিয়া লয়, তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করে।

হয়ত ঘুমায় না,—সুমুখে অবিরাম সেই ধারা বর্ষণের দিকে একটি চোখ মেলিয়াই স্বপ্ন দেখে।

হয়ত বা ভাবে,—লোকটার সঙ্গে গেলেই ভাল হইত!

আর একজন নিশাচর প্রেতের মত সারা রাত অন্ধকার খোঁজে খোঁজে টহল দিয়া বেড়ায়। যদি কিছু কোথাও পায়!

ইতর চিল-শকুনি ছোঁ মারে মাংসের কুচি, হাড়-পাজ্‌রা যায় চিড়িয়াখানায় তাদের কাছে, আর শান্-বাঁধানো উঠানে রক্তের দরানি চাটে হ্যাংলা পথো কুকুরের দল!

অধিষ্ঠাত্রী ভৈরবী খান্ ছইই,—হাড়-পাজ্‌রা, রক্ত মাংস—সব!

আকাশ আড়াল করিয়াছে নাটমন্দিরের বড় চালাটা,—অবকাশ নাই। আলো বাধা পড়িয়াছে গম্বুজের ফাঁদে; আধমরা আলো, কাঙালের মত আনাচে কানাচে উঁকি মারে।

হাওয়া বয় না।—বাগানের ফুলতলায় যে হাওয়া আসে। যে হাওয়ায় প্রজাপতির পরাগ ওড়ে। যে হাওয়ায় ভর দিয়া স্বপ্নপুরীর রাজপুত্র পক্ষীরাজে চড়িয়া রাজকন্যার দেশে যায়। সেই সাত সমুদ্র তেরো নদীর হাওয়া!

মানুষের বাসিস্মৃতের গন্ধ, জানোয়ারের শুকনো রক্তের ধূলা মিশানো, বক্তৃতার মধ্যে অন্‌কির প্রলাপ, মিঠাইয়ের দোকানে হলুদে মাছির পোকা প্রসব —এ সেই হাওয়া!

তবু এই ক্লেদাক্ত নিঃশ্বাসেই অসহায় দেবতার প্রাণ বাঁচে। লোল্ রসনার ক্ষুধা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলে—এই হাওয়াতেই।

আর এদিকে কোনো ভিখারীর ঝুলি হইতে গেল আধলা-পয়সাটা, কারো গেল অতি যত্নের কাপড়খানি, কোনো বালিকার গলার হারটুকু, কারো বা পকেট থেকে টাকাটা-সিকেটা।—জমা হইল গিয়া জুয়াড়ীর আড্ডায়। পোষ্যপুত্র ওরা।—

জানি সব,—সবই বুঝি।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বলির জায়গাটা কেবল নজরে পড়ে। রক্তে রক্তে কালো ও-জায়গাটা—সারাদিনই।

হাওয়ায় ওঠে উপর দিকে পচা রক্তের গন্ধ। ওর মধ্যে জীব-জানোয়ারের নির্ব্বাক ব্যাকুলতা,—স্বর্গে স্থান পাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে হয়ত!

রক্ত-চত্বরের ধোয়াট্ গিয়া চওড়া নালায় পড়ে, সেখান দিয়া খালে যায়, তারপর কোন্ নদীতে, তারপর,—আর ভাবিতে পারি না! রক্তের অণুপরমাণু সম

পৃথিবীকে যেন পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। জীবশোণিত সে ব্যাভিচারিণীর বড় প্রিয়।

তবু মনে হয়, দেবতার ক্ষুধা মিটাইতে এই যে হত্যাশালার সৃষ্টি,—এর থাম্, দেয়াল, ঘর, মাটি,—ওই প্রকাণ্ড গম্বুজটা, সব রাঙা!

হাতে মুখে চোখে গায়ে যেন রক্তের ছাট্ লাগে।

কিন্তু এ মোহ আবার কখন কাটিয়া যায়। মুখ ফিরাইয়া দেখি, প্রতিদিনকার মতই সেই মেয়েটি নাটমন্দিরে আসিয়া দাঁড়ায়। হাতে ফুলের ডালা, নৈবেদ্যের চেঙারী। লাল পাড় গেরুয়া শাড়ী পরণে। একটুখানি ঘোম্‌টার ভিতরে মাথার এলো খোঁপাটি দেখা যায়।

মেয়েটি রোজই আমাকে দেখে কিন্তু সুন্দর তাহার মুখখানিতে কোনোদিন কোনো রেখা টানিয়া আমাকে দেখার মূল্য সে দেয় না,—নির্ব্বিকার!

পুঁথি সম্মুখে ফেলিয়া যাহারা গোলমাল করিতে থাকে, হঠাৎ সকলে তাহারা থামিয়া যায়। ভয় করে যেন মেয়েটিকে ওরা।—

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বুড়া ভিখারীটা ছুটিয়া আসে। হাত পাতিয়া বলে, “অনেকক্ষণ থেকে তোর তরে বসে আছি মা। তোর কাছে বউনি না করে' ত যাই না।”

আঁজ্‌লা করিয়া মেয়েটি তাহার থলিতে চাল দিয়া বলে, “সকাল সকাল ফিরো বাপু। অবেলায় বিষ্টিতে ভিজে রোগ ধরিও না যেন। দেখবার নেই কেউ।”

চলিয়া যাইতে যাইতে বুড়া বলে, “আচ্ছা মা, আচ্ছা। তোর জন্যেই ত বেঁচে আছি মা। কিছুই ত ভুলি নি!”

ছোট মেয়েটা তখন ছুটিয়া আসে, “মাসি—?”

আমার দিকে তাকাইয়া মেয়েটি তাহাকে বলে, “র'স্ বাপু, একটু দাঁড়া।—এ কি, তুমি এখানে কেন, মহাদেব?”

নিশাচর সেই লোকটা।—ভিখারীর থলি হাত্‌ড়ায় যে!

থতমত খাইয়া মহাদেব বলে, “এই এখানে … যাচ্ছি চলে'। একটি কথা তোমায়—”

“কথা শুন্‌গে পরে।—বউটি কেমন আছে তোমার এখন? আর ছোট ছেলেটি?”

ঘাড় নাড়িয়া মহাদেব বলিল, “ভালই আছে। তোমার সেই ওষুধেই—”

“বেশ যাও। ‘তোমার ওষুধ’ বলে' আর চেঁচাতে হবে না। যাও।”

মাথা হেঁট করিয়া মহাদেব চলিয়া গেল।

ছোট মেয়েটা বলিল, “এইবার দাও, মাসি!”

আঁচল খুলিয়া দুইটি পয়সা তাহার হাতে দিয়া মাসি বলিল, “আর কিছু নেই এখন। দুপুর বেলা আমার বাড়ীতে যাস।—আচ্ছা জগমোহন?”—হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া একটু কঠিন কণ্ঠেই সে কহিল, “আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌লেই পুঁথি পড়া হবে তোমার?

লজ্জায় রাঙা হইয়া জগমোহন মাথা হেঁট্ করিল।

লজ্জা শুধু জগমোহনের নয়,—আমারও।—অন্যদিকে ফিরিলাম।

পূজা করিতে হয় ত মেয়েটি আসে না।

ফুলের ডালাটি সে তাহাদের কাছেই রাখিয়া দেয়। বলে, “সরকারদের মালীটা বড় খিট্‌খিটে, ফুল নিতে গেলে মুখ খিঁচিয়ে আসে, জানো কালীচরণ?”

“ঘুষ চায় বোধ হয়, না দিদি?”

কান পাতা যায় না তখন মন্দিরের গোলমালে। নাটমন্দিরের বড় ঘড়িতে পূজার ঘণ্টা বাজিয়া গেল। অদূরে কাহার রুগ্ন সন্তানের কল্যাণে যূপকাষ্ঠে দুইটি ছাগ-শিশু রক্ত দান করিল।

কালো কোঁকড়ানো চুলগুলির মধ্যে মেয়েটির মেঘাচ্ছন্ন মুখখানি যেন ভারি হইয়া আসে। চোখে হয় ত তাহার জল ভরে।

জগমোহনের পুঁথি পড়া আর হয় না,—ভুলিয়া যায়।

পাকা দাড়িতে হাত বুলাইয়া বুড়া দেবীদাস বলে, “ফুল আর আনিস্ নে মা কাল থেকে। পূজো করবি নে কোনোদিন, ঠাকুরের কাছে একদিন মাথাও গড় করিস নে, তবে আর ফুল-নৈবিদ্যি কি হবে মা? আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলমূল এনে আমাদের খাইয়ে তোর কি লাভ?”

"বড় অন্যায় হয়েছে, না ঠাকুর?"—ক্ষীণ একটুখানি হাসিয়া মেয়েটি অন্যত্র চলিয়া যায়।

'কি সব হচ্ছে তোমাদের এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?"

উপস্থিত সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং ইহাদের দলপতি হইয়া আমিও যেন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম।

"ও কে—বেহারী বুঝি? ঘরে তোমার মা মরে আর এখানে দাঁড়িয়ে তুমি বিড়ি টান্‌ছ? কে তোমাকে আস্‌তে বলেছে এখানে, শুনি?"

বেহারী হেঁটমুখে নিরুত্তর!

কাণা সেই মেয়েটি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "কিছুই আমরা করি নে মাসি, ওই বাবুটিকে কেবল—একটি কথা—"

"কথা না পরামর্শ, হতভাগি?"

"বল্‌ছিলাম যে—"

"গা টিপে ওকে থামিয়ে দিচ্চ কেন, মহাদেব?—হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলি?"

মুখ ঢাকিয়া মহাদেব তখন সরিয়া পড়িয়াছে। বেহারীর শুধু পালাইতে না পারার লজ্জা নহে, পালাইতেও তাহার লজ্জা করিতেছিল।

মণিকা রাগ করিয়া কহিল, "হাজার বার বলেছি এক-সঙ্গে কক্ষণো তোমরা থাকবে না, তবু,—চোখ দুটি তোমার কেমন আছে, রাজকুমার?"

বুড়া অন্ধ রাজকুমার ঝাঁপের কাছেই বসিয়াছিল, মুখ তুলিয়া আন্দাজে মণিকাকে বলিল, "ভাল আছে মা, ভাল আছে। অবাক্—আবার মনে হচ্চে দেখ্‌তে পাবো। কালো পর্দ্দাটা যেন ঘোলাটে হয়ে এসেছে।"

"হবেই ত, চোখ ত তোমার অন্ধ নয়, না খেতে পেয়ে খারাপ হয়ে গেছ্‌ল।"

"হ্যাঁ মা হ্যাঁ, ঠিক বলেচিস্। গরীবের রোগ ত ওই জন্যেই—। আবার ওষুধ দিস্ মা।"

"আচ্ছা দেবো।—ক্ষুদি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে তোর? নিজের কাজে যাচ্চিস্ না যে?" বলিয়া মণিকা নিজেই চলিয়া গেল।

সর্ব্বাঙ্গ রি রি করিতে লাগিল, বলিলাম, "দেখ্‌লি রে? এই মাগি, দেখ্‌লি ওর কি অহঙ্কার? তোরা যে মানুষ তা ও গ্রাহ্যই করে না!"

কাণা ক্ষুদি ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাইয়া বলিল, "তা বটে বাবু, তা,—তুমি আর দাঁড়িও না এখানে বাবু মশাই। চলে যাও,—থাক্ তবে আমিই যাচ্ছি।"

বাকি রাজকুমার। তাহার কাছে হেঁট্ হইয়া বলিলাম, "কারু ওষুধে কি তোমার চোখ সারছে, রাজকুমার? কিছুতেই নয়, মা-কালী সারিয়ে দিচ্ছেন!"

"তা বটে ত বাবাঠাকুর, তা ত বটেই। মা জগদম্বা, কালী-মায়ি ভাল করে দিচ্ছেন। মানুষের সাধ্যি কি যে—"

বলিলাম, "অত কেন ওর সঙ্গে? গরীব তোমরা, ঠাকুরকেই মান্‌বে! ওর কথা শুন্‌তে যাবে কি জন্যে, ও কি তোমাদের ভাঙা ঘর তুলে দিয়েছে? না—পরকালে তোমাদের মুক্তি দেবে?

"জানো না, রাজকুমার, তুমি জান না,—ও মাগি ঠাকুরের চেলা! জুয়াড়িদের কাছে, পাণ্ডাদের কাছে ওর—বুঝলে? সেদিন শুন্‌লাম, ছাগল ভেড়ার সব মুড়িগুলো ওর ঘরে যায়! এ কি ভাল? তুমিই বল না, রাজকুমার? ওই যে ক্ষুদি—স্বামী ওর মার্‌ত' ধর্‌ত' তবু খেতে পরতে দিত ত? ও মাগির কথা শুনে ক্ষুদি স্বামীটাকে ত্যাগ করেই চলে' এল!"

"তাই ত বাবুমশাই! মেয়েমানুষের কথা শুনে—"

"ক্ষুদি খুব অন্যায় করেছে, কেমন? কিন্তু কারু সঙ্গে সে কথা নিয়ে আলোচনা করবার দরকার নেই তোমার, রাজকুমার। যা কচ্চ' তাই কর।"

আড়াল হইতে আচম্‌কা মণিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়া অন্ধ একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল, "আচ্ছা বাবুমশাই, কতক্ষণ থেকে যে তোমায় চলে যেতে বল্‌ছি, তবু—যাও—ভাগো।"

রাগে ক্ষোভে অপমানে দিশেহারা হইয়া গেলাম। যাইতে যাইতে ফিরিয়া দেখি অদূরে মণিকা সরিয়া গিয়া অকারণেই জগমোহনকে তিরস্কার করিতেছে।

মুখে তাহার হাসি।

সরিয়া গেলাম।

মাঝপথে বেহারীর সঙ্গে দেখা। তিরস্কার খাইয়া মুখখানা কেমন সঙ্কুচিত।

একটি হাত তাহার কাটা। আগে সে এখানে পাঁঠা-বলির কাজ করিত। কিন্তু কোন্ এক অশুভ দিনে কেমন করিয়া চিরনিরীহ একটা ছাগল হাঁড়িকাঠে প্রাণ দিবার সময় হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া একটি হাত তাহার কামড়াইয়া ধরে। দুই পাটি দাঁত দিয়া হাতের খানিকটা মাংস ছিঁড়িয়া লয়। দাঁতের বিষ লাগে,—আধখানা হাত বাদ দিতে হয়।

বলিলাম, "বেহারী, তোদের পাগলামি দেখ্‌লে হাসি পায়। পৃথিবীর আদি-অন্তকাল মানুষে যার পায়ে মাথা কুটে মরচে, চোখের জলে যার পা-ধোয়া চলেছে দিনরাত, সে সত্যি হক্ মিথ্যে হক্, তার ওপর তোদের দরদ নেই, আর ওই মেয়েটা—স্বভাব চরিত্র ওর কেমন কে জানে—ওর জন্যে তোরা পাগল?"

বেহারী চুপি চুপি বলিল, "কি জানি বাবুমশাই, দিদি বলে, 'ঠাকুরের পূজোর চেয়ে মা বোনের সেবা করা বেশী দরকার।'"

"দেখ্ দেখ্—আস্পর্দ্ধাটা দেখ্ একবার। কি জানিস্, ওর হিংসে হয়! মেয়েমানুষ কিনা, তাই মেয়ে-ঠাকুরের ওপর হিংসে! হবেই ত, জানা কথা। এখনও সাবধান বল্‌ছি, নৈলে—। আচ্ছা, মা তোর কেমন আছে?"

"দিদি ওষুধ দিয়েছে।"

"দিদি দিলে! কোত্থেকে,—কিনে দিলে নাকি?"

"হাঁ বাবুমশাই। ও যে বড়লোকের মেয়ে, সোনার গয়না বেচে এইসব করে।"

গায়ে যেন বিষের জ্বালা দিল, "তা ত দেবেই। তোরা গরীব, তোদের মজাতে হলে প্রথমে ঘুষ না দিলে উপায় কি?"

"তাই ত বাবু, তা হলে কি করি?"

"নাও! বোঝ এইবার!—এই বেলা গলায় কাপড় দিয়ে ঠাকুরের পায়ে মাথা কুটে চরণামৃত নিয়ে খাওয়া গে'। কিন্তু যে পাপ করিছিস্ তোরা, উপকার কি হবে ওতে!"

তাই ত বাবু, তাই ত,—মা যে আমার—" তারপর হঠাৎ কণ্ঠস্বর বদ্‌লাইয়া বলিল, "যখন তখন তুমি এম্‌নি করে' আমাদের বকাবে, এ তোমার কেমন ধারা রীত্ বাবুমশাই? যেচে দরদ দেখাতে কে তোমায় বলেছে?—আমিই যাচ্ছি চলে।"

হন্ হন্ করিয়া সে চলিয়া গেল।

ফিরিয়া দেখিলাম, মলিকা বেহারীর পথের দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে।

পাশেই ক্ষুদি দাঁড়াইয়া। তাহার গায়ে একটা টিপ্ দিয়া সে বলিল, "বেহারীটা ভালমানুষ কিনা তাই কেবলই পরের কথায় নাচে!"

জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলাম, "কিন্তু যে খেলা খেল্‌ছ তুমি, বাহবা না দিয়ে থাক্‌তে পাচ্ছি না!"

"শুধু ত খেল্‌ছি না, খেলাচ্ছিও।" বলিতে বলিতে চক্ষের নিমেষে তাহার মুখের উপর হইতে হাসির ছায়া সরিয়া গেল, বলিল, "অনুগ্রহ করে আমাকে 'আপনি' বলবেন এবার থেকে।"

বলিয়া দ্রুতপদে সে চলিয়া গেল।

আড়ালে আবডালে মহাদেবের সঙ্গেই কথা চলে।

বলে, "নামাবলী আপনার গায়ে যেন মানায় না, বাবু-মশাই।"

হাসিতে হাসিতে বলি, "কেন হে?"

"না বাবু—না, বাবুলোক আপনারা—জামা পর্‌বেন, চাদর চড়াবেন, তবে ত!"

"পূজো কর্ত্তে হয় যে!"

"পূজো কর্ত্তেই বা যাবেন কেন! পূজোয় মন ত আপনার ছিল না আগে?"

"হাসির কথা বল্‌ছ, মহাদেব! পাপ করেছি বলে বুঝি একটু পুণ্যিও কর্ত্তে পাব না?—তোমরা আর তোমাদের ওই দিদিটি দিন দিন যেমন নাস্তিক হয়ে উঠ্‌ছ,—বামুনের ছেলে হয়ে আমি ত আর তা পারি নি!"

মাথা চুল্‌কাইয়া মহাদেব বলে, "কিন্তু বাবুমশাই—"

কি যেন বলিতে বলিতে সে থামিয়া যায়।

মাথায় আমার টিকি নাই তবু চাঁদির বড় বড় একগুছি চুলে টিকি বাঁধিয়া, কপালে চন্দন লেপিতে লেপিতে বলি, "বল না কি বল্‌ছ, থাম্‌লে কেন, মহাদেব? আমার এই সব দেখে দিদি তোমার মুখ টিপে টিপে হাসেন বুঝি?"

ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া মহাদেব বলে, "না—না বাবু,—না, পূজো-টুজো এ আপ্‌না হতে হবে না—না।" বলিতে বলিতে সে খানিক দূর যায়, পিছন ফিরিয়া অতি বিজ্ঞের মত আমাকে একবার দেখে, তারপর আবার একদিকে চলিয়া যায়।

পূজায় অর্চ্চনায় ভক্তিতে আবার কোনোদিন যে এ-বুক এ-মুখ, জীবনের এই রুক্ষতা কোমল হইতে পারে—বিশ্বাস করে না যেন কিছুতেই ও হতভাগা!

... ঠাকুরের নিকট আমায় যাইতে দেয় না— বাহিরে বসিয়াই পূজা সারিতে হয়।

মণিকা আসে-যায় দেখি। তাহার মুখের ভিতর যে হাসি ফেনাইয়া ওঠে তাহা যেন কেমন করিয়া টের পাই।

নাক-কাটা ট্যারা সেই ছেলেটাকে ডাকিয়া বলিলাম, "মাসিকে তোর বলিস্, আমি তাকে ক্ষমা করেছি।"

"অ্যা?"

"মাসিকে তোর বলিস্—"

"অ্যা—কি বল্‌ছ?"

"বেটা কালা!"

"কি, শালা বল্‌ছ আমাকে?"

মণিকা কোথা হইতে বাহির হইয়া ছেলেটার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "না রে না, তা নয় গাধা, উনি বল্‌ছিলেন যে, আমাকে উনি ক্ষমা করেছেন!—ধন্যবাদ!" বলিয়া একটুখানি হাসিয়া আমায় ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া ছেলেটির হাত ধরিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

দরিদ্র বিকৃত সেই ছেলেটা রোগে চীৎকার করিতেছে তখনও, আমি তাহাকে গালি দিয়াছি।

হতভাগা জানে না, তাহার সহিত ওই সম্বন্ধটি পাতাইবার এতটুকু অবসর আমার নাই।

মুখে হাসি—কিন্তু রাগে তখন জ্বলিতেছি।

.

দল ভাঙিয়া গেল। দানা একত্র করিলাম—জোট বাঁধিতে পারিলাম না। দিনে দিনে একে একে এ-গেল, ও-গেল, সে-গেল।

তবে দৈবাৎ দেখা হইলে মুখ এড়াইতে পারে না, থমকিয়া দাঁড়ায়। বলে, "ভাল আছ, ঠাকুর?"

"হুঁ।"

সে দিন গণেশ বলিল, "চল্‌বে নাকি এক ছিলিম?"

তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

"গাঁজা, গাঁজা,—হবে না দাদা একহাত?"

"আমি কি গাঁজা খাই?"

"খাও না তা জানি, টানো ত? দিদি কি আর মিথ্যে কথা বলে?"

একটুখানি থামিয়া বলিলাম, "আর কিছু বলে নি তোমার দিদি? শুধু গাঁজা?"

"তা তোমার রকম-সকম দেখে দিদি সব কটা নেশারই নাম করেছে বটে।"

গুম্ হইয়া চলিয়া গেলাম। আস্তে আস্তে বাঁকা হাসি হাসিয়া গণেশও চলিয়া গেল।

ও-বেলায় পূজা সারিয়া বাহিরে আসিতেই গণেশের সঙ্গে আবার দেখা। তাড়াতাড়ি তখন সে কোথায় চলিয়াছে।

"কোথায় হে, কোথায়?"

"এই ঠাকুর, একটুখানি ... ওই বকুল তলায়। বিশেষ দরকারে ... এস না তুমি?"

"চল।"

সন্ধ্যা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সরকারদের অনাবৃত বাগানের একধারে আসিয়া বকুল তলায় কোঁচার খুঁট বিছাইয়া গণেশ বসিল। তারপর একটুখানি হাসিয়া গাঁজার মোড়ক ও কলিকা বাহির করিয়া বলিল, "এই জন্যেই—তা ব'স না ঠাকুর, তাড়াতাড়ি আর কি।"

"নাঃ—।"

কলিকা প্রস্তুত করিয়া সে টানিতে লাগিল।

বলিলাম, "দিদির তোমার খবর কি গো?"

"বড্ড ব্যস্ত এখন সে। তিন তিনটে রুগী তার হাতে।"

"রুগীর সেবাও করে না কি?"

কলিকায় একটা জোরে টান্ দিয়া গণেশ কহিল, "ওইতেই ত ওর যশ, দাদা। রুগীর মা বাপও লজ্জা পেয়ে যায় ওর সেবা দেখলে।—এই ত রুগী তিনটেকে ত চাঙ্গা করে নিয়ে এল!"

... বদনাম যখন রটিয়াছে,—নেশা করতে আর আপত্তি কি!

"দাও ত গণেশ একটান্?"

জলন্ত কলিকাটি তাহার হাত হইতে ধরিয়া লইলাম। উপরো উপ্রি দু তিনটা টান্ দিয়া খুস্ খুস্ করিয়া কাসি।

"ন্যাকড়া নাও, ন্যাকড়া। ঠাণ্ডাও থাকবে, কাসিও লাগবে না।"

নোংরা বিবর্ণ একটুখানি ন্যাকড়া কলিকায় জড়াইয়া আবার টান্।

... অন্ধকার! সুমুখে বাগানের ওধারে দিনান্তের চিতা ইহারই মধ্যে কখন্ নিবিয়া ছাই হইয়া গেছে। চোখেও অন্ধকার, বাহিরে রাত্রির অন্ধকারও তেম্নি ধীরে নিঃশব্দে জাল বুনিয়াছে। গাছে গাছে ঝোপে ঝোপে জটা বাঁধিয়া সে ভয়ঙ্করী সুমুখে দাঁড়াইয়া!

"দিদিটি তোমার বেশ, না গণেশ?"

"হুঁ বেশ, খুব ভাল,—তোফা,—দিদিকে গাঁজা ধরাবো এইবার।"

"জগমোহন ছোক্রার সঙ্গে যা ব্যাপার,—তাও বেশ!"

গণেশের তখন নেশা ধরিয়াছে, "সত্যি না কি, কি ব্যাপার দাদা?"

"এই সব বেচাল আর কি! মেয়েমানুষের যা হয়ে থাকে।" তারপর তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া পুনরায় কহিলাম, "আমার সঙ্গেও চেষ্টায় ছিল দিনকতক। বলো না যেন এ কথা কাউকে?"

জড়াইয়া জড়াইয়া গণেশ বলিল, "কাউকে না? দিদিকেও না?"

আমারও তখন বেশ নেশা!—"খবরদার!"

খানিক পরে গণেশ কাত্ হইয়া পড়িয়া বলিল, "আর বসে কেন ঠাকুর,—যাও না চলে? যাও—খসে পড়। শুই একটু এখানে।"

"সে কি! এই বাগান ... অন্ধকার! কামড়ায় যদি কিছু?"

"সে ঠিক বিষে বিষক্ষয় ক'রব ... যাও তুমি, যাও।"

মুখ গুঁজিয়া সে সেই অন্ধকারে একাকী বাগানের মধ্যে পড়িয়া রহিল। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় আস্তে আস্তে আমি উঠিয়া আসিলাম।

* * *

জীবন না ভোজবাজী!

পট্ পট্ করিয়া মন্দিরের তিন চারিটা লোকের শেষ হইয়া গেল। ওলাউঠার রোগী, বীভৎস! কোনো উপায়েই রক্ষা হইল না; মণিকার অক্লান্ত সেবাতেও না, আমার দেওয়া ঠাকুরের ফুল চরণামৃতেও না।

কিন্তু মুষলধারায় বর্ষার সেই রাতে অন্ধ রাজকুমারকে পুড়াইতে গিয়া শ্মশানকে যেন নূতন করিয়া দেখিলাম। প্রকাণ্ড ছায়াময় বটগাছটার তলায় গঙ্গার অবিরাম জলস্রোত, জীবনের উন্মত্ত স্পন্দন চারিদিকে,—তবু মনে হয়, সব যেন মরিয়া গেছে! শীর্ণ একটুখানি প্রাণ লইয়াও এ পৃথিবীতে যেন কেহ আর বাঁচিয়া নাই। বিষাক্ত নীল আকাশের কারাগারের মধ্যে থাকিয়া জীব-জানোয়ার গাছ-পালা, দেবতা-মানুষ সব যেন স্থির অবিচল ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর এই মহা-বিনাশের প্রতি করুণ-কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে!

... শুধু ওলাউঠা নয়,—বসন্তও।

মহাদেবের ছোট ছেলেটার হইয়া গেল সে দিন সকালেই।—

কিন্তু বিস্মিত করিল কাণা-ক্ষুদি। রান্না করিল, খাইল, ভিক্ষা করিল, শেষে অবেলায় কাপড় মুড়ি দিয়া যাত্রী-ঘরের এক কোণে গিয়া শুইল।

তিন দিন তাহার তল্লাসই নাই।

হঠাৎ সে দিন এক সময় দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া মণিকা বলিল, "আসবেন এ দিকে একবার?"

মুখ বাড়াইলাম,—"কেন?"

"ফুল চরণামেত্ত একটুখানি যদি দেন্, ক্ষুদিটার বড্ড বসন্ত হয়েছে।

তাহার সঙ্গে গিয়া ক্ষুদিকে দেখিয়া আসিলাম। সমস্ত বসন্তের গুটি তখন পাকিয়া উঠিয়াছে। বয়স্থা মেয়েটির সে অনাবৃত বীভৎস চেহারা দেখিলে যেন ভয় করে।

বলিলাম, 'জাত বসন্তর ডাক্তারি ওষুধ নেই বটে তবে আমার ওষুধও দিতে পারব না।"

"কেন বলুন ত?"

"যদি না সারে ত ঠাকুরের অপমান!"

মুখ নীচু করিয়া মণিকা একটুখানি চুপ করিয়া রহিল, তারপর কহিল, "মা কালির চরণামেত্ত আপনি নিজের হাতে যদি দেন্ তাতেও—"

"আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই নে।" তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম।

কিন্তু ক্ষুদি সারিয়া উঠিল। উঠিল বটে, অবশিষ্ট চোখটিও তাহার বসন্তে নষ্ট হইয়া গেল।

... রোগ তখন আশে পাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।—এই ছুটা রোগই!

দোকান পাট বন্ধ।

মানুষের সমাগম বড় একটা নাই। পথে কুকুর বিড়ালের দল তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে।

ভিখারীর ভিক্ষা জোটে না। কচিৎ দু একটা পথিক যায়, ভিখারীরা হাত পাতিয়া তাহাদের পিছু পিছু ছুটিয়া চলে।

বেহারী নাই, রম্ভা নাই,—মহাদেবও নিরুদ্দেশ।

মণিকাকেও আর নজরে পড়ে না।

বৃদ্ধ সেই খোঁড়া ভিখারীটার বউনি আর হয় না—দেখাও যায় না। বোধ করি স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

নাক-কাটা টারা সেই ছেলেটাকে মধ্যে-মধ্যে দেখি, এটা ওটা হাত-সাফাই করিয়া পলাইতেছে।

ছোট সেই মেয়েটা—শুনিলাম, কোন্ একটা ছোঁড়ার সঙ্গে সে সরিয়া পড়িয়াছে।

ব্রহ্মচারী জগমোহন তেম্‌নি করিয়া পুঁথি পড়ে আর ফ্যাল ফ্যাল করিয়া এদিক ওদিক তাকায়।

কাহাকে যেন খোঁজে। আমাকে হয়ত তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে চায় কিন্তু মুখ ফুটে না।

বুড়া দেবীদাস তেমনি করিয়া পাকা দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলে, "জানতাম ছুঁড়ির ঢঙ। ফুল আনে, নৈবিদ্যি আনে—পূজো করে না! হিঁদুর মেয়ে হয়ে ঠাকুরের উপর ভক্তি নেই! ভৈরবী সেজে থাক্‌ত, এইবার মনের মানুষ পেল, উড়ে পালিয়ে গেল! পুরোনো কথা,—জানা কথা!"

জগমোহন ঘাড় ফিরাইয়া হয়ত প্রতিবাদ করিতে যায়, কিন্তু মুখে ভাষা আসে না।

পূজা ছাড়িয়া দিয়াছি।

কিন্তু মায়ের ক্ষুধিত রসনার আহার যোগাই।

মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা হইয়া গেছে কিন্তু ওঁর ক্ষুধা মিটে নাই। আরও রক্ত, আরও মাংস, আরও জীবন চাই!

আর তার দাতা আমি। প্রতিদিন অনেকগুলি করিয়া ছাগল কাটিয়া দিই।

খাইতে পায় না,—থাক্।

সেদিন গণেশের সঙ্গে আবার দেখা

বলিল, "বদ্‌নাম যে হাওয়ায় উড়ে আসে তা দেখ্‌লে ত ঠাকুর ?"

"কি রকম ?"

"ওই বেবীদাস বুড়োর কথা শোন নি ?—উঃ, কি বোষ্টম মেয়েমানুষ, এতগুলো মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে কি শুধু সেজেই বেড়াত ! আমিও জানতাম, অত যার মুখমিষ্টি সে ভাল হতে পারে না !"

বলিলাম, 'তবু ত একদিন সে ভাল ছিল, উপকারও পেয়েছিলে তোমরা তার কাছে।"

"রেখে দাও ঠাকুর, তোমার কথা !—উপকার ! ঝাড়ু মারি অমন ইয়েতে। গোড়া থেকে তোমার কথা না শুনে কি ভুলই করেছি !"

এই কথা ঠিক মহাদেও সেদিন বলিল। হেঁট হইয়া আমার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, 'মাপ কর ঠাকুর, মাপ কর। একটা ছুঁড়ির পাল্লায় পড়ে তোমার মতন দেব্‌তাকে ভুলেছিলাম, জাগ্‌গের্ত্ত ঠাকুরকেও আমল দিইনি,—সেই পাপে আজ এই দশা !' বলিয়া মন্দিরের রুদ্ধ দুয়ারের উদ্দেশে বার বার মাথা ঠুকিয়া সে পুনরায় কহিল, "হুদি, হাবু, ফেনাকি, রম্‌না, বেহারী,—ওদের সকলকে নিয়ে আজ সন্ধ্যের পর জড়ো হয়ে তোমাকে আমাদের নায়েক ক'রব। আমাদের কেউ নেই ঠাকুর, বড় অভাগা আমরা।" বলিয়া আর একবার পায়ের ধুলা লইয়া সে চলিয়া গেল।

... অকৃতজ্ঞ, না হতভাগ্য—কে জানে !

জীবনের পথে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেমন এই মন্দিরে আসিয়া আশ্রয় লইয়া ছিলাম আজ যাইবার বেলায় মনটা কেননি একবার খাঁ খাঁ করিয়া উঠিল।

ক্লান্ত এই দিনের অবসানে বসিয়া বসিয়া মনে হয়, যে বিপুল প্রাণসত্তার ইহার একদিন ছিল তাহা নিঃশেষে মরিয়া গেছে। দেবতা যে ছিল সে আর নাই, যা আছে তা দেবতার অনুকরণ !

... নিজের কাছে মিথ্যা অভিনয় করিয়া এই যে হতভাগ্য কতগুলা অবুঝ্ দর্শকের কাছে যশের প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহারই পাষাণ ভার আজ না-জানি কেমন করিয়া নিজেরই কাঁধে চাপিয়া মাথা অবনত করিয়া দিল !

অভিনয় করিয়াছি নিখুঁত—কোনও ত্রুটি হয় নাই—কিন্তু তাহার অন্তরালে যাহাকে চাবুক মারিয়া বিকল করিয়া ফেলিয়াছি,—আপনার মধ্যে তাহার সেই সকরুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া চক্ষে জল আসিল।

বাহিরে তখন বাদলের মাত্‌লামি—

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঘন মেঘের আড়ালে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত নিশ্চল অন্ধকার !

মহাদেবের দল যাহাতে খুঁজিয়া না পায় এ জন্য জলে ভিজিতে ভিজিতে লুকাইয়া নাটমন্দিরের একটি অন্ধকারে আসিয়া বসিলাম।

হউক ইহা কাপুরুষতা, হউক মিথ্যা,—কিন্তু নিজেকে বাঁচাইবার এ ছাড়া আর অন্য পথ কই ?

রাত্রি গভীর হইয়া উঠিতেছিল।

ঝড় বৃষ্টির অবিরত ঝম্ ঝম্ শব্দে এদিকের সমস্ত সাড়াশব্দ চাপা পড়িয়া গেছে।

মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে ভিজিয়া এক একটা আশ্রয়হীন কুকুর এ দিক হইতে ও দিকে চলিয়া যাইতেছিল।

বড় বড় ইঁদুরের কিচ্‌কিচে শব্দও কানে আসে।

অকস্মাৎ পিছন দিক হইতে কে বলিল, "বসে কে এখানে ?"

মুখ তুলিয়া বলিলাম, 'আমি গো আমি।"

"আপনি ? শীঘ্র আসুন,—আপনাকেই খুঁজ্‌তে বেরিয়েছি।" বলিতে বলিতে জগমোহন একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমার একটা হাত ধরিল।

"কেন, কোথায় যেতে হবে ?"

"সে বল্‌ছি, আসুন চট্ করে।"

প্রবল বৃষ্টি মাথায় করিয়া দুজনেই অন্ধকারে বাহির হইয়া আসিলাম।

পথে সরকারদের বাগানের পাশে সঙ্কীর্ণ একটা ক্ষুদ্র গলিতে জল জমিয়াছে। তাহাই ঠেলিয়া দুজনে চলিতেছিলাম।

জগমোহন বলিল, "ডাকচেন একবার আপনাকে।"

"কে?"

"কে জানেন না? আপনার জন্যে পথ চেয়ে আছেন তিনি!"

কে তাহা বুঝিলাম কিন্তু কেন জানি না ভয়ে লজ্জায় পা দুইটা যেন একেবারে অবশ হইয়া আসিল।

নোনাধরা ইটের দেওয়াল ঘেরা খোলার ছাউনির ঘর।

বৃষ্টির তখনও বিরাম নাই। সুমুখের জায়গাটুকুতে জল কাদা ছপ্ ছপ্ করিতেছে!

দালানের উপর পা দিতেই দেখি, দরজার কাছেই দেয়ালে ঠেস্ দিয়া একটা লোক নিঃশব্দে চোখ বুজিয়া আড় হইয়া বসিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে অল্প একটুখানি আলো আসিয়া তাহার গায়ের একটা দিকে পড়িয়াছে।—গলায় তাহার একগাছা ফুলের মালা।

নেশা করিয়াছে!

ঘরে ঢুকিতেই হঠাৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসির শব্দ কানে আসিল। এবং সেই হাসির অনুসরণ করিয়া যাহাকে দেখিলাম—সে মণিকা! কিন্তু তাহাকে আর চেনা যায় না,—সারা গায়ে বসন্তের গুটি পাকিয়া বিকৃত বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

জগমোহন তাহার নিকট হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "ঠাকুরকে এনেছি, কি বল্‌বে বল।"

সাড়া পাইয়া চমক ভাঙিতেই সে তাহার অর্দ্ধ-অনাবৃত দেহে কাপড় টানিয়া ঢাকা দিবার চেষ্টা করিল। তারপর বলিল, "এনেছ?—বেশ, এবার যেতে বল! আন্‌তে বলেছিল কে? আমি নয়, আমি বলিনি!—যাও ঠাকুর, যাও, পূজো করগে। আচ্ছা, ওষুধ দিতে পারো,—ওষুধ?"

মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতেছিলাম। জগমোহন হাত ধরিয়া ফেলিল, যাবেন না, এই জন্যেই ত নিয়ে এলাম আপনাকে!"

মুখের মধ্যে কথাগুলা কেন যে আট্‌কাইয়া গিয়াছিল—ভাবিয়া পাইলাম না। জগমোহন বলিল, "পাগল হয়ে গেছে, দেখ্‌চেন না?"

"পাগল!"

"হাঁ, যাদের নিয়ে ওঁর সংসার ছিল তারাই পরামর্শ করে' ওষুধের নামে কি খাইয়ে দিয়েছে।"

"কেন?"

"কেন আবার কি! ভাবলে, মন্দিরের এই মড়কের জন্যে ও দায়ী, ওর [illegible] শুনে ঠাকুরকে না মেনে এই দশা,—এই মহামারী!"

মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ঘরের এককোণে বসিয়া মণিকা তখন গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়াছে।

কি জানি কেন চক্ষে আমার জল আসিল। এ অশ্রু কি আগুনের উচ্ছ্বাস তাহা যেন নিজেই ভাবিয়া পাইলাম না। অথচ রাগ করিব কাহার উপর?—দেবতা. না মানুষ দায়ী,—তাহাই বা কে জানে!

চলিয়া যাইতে যাইতে জগমোহন বলিল, "দাঁড়ান্ আপনি এখানে। দেখি, যদি কোথাও থেকে বরফ কি ওষুধ কিছু আন্‌তে পারি।"

ঝুপ্ ঝুপে বৃষ্টির মধ্যেই সে আবার বাহির হইয়া গেল

নেশাখোরটা তখনও তেমনি ভাবে সেখানে বসিয়া ঝিমাইতেছিল।

ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া মাথায় হাত রাখিয়া বলিলাম, "মণি!"

সে মুখ তুলিল। তারপর হঠাৎ হাসিয়া বলিল, "ভালবাসার কথা? বল, বল,—থামলে কেন, বল না গো!"

"এমন হলে কেন তুমি ?"

"পাগল হলাম নাকি ?—দেখ, ক্ষুদিকে বলো, তার মাতাল স্বামীকে আবার যেন সে নেয়। আমিও নেবো, হলই বা নেশাখোর !" বলিতে বলিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সে পুনরায় কহিল, "কেন এলে তুমি ?"

বলিলাম, "আগে আমায় খবর দিলে না কেন ?"

সে-কথার উত্তর না দিয়া সে কহিল, "ওরা আছে ত ? ভাল আছে ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সে কথা শুনে তোমার লাভ কি !" বলিতে বলিতে উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিলাম, "আজ তোমার এই দশা করেই ওরা শুধু ক্ষান্ত হয়নি,—বদনাম দিয়েছে পর্য্যন্ত ! ওরা এমনি নীচ, পাপী, এমনি আত্মঘাতী !"

কোন্ সুদূর হইতে কি এক অস্বাভাবিক কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "ওরা যে গরীব !"

তারপর অকস্মাৎ আমার পায়ের উপর পড়িয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "না না—পার্বে না, কিছুতেই না। অনর্থক জীবহত্যা তুমি কর্ত্তে পার্বে না। পায়ে পড়ি তোমার, ওদের প্রাণ আমায় ভিক্ষে দাও। আমার ওপর রাগ করে' ওদের আর—।"—ঝর ঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

আমারও চোখে তখন জল ! তাহার মুখটি ধরিয়া তুলিলাম। হউক তা বসন্তে বিকৃত, তবু এমন রূপ চোখে পড়ে না। বাব্‌লি, বসন্তিরা,—তাহারাও যেন এই কুৎসিত মুখখানির কাছে হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল।

চমক ভাঙিলে বলিলাম, "মণি !"

হাসিতে হাসিতে মণিকা ভুরু তুলিল।

"হাড়িকাঠে ওদের মার্ত্তে গিয়ে তোমাকেও মেরেছি,—আমায় মাপ কর্বে ?"

উত্তর পাইলাম না—তাড়াতাড়ি জগমোহন আসিয়া ঢুকিল। গায়ে মাথায় তাহার জল ঝরিতেছে।

"বরফ শুধু পেলাম, আর কিছু না।"

মণিকা তেমনি হাসি মুখেই তাহাকে বলিল, "জগমোহন, চিরটা কাল পুঁথিগত বিদ্যেই তোমার রয়ে' গেল, ভাই ?"—খিল্ খিল্ করিয়া আপনার খেয়ালেই সে হাসিতে লাগিল।

অকস্মাৎ জগমোহন যেন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঈষৎ আলোকে দেখিলাম, কি করিয়া কি ভাবে তাহার মুখখানা ক্রমে ক্রমে বিবর্ণ রক্তহীন হইয়া গেল ! হাতের বরফের চাইটা মাটিতে পড়িয়া চুরমার হইল এবং হাত বাড়াইয়া আর কোথাও কিছু না পাইয়া অন্ধকারে দেয়ালটাই সে দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

* * *

আবার পথ—।

ধূলি ধূসর ধরিত্রীর স্পন্দহীন রুক্ষ বুকের উপর আবার জীবনের ক্লান্ত অভিযান !

ঝড় বৃষ্টির দাপটে আতুর বালিকার মত আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সে যেমন লুটাইয়া পড়ে; দীপ্ত মধ্যাহ্নের অনল শিখায় তেমনি আবার পুড়িয়া পুড়িয়া একাকার হয়। গাছ-মাটি-তৃণ-আকাশ একান্ত নিরুপায়ে সেই বিশ্বগ্রাসী অগ্নিকাণ্ডে আপনাদের ছাড়িয়া দেয়।

দিনের বেলায় সে ব্যাভিচারিণী ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হাহাকার করে,—রাত্রির নির্জ্জন অন্ধকারে নিঃশব্দে কাঁদে। চোখের জল ফুটিয়া ওঠে তারায় তারায়।

হয়ত বা তার প্রায়শ্চিত্ত !

উন্মাদিনী সে দুশ্চরিত্রা অগ্নিকুণ্ড বুকে ধরিয়া অবিরাম নিষ্ফল তৃষ্ণায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে।

আর তারই পাশে এরা,—সমস্ত জীব, সমস্ত প্রাণী, সমস্ত বুভুক্ষিত উৎপীড়িত মানবাত্মা,—এই সর্ব্বনাশিনী শিখাকুণ্ডে আত্মদান করিয়াছে !

এ হত্যাকাণ্ডের শেষ নাই।—

আরবী গল্প

আবুল ফজল

একাদশ শতাব্দীর আরব-সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ও মকামা লেখক হারিরী থেকে এই মকামাটি প্রাচীন আরব-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের সামান্য পরিচয় সাধনের জন্যে অনূদিত হইল। হারিরীর পূর্ণ নাম আবু মোহাম্মদ আল্‌কাসেম্ ইব্‌নে আলী আল্‌হারিরী। তিনি হিজরী ৪৪৬ সালে (১০৩০ খৃঃ) বসরানগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৫১৬ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুপ্রসিদ্ধ আরবী জীবন-চরিতাভিধান প্রণেতা ইব্‌নে খালেকানের মতে পারস্যের হিরাত নগরে তাঁর মৃত্যু হয়—এবং তাঁর প্রকৃত মৃত্যুর আগেই নাকি তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

মকামা জিনিষটি বাঙালী পাঠক হয় ত ঠিক বুঝবেন না, কারণ এ রকম জিনিষ আমাদের সাহিত্যে নেই। এইগুলি অনেকটা জীবন-কাহিনীর মত, ইংরেজীতে যাকে ancedote বলে, অনেকটা আবার adventure-র মতও। এগুলি গদ্য পদ্যে মিশ্রিত ভাবে লেখা। হারিরী মকামা ছাড়া আরও কতকগুলি ভাল ভাল বই লিখে গিয়েছেন—কিন্তু মকামাগুলিই তাঁকে সাহিত্যে অমর করে রেখেছে। ঘটনা এবং বর্ণনা-প্রণালীর দিক দিয়ে হয় ত এই বইগুলি আধুনিক পাঠকের কাছে খুব চমকপ্রদ নয় কিন্তু ভাষার গাম্ভীর্য্য, অলঙ্কার ও গুরু গম্ভীর শব্দ সম্পদের দিক দিয়ে বইগুলি শুধু আরব-সাহিত্যে নয়—বিশ্ব-সাহিত্যেও অতুলনীয়! ভাষাকে অবিকল রূপান্তরিত করতে গেলে হয় ত বাঙালী পাঠক অস্বস্তি বোধ করবেন—তাই আমরা শুধু ঘটনাটিকেই আমাদের ভাষায় যতদূর সম্ভব আরবী বাক্যাবলীর ভাব ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে বাঙলা মূর্ত্তি দিলুম। কবি প্রত্যেক মকামাতেই সিরাজবাসী আবু জয়েদ এই নামটিকেই নায়করূপে দাঁড় করিয়েছেন এবং হারেস্ ইব্‌নে হাম্মাম নামে আর একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে ঘটনাটিকে বর্ণনা করিয়েছেন। হারিরী তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে আরব-সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর প্রায় সব মকামাগুলিই ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কুফানগরে

হারেস্ ইব্‌নে হাম্মামের কথা।

এক আলো-ছায়াময় রাত্রে তখনও আকাশের গায়ে চাঁদটি রজতচক্রের মত শোভা পাচ্ছিল। কুফানগরের এক গৃহে সেকালের শ্রেষ্ঠবক্তা-বন্ধুদের সঙ্গে আমি কথাবার্ত্তা কইছিলুম। সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সবাই ছিলেন জ্ঞানে ও মনীষায় দেশের শীর্ষ স্থানীয়। যাঁদের কাছ থেকে প্রত্যেকে কিছু না কিছু শিখ্‌তে পারে—যাঁদের সঙ্গ মানুষের লোভনীয়। খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলছিল। সবাই প্রাণ দিয়ে আনন্দ উপভোগ করছিলেন, নিদ্রা সে রাত্তিরে কারুর চোখে আশ্রয় পায় নি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চাঁদ পশ্চিমাকাশে ডুবে গেল—মসীবর্ণ অন্ধকার চারদিক ঘিরে এল। নিকটে দূরে আর কিছুই রইল না—শুধু নিস্তব্ধতা। নিশীথশেষে সবাইর আঁখি তখন নিদ্রায় ঢুলু ঢুলু। হঠাৎ বাইরে দরজার কাছে দূরাগত পথিকের আহ্বান ধ্বনি শুনা গেল। পরক্ষণেই দরজায় ধাক্কা পড়ল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত রাত্রে কে?'

পথিক উত্তর দিল,—

'শুনুন্ গৃহবাসী, পাপ যেন আপনাদের স্পর্শও করতে না পারে, আপনাদের যেন কোন বিপদ আপদ না আসে। চিরজীবন আপনাদের বুক ভরে থাক্! রাতের দুঃখ বিপদ এক হতভাগাকে আপনাদের দুয়ারে তাড়িয়ে এনেছে, যার বিক্ষিপ্ত শ্বেত কেশরাজী ধূলায় ধূসরিত। আজ সে সঙ্গীহীন,

বিপন্ন ; কিন্তু একদিন বহু দূর দূরান্তের পাহাড়ে জঙ্গলে সে ঘুরেছে—তাই আজ তার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে—চেহারা মরার মত সাদা হয়ে গিয়েছে। আজ যদিও সে ক্ষুদ্র নূতন চাঁদখানির মত ক্ষীণ তবু এই সর্ব্বপ্রথম এখানে আপনাদের কাছে আতিথ্য ও আশ্রয় ভিক্ষা করতে সাহস পেয়েছে। সে এই দু'টি জিনিষ পাবার খুবই যোগ্য—তাকে আহার্য্য ও আশ্রয়দানে আপনারা স্বাগত করুন—সে যে জীবনের মাধুর্য্য ও তিক্ততায় সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ এ কথা নিশ্চয় সময়ে বুঝতে পারবেন. আশা করি আপনারা তাকে যথাযোচিত যত্নে গ্রহণ করবেন।'

তাহার সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে সর্ব্বোপরি বলবার অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম! তার উদ্দেশ্য বুঝতে আমাদের আর দেরী হল না। দরজা খুলে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালাম। এবং যা আছে আনবার জন্যে চাকরকে আদেশ দিলাম। আগন্তুক তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'যে আমায় আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছে তারি নাম নিয়ে বল্‌ছি, যদি আপনারা আমায় এই প্রতিশ্রুতি না দেন যে, আমার আগমনে আপনাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না অথবা অসময়ে আমার জন্যে আপনাদের খেতে হবে না; তা না হলে আমি আপনাদের কিছুই স্পর্শ করব না; কারণ অসময়ে খেলে যে খায় তার অসুখ করে এবং তার ফলে সে তার নিয়মের খাওয়াও খেতে পারে না। আর অতিথির মধ্যে সেই নিকৃষ্ট অতিথি যে তার আশ্রয়দাতার অসন্তুষ্টের এবং কষ্টের কারণ হয়। বিশেষত আবার সেই কষ্ট যদি শারীরিক হয়—যাতে শরীরে অসুখ হবার সম্ভাবনা আছে। এক কথা আছে যে, 'দিনের আলোতে খাওয়াই উত্তম খাওয়া।' অর্থাৎ ঠিক সময়ে খাওয়াই উচিত; রাতে খাওয়ায় চোখের দৃষ্টি-শক্তি কমে যায় তাই তা বর্জ্জন করাই উচিত। অবশ্য ক্ষুধার জ্বালায় যদি ঘুম না হয় তখন আর কি করা যায়।'

সে যেন আমাদের মনের কথাই বলল—আমরা তার কথায় সায় দিলাম এবং তার দিল-খোলা ব্যবহারের জন্যে খুব প্রশংসা করলাম। চাকর খাবার নিয়ে এল এবং আলো জ্বালা হল। আমি তাকে একটু ঠাহর করে দেখলাম। বাঃ; এ যে আবু জয়েদ। তারপর আমার সঙ্গীদের সম্বোধন করে বললাম, 'আজকের অতিথিকে পেয়ে আপনাদের আনন্দিত হওয়া উচিত—এই সুদুর্লভ রত্নটি বহু ভাগ্যেই সহজলভ্য হয়ে আজ আমাদের কাছে পৌচেছে। আকাশের চাঁদ ডুবে গেছে বটে কিন্তু আমাদের মধ্যে কাব্যের চাঁদ উদয় হয়েছে—সৌরজগতের চাঁদ ডুবে গেছে সত্য কিন্তু বাগ্মীতার পূর্ণচন্দ্র উদয় হয়েছে। শুনে সকলের মনের মধ্যে আনন্দের ঢেউ উঠল। নিদ্রা সকলের চোখের কোণ থেকে মুহূর্ত্তে পালিয়ে গেল—এতক্ষণ ধরে তারা যে নিদ্রার কল্পনা করছিল তাকে দূরে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সবাই ভিড় করে বসল। আবু জয়েদ এতক্ষণ ধরে দক্ষিণ হস্তের কাজেই ব্যস্ত ছিলেন। যখন খাওয়া সেরে উঠলেন, আমি তাঁকে বল্‌লাম, আপনার আশ্চর্য্য মকামার কিছু শুনিয়ে আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করুন।'

তিনি বল্‌লেন, 'সত্যিই আমি অনেক অত্যাশ্চর্য্য সাহসিক ঘটনার সাক্ষাৎ পেয়েছি—যা অন্য কোন দর্শক দেখে নি বা কোন বর্ণনাকারী আজ পর্য্যন্ত বর্ণনা করে নি। আজকে আপনাদের কাছে আসবার প্রাক্কালে যে ঘটনাটি ঘটে গেল সব চাইতে আশ্চর্য্যজনক সেটি।'

আমরা তাকে সেটি বর্ণনা করতে বল্‌লাম।

তিনি আরম্ভ করলেন,—

'দীর্ঘ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধা ক্লান্তিতে জর্জ্জরিত অবস্থায় আমি এ দেশে এসে পৌছি—আমার থলিয়াটি মূসার মা'র মনের মত হাল্‌কা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই রাতের অন্ধকারে এক টুক্‌রা রুটি ও আশ্রয়ের অনুসন্ধানে আমি উঠে পড়লাম। ক্ষুধার যিনি স্রষ্টা তিনি এবং অদৃষ্ট—যাকে দুঃসাহসের মা বাপ বলা হয়, আমায় তাড়িয়ে এক গৃহ সম্মুখে এনে উপস্থিত করল। আমি গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে বললাম—

'গৃহবাসী! তোমাদের আমার সাদর অভিবাদন—তোমরা সুখ সচ্ছন্দতার মধ্যে দীর্ঘজীবি হও। পরিশ্রমে কাতর এক হতভাগ্যকে তোমরা সাহায্য কর—দু'দিনের ক্ষুধা—ক্ষুধায় জর্জ্জরিত সে, তার মাথা গুঁজবার স্থান নেই। এই নিশীথ রাতেও সে একটি সহৃদয় বন্ধুর অন্বেষণে ঘুরে

রয়েছে—যার প্রাচুর্য্যের মিষ্ট বর্ণাধারায় তার সমস্ত কষ্ট ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যে বন্ধু সোজা বলবে, স্বাগত বন্ধু! তোমার লাঠি গাছটি রাখবার সময় হয়েছে। আজ তোমার অভিনন্দন ও বিশ্রামের দিন।' কিন্তু বেরিয়ে আসল মৃগ-শাবকের ন্যায় একটি সুশ্রী বালক, সে বল্ল,—'যিনি আতিথ্যের কানুন করেছেন এবং যিনি সর্ব্ব প্রথম এবং সর্ব্বতোভাবে সেটিকে পালন করেছেন এবং মক্কায় সর্ব্বপ্রথম তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন—যাতে করে মক্কা আজ তীর্থ যাত্রীর পুণ্যস্থান হয়ে উঠেছে—তাঁরি নামে বলছি, আপনি আমাদের এখানে বন্ধুভাবে সম্বর্দ্ধিত হবেন এবং একটু আশ্রয়ের স্থানও পাবেন—নিশীথযাত্রীর জন্যে আমাদের এই মাত্র সম্বল। আমরা কেমন করে আপনাকে আহার্য্য দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারি? দারিদ্র্যের তাড়নায় আমাদেরই নিদ্রা হয় না—কেমন করে আমরা দান করব। ক্ষুধা রাক্ষসী আমাদের হাড় মাস চিবিয়ে খাচ্ছে!—কি বলেন?'

আমি বল্লাম,—

'আমি একটি খালি ঘর নিয়ে কি করব?—ঘরের মালিকের নিজেরই অভাব। কিন্তু তোমার নাম কি বালক? তোমার বুদ্ধি আমায় চমৎকৃত করে দিয়েছে।' সে বল্লে, 'আমার নাম জয়েদ—যবেদ্ নগরে প্রতিপালিত হয়েছি। কাল মামার সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছি।

আমি আরও বিস্তারিত পরিচয় চাওয়ায় সে বল্ল,—

“আমার মায়ের নাম বিররা—তাঁর নামের মানে যেমন পুণ্য, তিনি ছিলেনও তেমনি পুণ্যবতী।

'তিনি আমায় বলেছিলেন, যে-বৎসর মেহেওয়ান নগরের উপর দিয়ে একটা প্রবল ঝড় বয়ে গিয়েছিল সে বৎসর সিরাজ নগরের একটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিণয় হয়। তিনি যখন প্রথম অন্তসত্বা হন তখন স্বামী কোথায় চলে গেছেন, আর কোন খোঁজ খবর নেই। আজো আমরা জানতে পারি নি, সে বেঁচে আছে না তার দেহ মাটির নীচেই গচ্ছিত রাখা হয়েছে।'

বুঝতে পারলাম এই ছেলে আমারই—কিন্তু আমার বর্ত্তমান দুঃখ দারিদ্র্যের দীনতায় আমি পুত্রকে নিজের পরিচয় দিতে পারলাম না, কাজেই চোখের কোণে অশ্রুধারা নিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে আমি সেখান থেকে বিদায় হলাম। তাই আমি এখন জিজ্ঞাসা করছি—আমার সমঝদার শ্রোতৃবর্গকে, আপনারা কি এর থেকে আশ্চর্য্য ঘটনা শুনেছেন? আমরা বললাম, “যিনি কোর্‌আন বুঝেন তাঁরি নাম নিয়ে বলছি, এ রকম আশ্চর্য্য ঘটনা কখনও শুনি নি।

তিনি বিশ্বের অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাগুলির সঙ্গে এটাকে লিপিবদ্ধ করে রাখুন—স্থায়ী লিপি-সূচীর মধ্যে এরও যেন স্থান হয়—কারণ এ রকম আশ্চর্য্য ঘটনা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নি।

আমরা কাহিনীটি তাঁরই ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রাখলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি ছেলেটিকে নিজের সঙ্গে নিতে চান কি না। তিনি বল্লেন, 'যদি আমার থলেটা একটু ভারী হয়ে উঠে তা হলে আমি ছেলের ভার নিতে পারি।' আমরা বল্লাম, 'যদি কিছু টাকা আমরা উসুল করে দিই তা' হ'লে হয় কি না। যদি হয় আমরা এক্ষুণি চাঁদা করে কিছু দিতে পারি।' তিনি বলে উঠলেন, তাতে হবে না কেন? পাগল ছাড়া কে এতে গররাজি হতে পারে।' কাজেই আমরা সবাই তাঁকে এক একটা চেক লিখে দিলাম। তিনি আমাদের অজস্র ধন্যবাদ দিলেন—সে ধন্যবাদের প্রাচুর্য্য আমাদের দানকে ছাপিয়ে উঠলো—তাঁর অনর্গল ধন্যবাদের বিরাট স্তূপের কাছে আমাদের দান অতি তুচ্ছ হয়ে গেল। তার পর তিনি কিছুক্ষণ আমাদের নানা দেশের বিচিত্র কথা কাহিনী শুনালেন। পরিপূর্ণ প্রসন্নতার মধ্য দিয়ে সে রাতটি শেষ হয়ে গেল। তারপর নব-চেতনাদায়িনী উষা, নিশীথিনীর কালো কেশরাজিকে তার নূতন আলোকে সফেদ্ করে দিয়ে রাঙা হয়ে উঠল। সূর্য্যের প্রথম আলোক আকাশের গায়ে প্রতিভাত হবামাত্র তিনি হরিণের মত লাফিয়ে উঠে আমায় বললেন, চলুন চেকের টাকাগুলি উসুল করে নিই। ছেলের জন্যে আমার মন বড্ড ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।' আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম—সব টাকা যখন উসুল হল, তাঁর চোখ মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল, তারপর বল্লেন, 'আমি প্রতিদান দিতে অক্ষম হলেও আশা করি আপনার পরিশ্রমের জন্যে খোদা আপনাকে প্রতিদান

দিলেন।' আমি বল্লাম, 'আপনার ছেলেটিকে দেখবার জন্যে আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই।' শুনে তিনি আমার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন, যেমন দৃষ্টিতে প্রতারক প্রতারিতের প্রতি তাকায়। এবং হেসে ভণিতা করে বল্লেন,—

'তুমি একটি গল্পে বিশ্বাস করে প্রতারিত হয়েছ—মরীচিকাকে হ্রদ মনে করে। আমার চাতুরী ধরা পড়বে না বা তোমাদের সন্দেহের উদ্রেক করবে না এ আমি কখনও মনে করি নি। স্বীকার করতে বাধা নেই, যখন বিরগা ও কয়েদকে আমার স্ত্রী ও পুত্র বলে বলেছিলাম তখন আমি সত্য বলি নি। ধূর্ত্ততা এবং প্রতারণাই আমার ব্যবসা। এ রকম পথ আমি নিয়েছি যা কোন ধূর্ত্ত বা জ্ঞানী কখনও গ্রহণ করে নি বা কল্পনাও করতে পারে নি। আমি যে সব অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছি—তা আস্‌মে বা কোমারেট*ও বর্ণনা করে যেতে পারেন নি। এই পথ গ্রহণের জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন—কি করি, এ পন্থা পরিত্যাগ করলে ভাগ্যলক্ষ্মী যে আমাকে ছেড়ে যাবে। আমার প্রতারণাকে দোষ ধরে অভিযুক্ত করবেন না।'

তারপর আমার অন্তরে অনুশোচনার তুষানল জেলে দিয়ে সে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

মা

শ্রীরাধারাণী দত্ত

শেষ-চৈত্রের অগ্নিবর্ষী মধ্যাহ্ন। নিদাঘ-প্রখর রৌদ্রের রং চোখ ঝল্‌সানো-সুতীব্র। বাগানের ভিতরে ফুল গাছগুলো শোলার গাছের মত প্রাণহীন আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে অগ্নি-পরীক্ষা দিচ্ছে। তাপসী-পৃথিবী যেন পঞ্চাগ্নি-তপে কৃচ্ছ্র-নিমগ্না।

জানালার সামনে পুষ্প-বহুল পেয়ারা গাছগুলার সবুজ শাখার রন্ধ্রে রন্ধ্রে গন্ধে-মাতাল মৌমাছিদের গুঞ্জনধ্বনির আর বিরাম নেই। বিবিধ রংয়ের প্রজাপতিদলের পরাগ-রঞ্জিত পাখাগুলির উপরে সূর্য্যরশ্মির বিচিত্রতর আলোক-সম্পাত ক্ষণে ক্ষণে অগণন ইন্দ্রধনুর বর্ণলীলা স্ফুরিত করে তুল্‌ছে।

বিকাশ ঘরের ভিতরে পড়ার টেবিলের সামনে তন্দ্রাচ্ছন্ন আঁখি দু'টি জোর করে' টেনে মেলে পাঠ্যপুস্তকে মন-নিয়োগের চেষ্টা করছিল। প্রখর-গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের অলস তন্দ্রাবেশে তার মাথাটি বার বার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে অবশেষে টেবিলের উপরে ন্যস্ত বাহু দু'খানি উপাধান ক'রে বইয়ের পাশে লুটিয়ে পড়ল।

চঞ্চল চরণে একটি কিশোরী বালিকা ঘরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে বিকাশের পিঠ স্পর্শ ক'রে ত্রস্তস্বরে ডাক্‌লে—দাদা, ওঠো—ঘুমিও না—বাবা এই দিকে আস্‌ছেন!

শৃঙ্খলাকারে আবদ্ধ নিজের হাত দু'খানির মধ্যে মাথাটি ভাল ক'রে গুঁজে বিকাশ নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বললে—জ্বালাতন করিস্‌নে, এখান থেকে যা' বল্‌ছি—

—যাচ্ছি। কিন্তু বাবা যে এই দিকে আসছেন!

---

* সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী দুই জন আরবীয় পণ্ডিত।

বিকাশ উত্তর দিল না।

—দাদা,—অ' দাদা—শুনছো? ওঠো শীগ্‌গির—

কিশোরী বিকাশকে ঠেলে ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করল।

তন্দ্রাজড়িত বিরক্তস্বরে বিকাশ ব'ললে—আঃ মলিন্! বিরক্ত করিস্ নে! বাড়ীর ভিতরে যা!

ইতিমধ্যে বারান্দায় মচ্‌মচ্‌ই চটীজুতার আওয়াজ শোনা গেল এবং মলিনা পাশের দরজা দিয়ে ত্রস্তপদে অন্তর্হিতা হ'ল; বিকাশের নিদ্রারাধনাও মুহূর্তমধ্যে যেন মন্ত্রবলে অপহৃত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে বসে হিষ্ট্রীর পাতা উল্‌টাতে মনোনিবেশ করলে।

গায়ের রং রৌদ্রদগ্ধ তামাটে, লম্বা চওড়া আঁটু সাঁটু চেহারা, ছাটা ঘনগোঁফ, গম্ভীরমুখকান্তি বিকাশের বাবা বিরাজমোহন ধীর-মন্থরপদে বিকাশের পড়ার ঘরের পাশের বারান্দা দিয়ে বাইরের দিকে চলে গেলেন।

পাঠনিরত বিকাশ অবনত মস্তকে অখণ্ড-মনোযোগিতা সহকারে পুস্তকে অভিনিবিষ্ট থাকলেও, তার সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়ে এক জোড়া সতর্ক আঁখির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে তাদের অলক্ষ্যস্পর্শ বুলিয়ে গেল তা সে স্পষ্টই অনুভব করতে পারলে।

বিকাশের নিদ্রার আবেশ টুটে' গেছ্‌ল। বিরাজমোহন তাঁর অফিস ঘরের দিকে চলে' গেলে—সে চেয়ার হ'তে উঠে জানালার ধারে তক্তপোষের উপরে শুয়ে পড়্‌ল। এই উত্তপ্ত দুপুরে ঘণ্টাক্ত-তনু নিয়ে পড়ায় মনোনিয়োগ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

রৌদ্রের তেজ ক্রমশ কমে এল, গাছে গাছে পাতায়-পাতায় ঠাণ্ডা-হাওয়ার আনাগোনা সুরু হল। বিকাশের বন্ধু অমল এসে ডাক্‌লে—বিকাশ! সিনেমায় যাবি? আজ 'চার্লি-চ্যাপ্‌লিন্' আছে!

বিকাশ ক্ষুণ্ণ মুখে বল্‌লে—আজ বাবা বাড়ী আছেন ভাই!

—থাকলেই বা! এই গরমে সারা দুপুরই তো গাধার মতো প'ড়ছিস্! বিকেল বেলাও ঘরে বন্দী হ'য়ে থাকবি নাকি?

রঙ্গ নিপুণ নট চার্লি চ্যাপ্‌লিনের ছায়াচিত্রের অভিনয় দেখার আগ্রহ বিকাশের খুবই ছিল, কিন্তু কঠোর-শাসক পিতার ভয়ে আপত্তি করতে বাধ্য হয়েছিল।

অমল ছাড়্‌ল না। পীড়াপীড়ি করতে লাগল!

বিকাশের দ্বিধাপূর্ণ চিত্তে লোভ ও ভয়ের দ্বন্দ্বে অবশেষে লোভেরই জয় হ'ল। অমলের সঙ্গে সে বায়স্কোপ্ দেখতে বেরিয়ে গেল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। হুগলী-নদীর ষ্টীমারের সার্চ্চ লাইট্‌গুলি লম্বা লম্বা শাদা আলো ফেলে তারা-খচিত অন্ধকার আকাশ বিচিত্র সৌন্দর্য্যময় ক'রে তুলছে। আলোগুলি মাঝে মাঝে তীব্র-গতিতে এদিক ওদিকে সরে গিয়ে আঁধার মগ্ন নীলাকাশের বুকে যেন 'অরোরা' খেলাচ্ছিল।

বিকাশের মা সরোজিনী বারান্দায় ব'সে প্রদীপের সলিতা প্রস্তুত করতে করতে মুগ্ধ-নয়নে আকাশের পানে তাকিয়ে সার্চ্চ্-লাইটের বিচিত্র কিরণ-সম্পাত দেখ্‌ছিলেন।

স্বামী বিরাজমোহন এসে অতিরিক্ত গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—বিকাশ কোথায়?

সরোজিনী স্বামীর প্রশ্নের ধরণে চকিত হ'য়ে হাতের কাজ বন্ধ রেখে উদ্বিগ্ন মুখে তাঁর মুখের পানে তাকালেন।

বিরাজমোহন আরও কঠিনতর স্বরে প্রশ্ন করলেন—তোমার বড় ছেলে কোথায়?

সরোজিনী শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলেন—কেন? সে পড়ার ঘরে নেই কি?

—না। পড়ার ঘরে অনেকক্ষণ থেকেই নেই। খবর নিলুম, সন্ধ্যার আগেই নাকি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে!

স্বামীর কঠিন অপ্রসন্ন দৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে না পেরে সরোজিনী আঁখি নত করলেন। তাঁর উদ্বেগব্যাকুল মুখখানির সমস্ত রক্ত চুপ্‌সে গিয়ে যেন ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

বিরাজমোহন তীব্র গম্ভীর কণ্ঠে ব'ললেন—চুপ ক'রে রইলে যে! জানো কি না-জানো বলো না?

সরোজিনী কাতর নেত্রে একবার স্বামীর পানে তাকিয়ে

আবার দৃষ্টি অবনত ক'রলেন। ঠোঁট দু'খানি বারকতক নিঃশব্দে নড়ে উঠ্‌ল, কিন্তু কি যে তিনি বল্লেন বা বলতে চাইলেন তার এক বর্ণও বোঝা গেল না।

বিরাজমোহন স্ত্রীর প্রতি আর দৃক্‌পাত না ক'রে দৃঢ়-পাদবিক্ষেপে বাইরের দিকে চলে গেলেন। সরোজিনী আতঙ্ক-ব্যাকুল মুখে সেই দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে স্বামীর হাত দু'খানি ধরে ফিরিয়ে এনে কিছু কথা বলেন,—কিন্তু পুত্র-পক্ষ সমর্থন ক'রে কি যে বলবেন তা' ভেবে পেলেন না। এবং উঠে গিয়ে ক্রুদ্ধ স্বামীর হাত ধরবারও ভরসায় কুলাল না।

উঠানে আতা ও পেঁপে গাছগুলা অন্ধকারের ভিতর বাতাসে দুল্‌ছে। রান্নাঘরের টেমির ক্ষীণ আলোয় তাদের ছায়া দেখা যাচ্ছিল। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একঘেয়ে সুরে নিস্তব্ধ উঠান প্রতিধ্বনিত। রান্নাঘর থেকে বামুন ঠাকুরের খুন্তির ঠিন্ ঠিন্ আওয়াজের সঙ্গে ব্যঞ্জন সাঁত্‌লানোর তীব্র মধুর গন্ধে অন্তঃপুরের আকাশ বাতাস ভ'রে উঠেছে।

সরোজিনী কোলের আঁচলে পাকানো-সলিতাগুলি নিয়ে নিস্তব্ধ ভাবে ব'সে আসন্ন-অশান্তির প্রতীক্ষা করছিলেন। ভয় হচ্ছিল, ক্রোধে জ্ঞানহারা স্বামী হয় তো বিকাশকে আজ বাড়ী হ'তে বার ক'রেই দেবেন!

কন্যা মলিনা এসে মায়ের পাশে বসে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে মা?

সরোজিনী অন্ধকারের মধ্যে শূন্য দৃষ্টিতে কন্যার পানে তাকিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে ব'ললেন—বিকু কোথায় গেছে জানিস্ কি মলিনা?

মলিনা বললে—বিকেলবেলা অমলদা এসে বায়স্কোপ্ দেখতে ধ'রে নিয়ে গেছে।

সরোজিনী কোনও কথা কইলেন না। অন্ধকারে যেমন নিঃশব্দে বসে ছিলেন, তেমনই রইলেন।

কড়া প্রকৃতি স্বামীর হাতে পড়ে নিরীহা সরোজিনী অপরিসীম ধৈর্য্যশীলা হ'য়ে উঠেছিলেন। পুত্রের শাসন-সম্বন্ধে বিরাজমোহন এত বেশী কঠোর ছিলেন যে আজও পর্য্যন্ত ষোড়শবর্ষীয় বিকাশ স্বাধীন ভাবে খেলাধূলা করা কিম্বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলা মেশা করবার অধিকার পায় নি।

বিকাশ বাড়ী ফিরলে বহির্বাটীতে বিরাজমোহন পুত্রকে অল্প দু'চার কথাতেই ভর্ৎসনা করলেন—কিন্তু, সে কথাগুলি শুধু অকথ্যই নয়—তাঁর ষোড়শ বর্ষীয় পুত্রের পক্ষে তা চরম রূঢ় ও নিদারুণ অপমানজনক বটে!

বিকাশ অশ্রুস্তিমিত নেত্রে অবনত মস্তকে অন্তঃপুরের মধ্যে এল। শয়ন কক্ষে যাবার সময়ে দালানে উপবিষ্টা সরোজিনীর প্রতি দৃকপাত না ক'রে দ্রুতপদে নিজের ঘরে প্রবেশ কর্‌লে।

অল্পক্ষণ বাদে সরোজিনী বিকাশের শয়ন কক্ষে গিয়ে তার বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। মায়ের হাতের চুড়ি ও আঁচলের কাঠির ঝনৎকারে বিকাশ চকিতে একবার বালিশ হ'তে মুখ উঁচু ক'রে চেয়ে দেখে তৎক্ষণাৎ সবেগে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

সরোজিনী আস্তে আস্তে বললেন—বিকু, খাবি, উঠে আয়।

—আমি খেতে পারব না!

—লক্ষ্মী বাবা আমার, আয়! রাত-উপোসা থাকতে নেই!

—আমি খেয়েছি!

—কোথায় খেলি আবার?

—অমলের মা খাইয়েছে!

—যথার্থ ব'লছিস্? মিছে কথা নয়?

বিকাশ তীব্র বিরক্তিপূর্ণ স্বরে ঝাঁঝের সহিত ব'লে উঠ্‌ল—অত দিব্যি করতে পারবো না! বল্‌ছি খেয়ে এসেছি—বিশ্বাস হ'চ্ছে না!

সরোজিনী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—কেন বায়স্কোপে গেলি বিকু? জানিসই তো উনি কেমন ধারা মানুষ—

বিকাশ একটু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—আচ্ছা, আচ্ছা—আর ব'লতে হবে না, ঢের হয়েছে—সরোজিনী করুণ হেসে অভিমানী পুত্রের মাথায় সস্নেহে হাত রেখে ব্যথিতকণ্ঠে

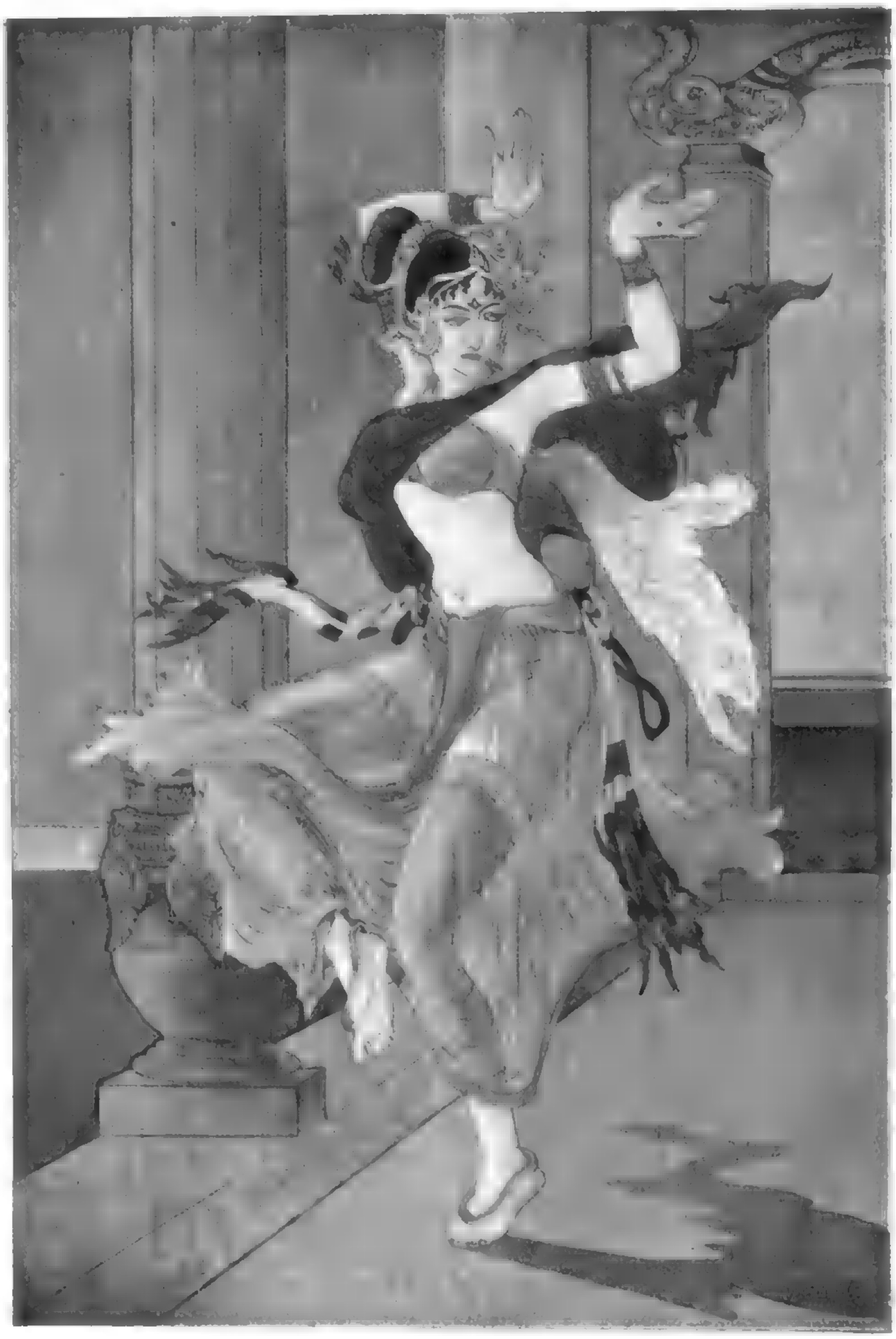

"—সুর সভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশি—"

বললেন—বিকু. বড় হচ্ছিস্ দিন-দিন,—এ’ অবুঝ হলে—

বিকাশ জলে’ উঠ্‌ল। মায়ের হাতখানি কপালের উপর থেকে সজোরে ঠেলে দিয়ে তীব্রকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—বেশ, অবুঝ তো অবুঝ, আর অত বুঝিয়ে কাজ নেই! … মা’ হ’য়ে একবারটি কখনও ছেলের দোষ ঢেকে নিতে পারলে না? … বলতে পারলে না যে, ‘তাকে আমি এক-জায়গায় পাঠিয়েছি!’ … বিকাশে’র কণ্ঠ রুদ্ধ হ’য়ে এল!

সরোজিনী ম্লান-হেসে বললেন—পাগল! আমি যদি তা’ বলতাম, উনি আগেই জিজ্ঞাসা করতেন—‘কোথায় পাঠিয়েছ?’ তারপরে সেই মিছে-কথা ধরা পড়লে আজ কি কারুর রক্ষে থাকত! আমাকে শুদ্ধ তা’ হলে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই কথাই স্পষ্ট বলো! নিজে পাছে একটু বকুনি খাও, সেই ভাবনাতেই অস্থির! … ছেলে মরুক্ না …

সরোজিনী এবার অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে বলে’ উঠ্‌লেন—বাবা, তুইও যদি অমন অবুঝ আর রুক্ষ মেজাজ্ হ’স্ তা’ হলে যে—

বারান্দা হ’তে তীব্র শ্লেষপূর্ণ রূঢ়কণ্ঠে বিরাজমোহন বলে’ উঠ্‌লেন—হ্যাঁ, ছেলের কাছে গিয়ে খোসামোদ করলেই—তার মেজাজ্ আরও ভাল হবে! … মা হ’য়ে পেটের ছেলেকে খোসামোদ করতে লজ্জাও করছে না? … এমন ধারা অশিক্ষিতা মর্য্যাদা-জ্ঞানশূন্য মায়ের,—ঐ রকম অসংযত স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল ছেলে হবে না তো কি?

—২—

পৌষমাস। উঠান-কোণে তুলসীমঞ্চের চারিপাশে গাঁদাফুলের বনে হলুদ রং হেসে উঠেছে। ঘন-হলুদ, ফিকে হলুদ, বাসন্তী রংয়ের রকম-বিরকম গাঁদাফুলে অগণিত ছোট ছোট গাছগুলি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে!

উত্তাপবিহীন বৈকালী রৌদ্ররেখা উঠানের আধখানা ছেড়ে ক্রমশ রান্নাঘরের দেয়াল বেয়ে শনৈঃ শনৈঃ উপরের দিকে উঠে চলেছে!

সরোজিনী দালানে বসে পিঠা ভাজছিলেন। বিকাশ এসে মায়ের সামনে দাঁড়াল।

ষোল বছরের বিকাশ এখন তেইশ বছরের যুবা! শিবপুর কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ‘বড়দিনে’র ছুটীতে শিবপুর থেকে হুগলীর বাড়ীতে এসেছে!

অগ্নিতাপে আরক্ত মুখখানি তৃপ্তির হাসিতে বিভাসিত করে মা বিকাশের পানে তাকিয়ে বললে—বোস্ না, গরম গরম আলুর পিঠে পানকত্ত্ব দিই!—তুই ভালবাসিস বলে আজ অনেক রকম পিঠে করছি!

বিকাশ বললে—রেখে দিও, রাত্রে খাব। এখন একটু বাইরে যাচ্ছি! .. হ্যাঁ মা! বাবাকে আমার টাকার কথা বলেছিলে কি? …

সরোজিনী কুণ্ঠিতভাবে বললেন—হ্যাঁ বাবা, বলে ছিলুম …

—কি বল্‌লেন তিনি?

সরোজিনী পিঠার কড়াটি উনানের উপর থেকে মাটীতে নামিয়ে মাথা নত করে পিঠাগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে আমতা আমতা করে বললেন—উনি বল্‌লেন? … উনি বল্‌লেন যে …

বিকাশ উত্তেজিতস্বরে বলে উঠ্‌ল—থাক্, আর বলতে হবে না! বুঝেছি!

সরোজিনী মাথা উঁচু করে করুণনেত্রে পুত্রের পানে তাকালেন। বিকাশ অভিমান ও ক্রোধে মুখ কালো করে বললে—কিন্তু একটা কথা আমি তোমাকেই জিজ্ঞেসা করি মা! মলিনাকে তত্ত্ব পাঠাবার বেলায় তো তোমাদের টাকার অভাব হয় না! আমি দু’বেলা জলখাবার খেতে পাই নে—জামা ছিঁড়লে জামা করাতে পারি নে—কিন্তু মলিনার তো এসেন্স, তেল, পমেটম্, ক্রিম্, সাবান, আল্‌তা দিয়ে মাসে মাসে শীতের তত্ত্ব, দোলের তত্ত্ব, পূজোর তত্ত্ব করতে তোমার কম উৎসাহ দেখি নে—টাকারও অভাব হয় না!

সরোজিনী আহতকণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন—বাবা, তুই কি জানিস্ না—তোর মায়ের হাতে নিজের বলে আলাদা একটি পয়সাও নেই! আমার হাতে টাকা থাকলে—আজ কি তোর চাইবার দরকার হত রে?

বিকাশ সে কথায় কর্ণপাত্ না করে সমান উত্তেজনায়

আপনার মনে বলে যেতে লাগল—আমি তো আর বাবুগিরি বিলাসিতার জন্যে টাকা চাইছি নে! যে টাকা বাবা আমাকে পাঠান্, তাতে শুধু কলেজের মাহিনে আর হোষ্টেলের খরচটি চলে! দু'বেলা জল খাবারের পয়সা পর্য্যন্ত পূরো কুলোয় না! তারপর নিজের কাপড়জামা, বই-টই, অসুখ বিসুখে খরচ আছে তো?

সরোজিনী বললেন—একটি কাজ যদি করতে পারিস্ বাবা, তা হলে হয়! আমার চেন্হার ছড়া বারোমাস তোলা পড়ে আছে. ঐ হারছড়া বিক্রী করে শ' দুয়েক্ টাকা পাওয়া যেতে পারে। ঐ টাকা থেকে মাসে মাসে পনোরো টাকা হিসাবে যদি কেটে নিস্, তা' হলে তোর বছরখানেক চলতে পারে।

বিকাশ দ্রুতপদে চলে যেতে যেতে বলে গেল—আমার এমন লেখাপড়া শেখার চেয়ে না শেখা ভাল। ... তোমার গায়ের গয়না বিক্রী করে আমার টাকা চাই,—এই কি আমি বলেছি? ... আমাকে কি তোমরা সকলে মিলেই এত ইতর ভাবতে সুরু করেছো?—

মলিনা মা'র কাছে বসে পিঠে গড়্‌ছিল। মায়ের বেদনা অঙ্কিত মুখের পানে তাকিয়ে সে উত্তেজিতস্বরে ব'ললে—মা, তুমি অত ভয়ে ভয়ে থাকো বলেই ত' দাদা তোমার উপরে এত জুলুম করতে পারে! বাবাকে ভয় করো বলে' দাদাকে শুদ্ধ্ ভয় করে চল্‌বে নাকি? ... বাইরে বাবার কাছে তো কারুরই দন্তস্ফুট করবার জো নেই,—সকলেই ভিতরে এসে মা'র উপরে সেই রাগটা ঝেড়ে যাবেন!

সরোজিনী করুণ হেসে বললেন—ওরে, আমিও যদি ওর আবদার অভিমান একটু সহ্য না করি—তা'হলে জগতে ও কোথায় দাঁড়াবে বল্? ... একটা দিক্ অতিরিক্ত কঠিন হয়েছে বলেই না আর একদিককে অধিকতর নরম হতে হয়েছে!

মলিনা মুখভার করে' বললে—দাদা কী-বলে' বলে' গেল বলো তো—'মেয়েকে দেবার বেলায় তোমাদের টাকার অভাব হয় না!'

সরোজিনী স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়ের পানে তাকিয়ে বল্‌লেন—ও কথাটা বিকু খালি অভিমানের বশে আমাকে আঘাত দেবার জন্যই বলে' গেল।

মলিনা তবুও মুখভার করে বললে—যাই বলো মা,—দাদা কিন্তু যত বড় হচ্ছে—ততই বাবার মত রুক্ষ-মেজাজ হচ্ছে!

সরোজিনী ঝাঁঝরায় পিঠা তুলে রসের পাত্রে ফেলতে ফেলতে ম্লান হেসে বললেন—ও যাঁর ছেলে, তাঁর প্রকৃতি ও এড়িয়ে যাবে, এ কি কখনও হতে পারে? ... এও জানিস্ মা, বিকু মায়ের চেয়ে জগতে কাউকে ভালবাসে না! ... ও যা কঠিন কথা বলে—সে কি আমাকে বলে রে? ... বলে অন্য জনকে! ও আমার পেটের ছেলে—আমি যে ওর নাড়ীর খবর জানি!

মলিনা অভিমানপূর্ণ স্বরে বল্‌লে—আমাকে বাপু তোমরা আর ভয়-টয় কোরো না বলছি!—

সরোজিনী এবার খুব হেসে ফেল্‌লেন! বললেন—হ্যাঁ রে মলিন্! তোর দাদা তোকে হিংসে করে মনে কর্‌লি বুঝি?

মলিনা এবার সত্য সত্যই অপ্রস্তুত হয়ে পড়্‌ল। কুণ্ঠিত অপ্রতিভকণ্ঠে বল্‌লে—না, দাদার খরচের অত টানাটানি—মিছিমিছি আমাকে অত ঘটা করে তত্ত্ব না করে. সে টাকাটা দাদাকে পাঠালে ঢের বেশী উপকার হবে মা!

বিকাশ রাত্রে মায়ের কাছে পিঠা খেতে বসে মলিনাকে ডাক্‌লে—মলিন্. আয় আমার সঙ্গে পিঠে খাবি!

তারপর মলিনার স্বামী নিয়ে তার সঙ্গে রঙ্গ রহস্য করে—খুনসুটি করে মায়ের কাছ থেকে বার বার পিঠা চেয়ে নিয়ে খেয়ে—দুই ভাই-বোনে একত্রে আহার সমাপ্ত করলে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে বিকাশ অকারণ অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করতে লাগল। মা হার বিক্রয় করতে চাওয়ার পর হতে বিকাশ বুকের মধ্যে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করছিল।

সরোজিনী প্রতিদিনকার মত ঘরে এসে বিকাশের মাথার শিয়রে টুলের উপরে জলের গ্লাসটি সরপোষ্-চাপা দিয়ে রেখে তার মশারী ফেলে দিতে গেলেন। বিকাশ

লেপের ভিতর হতে মুখ বের করে বললে—কে? … মা?

সরোজিনী বললেন—তুই জেগে আছিস্, না কি রে? বিকাশ বললে—হুঁ। বিকাশের স্বরটা একটু ভারি শোনাল। সরোজিনী উদ্বিগ্নস্বরে বললেন—সর্দ্দি হয়েছে নাকি? গলার স্বরটা যেন ভার-ভার ঠেক্‌ছে! কপালটা দেখি? …

মা লেপ সরিয়ে বিকাশের কপালে হাত দিলেন। বিকাশের ইচ্ছা হল মা'র ঠাণ্ডা-কন্‌কনে হাতখানা কপালের উপর দু'হাত দিয়ে জোরে চেপে ধরে! মাকে একটুখানি তার বিছানায় বসতে অনুরোধ করে! কিন্তু লজ্জায় তা' পারলে না।

কপাল হ'তে হাতখানি সরিয়ে নিয়ে মা আশ্বস্ত কণ্ঠে বললেন—ওঁকে টাকার সম্বন্ধে আবার কেন বলতে গেলি বিকু? … কিছু না বললেই পারতিস্! আমি তো বল্‌লুম— আমার হারছড়া বিক্রী করে—

বিকাশ হঠাৎ ধড়্‌মড়্ করে বিছানায় উঠে বসে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠ্‌ল—বেশ করেছি, বলেছি! যিনি আমার খরচ দিতে বাধ্য, তাঁকে আমি নিশ্চয়ই বলবো! দিন্ আর না-ই দিন্! … বার বার তোমার গয়না বিক্রীর কথা আমাকে শুনিয়ো না বল্‌ছি—

সরোজিনী ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন—বিকু, তোর মেজাজ ক্রমেই ওঁর মত হয়ে উঠ্‌ছে! … কোনও কথা কানে না তুলেই রেগে উঠবি! … আজ মুখের উপরে কী জবাব করেছিস্—উনি ভিতরে এসে রাগ করে না খেয়ে শুয়ে পড়েছেন! … ওঁর বয়স হয়েছে—উনি যদিও একটা অন্যায় কিম্বা ভুল করেন—

বিকাশ অসহিষ্ণু ভাবে বাধা দিয়ে বললে—সে ত চিরদিনই তোমার মুখে শুনে আস্‌ছি মা! বাবা যত বড় অন্যায়ই করুন না কেন,—তুমি চিরদিন খালি আমারই দোষ দেখতে পাও—

সরোজিনী পুত্রের একান্ত অমূলক অভিযোগের কোনও প্রতিবাদ না ক'রে মশারী ঠিক ক'রে আলো নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিকাশ অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাতে পারলে না, বিছানায় লেপের তলে বিনিদ্র নয়নে ছট্‌ফট্ ক'রে কাটালে।

—৩—

কয়েক বৎসর পরের কথা। বিকাশের বিবাহ হয়েছে। মোটা মাহিনার চাকরীও হয়েছে। বিকাশের বাবা বিরাজ বাবু মারা গেছেন, বিধবা সরোজিনী মৃত-কন্যা মলিনার ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ক'টিকে নিয়ে বিকাশের কাছে আছেন।

বধূ ললিতা বয়স্থা, সুন্দরী ও ধনীকন্যা। বিকাশ নিজে পছন্দ ক'রে বিয়ে করেছে; কিন্তু তাদের দাম্পত্য-প্রণয় নিবিড় হয়ে ওঠে নি। ললিতা অতিরিক্ত অভিমানিনী ও অসহিষ্ণু-প্রকৃতি। অল্প বয়সে মাতৃহীনা, ধনী পিতার অত্যধিক আদরে বর্দ্ধিতা এই অধৈর্য্য প্রকৃতি অভিমানিনী মেয়েটিকে সরোজিনী সহজেই তাঁর কোমল স্নেহপ্রবণ-প্রকৃতি ও ক্ষমাশীল শান্ত স্বভাবের দ্বারা নিজের বশীভূত ক'রে নিতে পেরেছিলেন। মাতৃহীন শিশু ভাগ্নে-ভাগ্নীগুলির সঙ্গেও ললিতার বেশ সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হ'য়ে গেছল—গরমিল হয়েছিল আসল জায়গায়—স্বামীর সঙ্গে।

বিকাশ চিরকাল তার মাকে স্বামীর আজ্ঞা পালনে তৎপরা ও একান্ত বাধ্য দেখে এসেছে। সে জন্য তার নিজের মত্ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ললিতা যে অন্যমত্ বা অন্য ইচ্ছা প্রকাশ ক'রতে পারে এ ধারণাই তার ছিল না। তাই ললিতা যখন তার আহ্বান অবহেলা করে তার কাছে না গিয়ে সবার ছোট কচি ভাগ্নেটিকে নিয়ে খেলায় মেতে থাকত, কিম্বা তাদের সব-কটিকে একত্র করে নিয়ে পাঠশালা খুলে সাড়ম্বরে গুরুগিরি করতে বস্ত—তখন বিকাশ ক্রোধে বিস্ময়ে ক্ষোভে অভিমানে আত্মহারা হয়ে পড়ত।

বিকাশের সেই ক্রোধ কিম্বা ক্ষোভের এতটুকু আঁচ যদি কোনও ক্রমে ললিতাকে স্পর্শ করত, তাহলেই অভিমানিনী ললিতার ফিট্ হয়ে পড়্‌ত কিম্বা সত্বর পিত্রালয় যাত্রার দিন এসে পড়ত!

বেলা আন্দাজ বারোটা। জানালার পাশে গোঁড়া লেবুর ঝাঁকড়া গাছটা থেকে একটা সুমিষ্ট অথচ তীব্র

সৌরভ এসে ঘরের বাতাস গন্ধমদির হয়ে উঠ্‌ছে। একটা প্রকাণ্ড কালো ভীমরুল একটানা সুরে ভোঁ—ও—শব্দে ঘরের ভিতরে ছাদের কড়িকাঠের কোল ঘেঁষে অলসমন্থর পক্ষে ক্রমাগত একটানা আনাগোনা করছে!

বিকাশ আহারান্তে শয়নকক্ষে দাঁড়িয়ে পোষাক পরছিল। পেন্ট্‌লেনে গ্যালিস্ আঁটতে আঁটতে চারিদিকে চেয়ে ব্যস্ত উচ্চ সুরে হাঁকলে—মা, আমার কলারের বোতাম টোতামগুলো গেল কোথায়?

সরোজিনী ভাঁড়ার ঘরে বসে ডাল বাছ্‌ছিলেন। ছেলের উচ্চ চীৎকারে উদ্বিগ্ন মুখে উঠে গিয়ে ললিতাকে এ-ঘর সে-ঘর খুঁজে দেখলেন—পশ্চিম দিকের বারান্দার কোণে সে নিশ্চিন্তচিত্তে পা ছড়িয়ে ব'সে একটি ফাউন্টেন্ পেন্ হাতে নিয়ে পোষ্টকার্ডে পত্র রচনা করছে!

সরোজিনী ব্যস্ত ও বিস্মিত স্বরে বললেন—বৌমা, তুমি বিকুর ঘরে যাও নি? ... এখন এখানে বসে' কি করছ?—যাও মা, ওঠো,—সে বোতাম না কি খুঁজছে! ... ... আমি ভেবেছি তুমি তাকে পোষাক টোষাক ঠিক করে দিচ্ছ!

ললিতা শাশুড়ীর দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে—কলারের, সার্টের সব বোতামই তো পরিয়ে ঠিক ক'রে রেখে এসেছি মা! ...

সরোজিনী উৎকণ্ঠিত মুখে বললেন—তা'হলেও এখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় মা! আফিস্ বেরুচ্ছে—কি দরকার দরকার হবে, এখন কি অন্য জায়গায় থাকতে আছে?

বিকাশ আবার চেঁচিয়ে ডাক্‌লে—মা, অ' মা—আঃ কারুর সাড়া শব্দ নেই,—আমার রুমালটা যে বদ্‌লে দিতে হবে!—

সরোজিনী এবার ললিতার হাত ধরে টেনে তুলে বললেন—শীগ্‌গির যাও লক্ষী মা আমার! সে তোমাকে খুঁজছে! ... রুমাল না কি চাইছে—দিয়ে এসো—

ললিতা নীলাম্বরীর অবগুণ্ঠন খানি কবরীর উপর হতে টেনে ললাট পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে স্বামীর ঘরে গিয়ে দাঁড়াল।

বিকাশ তখন আলমারী খুলে সমস্ত কাপড় চোপড় পোষাক পত্র হাটকে ছড়িয়ে, আলমারীর অভ্যন্তরে একটি ছোট খাট সমুদ্র-মন্থন শুরু করে দিয়েছে।

ললিতাকে দেখে রাগ করে বল্‌লে—আফিস যাবার সময়ে এক দিনও তোমাকে পাবার যো নেই! ... আমি বাঘ না ভালুক,—না, তোমার সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করি যে তুমি আমার সামনে আসতে চাও না! ...

ললিতা উত্তর করলে—তুমি আমাকে দেখলেই অম্‌নি উপদেশ দাও, আমি অত উপদেশ সইতে পারি নে!

বিকাশ আরক্ত মুখে বললে—তুমি আমার উপদেশ শুনতে অবশ্য বাধ্য!

স্বামী-স্ত্রীর উত্তর-প্রত্যুত্তর ক্রমশই বেড়ে চললো এবং অভিমানে দুঃখে ক্ষোভে ললিতার ফিট্ হয়ে পড়্‌ল।

এমন ধারা প্রায়ই হত। ইদানীং ললিতা যথাসম্ভব স্বামীকে এড়িয়ে চল্‌তো! জেদ্ উভয় পক্ষেই প্রবল হওয়ায় সন্ধি হল না!

—৪—

ললিতার সন্তান-সম্ভাবনা জানা গেল। সরোজিনী ললিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সে পিত্রালয়ে যেতে ইচ্ছুক কি না!

ললিতা লজ্জারক্ত মুখে নত-দৃষ্টি হ'য়ে বললে—না মা, থাক্। আপনার কাছেই বেশ আছি!

শাশুড়ী বধূর মুখের পানে সস্নেহে অথচ একটু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনের ভাবটা যেন পড়ে নিতে চাইলেন!

বধূ আরও আরক্তিম হয়ে উঠ্‌ল। শাশুড়ীর মুখখানি সে দিন পরম তৃপ্তি ও নিশ্চিন্ত আনন্দের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো। বধূকে বুকে টেনে নিয়ে ললাট চুম্বন ক'রে বললেন—এতদিনে পাগ্‌লীর জ্ঞান হল? ...

বিকাশ যখন শুন্‌ল—ললিতার পিতা কন্যাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন এবং সরোজিনীও পাঠাতে সম্মতা ছিলেন কিন্তু ললিতা যেতে চায় নি,—সে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়ল। কারণ, পিত্রালয়ে যাবার প্রস্তাবে ললিতার যত হর্ষ ও উৎসাহ দেখা যায়, এত অন্য কিছুতেই দেখা যায় না। তাই ললিতাকে বিস্ময় ও সন্দেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি নাকি বাপের বাড়ী যাবে না বলেছ?

ললিতা গভীর অর্থপূর্ণ অথচ কোমল দৃষ্টিতে স্বামীকে অভিষিক্ত ক'রে নখ খুঁটতে খুঁটতে লজ্জাজড়িত মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে—না—

বিকাশ ললিতার এই অবনত ভাব ও নূতন ধরণের চাহনিতে শুধু বিস্মিতই হল না, বিহ্বলও হয়ে পড়ল। হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেল্‌লে—কেন ?

অন্য দিন হলে ললিতা এ রকম প্রশ্নের খুব একটা কঠিনতর উত্তর দিয়ে ফেল্‌ত কিম্বা মোটেই উত্তর দিত না কিন্তু আজ সে তা করলে না। অবনত-আঁখির লজ্জা-কম্পিত দৃষ্টিটুকু চকিতে একবার স্বামীর মুখের উপর বুলিয়ে নিয়ে সরম-রঞ্জিত মুখে বললে—এ' ক' মাস তোমার কাছ ছাড়া হতে ইচ্ছে হচ্ছে না ! ... কি জানি—যদি ... যদি আর না বাঁচি—

বিকাশ বিপুল বিস্ময় ও আনন্দ উদ্বেলিত হৃদয়ে পত্নীকে নিবিড় প্রেমে বুকের কাছে টেনে নিলে। তাদের সজল-আঁখির মৌন-চাহনি সুখ ও বেদনা বিমিশ্র গভীর নীরব-ভাষায় মুখর হয়ে উঠ্‌ল।

ভীত-হৃদয়া ললিতা স্বামীর বুকের উপরে ভীরু পাখীটির মত নিজের মাথাটুকু একান্ত ভাবে ন্যস্ত করে' আস্তে আস্তে চোখ মুদ্‌লে। ...

ললিতার সুন্দর একটি খোকা হল, স্বাস্থ্যসবল, হৃষ্টপুষ্ট, চাঁপার মত বর্ণ ! তার মাস কতক বাদেই সরোজিনী সামান্য ক'য়েকদিনের ব্যারামে ইহলোক ত্যাগ ক'রলেন !

সরোজিনীর মৃত্যুর পর ললিতা এবং বিকাশ উভয়েই অত্যন্ত শোকার্ত্ত হয়ে পড়্‌ল। ... বিকাশ আঘাত সামলাল বটে কিন্তু ব্যথা ভুলতে পারল না।

মায়ের মৃত্যুর পর মাস কতক কেটেছে। ললিতা সকালবেলা বারান্দায় বসে' কুট্‌নো কুট্‌ছে—

বিকাশ ঘরের ভিতর হঠাৎ হাঁ হাঁ করে' চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। ললিতা বঁটী কাৎ করে' রেখে দ্রুতপদে ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখে—খোকা এক দোয়াত কালি বিকাশের একটি সাদা ধব্‌ধবে শার্টের উপরে উপুড় করেছে !—

বিকাশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল—সকালবেলা ছেলেটাকে এ ঘর থেকে নিয়ে যেতে পারো না ? আমি কি তোমার চাকর যে, সকালবেলায় নিজের কাজকর্ম্ম না করে'—তোমার ছেলে আগলে বসে' থাকবো !

কথাটা রাগের বশে বলে ফেলেই বিকাশ পরমুহূর্ত্তেই শঙ্কায় কাঠ হয়ে উঠ্‌লো ! বুঝলে—আজ আর রক্ষা নেই ! এখনই ললিতা কেঁদেকেটে ফিট্‌ বাধিয়ে বস্‌বে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তার কিছুই হল না—উপরন্তু ললিতা একটু অপ্রতিভ ভাবে খোকাকে নিয়ে সেই শার্ট্‌টি পরিষ্কার করতে চলে গেল।

বিকাশ আজ জীবনে প্রথম নিজের রাগের জন্য গভীর লজ্জানুভব করলে এবং নিজের ব্যবহারের জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হয়ে পড়ল।

তার কিছুদিন পরের কথা। খোকা বেশ দুষ্ট হয়ে উঠেছে। হামা দিয়ে গিয়ে সমস্ত জিনিষপত্র ভাঙে চোরে ফেলে ছড়ায় ! সেদিন নির্জ্জন স্তব্ধ দুপুরে মায়ের ঘুমের অবসরে দুরন্ত শিশু কখন্ বিকাশের সোনার চশ্‌মাখানি হস্তগত করে' তার একটি ডাল্‌ মুচড়িয়ে ভেঙে রেখেছে !

ললিতা ঘুম থেকে জেগে ছেলের অপকর্ম্ম দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। বিকাশ যে তার চশমার এই দুরবস্থা দেখে ললিতার উপরে খুবই ক্রুদ্ধ হবে তাতে আর তার সন্দেহ রইল না !

বিকালে বিকাশ বাড়ী ফিরলে ললিতা স্বামীর শ্রান্তি অপনোদন ও জলযোগের পরে কুণ্ঠিতভাবে যখন ছেলের দস্যিপনা-কীর্ত্তির কথা বিবৃত করে' ভাঙা চশ্‌মাটি ভয়ে ভয়ে দেখাল, বিকাশ বিস্মিত নয়নে পত্নীর মুখের পানে তাকিয়ে বল্‌লে—তাতে কি হয়েছে লতা ?—খোকা চশ্‌মা ভেঙেছে, তুমি নিজে তো আর ভাঙো নি ?—তোমার এতে কুণ্ঠিত হওয়ার কি আছে ?

ললিতার আজকের এই অপ্রতিভ মুখভাব ও কুণ্ঠিত চাহনি বিকাশের মর্ম্মে যেন সজোরে এক ঘা চাবুক কসিয়ে দিলে ! ... পত্নীর মুখে বিকাশ তার নিজের মৃতা-জননী সরোজিনীর সন্তান-মমতা-করুণ মুখের ছায়া ও সেই বেদনা-গম্ভীর চাহনি দেখে বিস্ময়ে ও ব্যথায় স্তব্ধ হয়ে গেল ! ...

তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল নিজের শৈশবজীবনের কথা! রুক্ষ কঠোর প্রকৃতি বদ্‌মেজাজি পিতার ভয়ে তার অপার ধৈর্য্যশীলা স্নেহময়ী জননী—পুত্র কন্যা দুটিকে কত সাবধানে আগলে রাখতে চেষ্টা করতেন।…

ললিতার মত অভিমানিনী একজেদী প্রকৃতি মেয়ের নয়নে নিজের স্বর্গগতা শান্তস্বভাবা জননীর ন্যায় মহিয়সী নারীর অসীম সহিষ্ণুতা ভরা শান্ত গভীর চাহনি যে কোনও দিন ফুটে উঠ্‌তে পারে বিকাশ কল্পনাও করতে পারে নি। তাই সে আজ হর্ষ ও বেদনায় বিমূঢ় হয়ে পত্নীর পানে তাকিয়ে রইল। তারপর ললিতা'র হাতখানি ধীরে ধীরে নিজের হাতের উপর তুলে নিয়ে গভীর কণ্ঠে ব'ললে—তোমার ছেলে চশমা ভেঙেছে বলে' তুমি এত কুণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন? … কিন্তু ও যে আমারও ছেলে! … ছেলে চশ্‌মা ভেঙেছে বলে' যদি অপরাধ হয়ে থাকে তা' হলে সেটা তোমার একলারই হয় নি—আমিও তার সমান ভাগী … কেমন? তাই নয় কি?

ললিতার নয়নে দুই বিন্দু মুক্তার মত অশ্রু ফুটে উঠ্‌ল।

… খোকা হঠাৎ হাত পা ছুঁড়ে গোলাপের পাপ্‌ড়ির মত কচি টুক্‌টুকে ঠোঁট দু'খানি ফাঁক ক'রে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় অস্ফুট-কলকাকলি ক'রে ডেকে উঠ্‌ল—মা—মা—বা—

সর্পিল পন্থা

শ্রীভূপতি চৌধুরী

প্রাণকান্ত নামটা সুবিধারও নয় এবং সাধারণ ত নয়ই, অসাধারণও নয়। হয়ত এই কারণেই প্রাণকান্তকে চিনত না এমন লোক এ পাড়ায় ছিল না। কিন্তু এই সঙ্গে যদি ভেবে নেওয়া যায় যে, সকলের সঙ্গেই তার ভাব ছিল তা হ'লে ভয়ানক ভুল করা হবে। ব্যাপারটা বরং ঠিক উল্‌টো। সকলেই তাকে এড়িয়ে চলত কিংবা সে-ই সকলকে দূরে রেখে যেত তা বলা একটু শক্ত। তবে আসল কথাটা হচ্ছে—তাদের মাঝে একটা দূরত্ব ছিল এবং সেই ব্যবধানকে লক্ষ্য করে সকলে বলাবলি করত—আচ্ছা ওর নাম প্রাণকান্ত হল কি করে?

অবশ্য এ নামকরণ কেমন করে হল তার ইতিহাস কারো জানা নেই; কিন্তু এ নাম হবার বিপক্ষে যত প্রতিকূল ঘটনা থাকতে পারে তা নাকি লোকেদের একেবারে মুখস্থ।

প্রাণকান্ত হবার দিন কয়েক বাদেই ওর বাপের চাকরী যায় এবং সেই দুঃখে সে ভদ্রলোক ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না এমনি কিম্বদন্তী এবং পাছে নিজের ছেলে বলে ওকে ভালোবেসে ফেলেন এই ভয়ে বছর তিনের মধ্যে তিনি এ জগতের কাছে একদম্ ইস্তফা দিয়ে চলে যান।

অবশ্য মা ছেলেটিকে মানুষ করলেন। এবং ফলে ছেলে যতটা আবদারে হবার তা হয়েছিল। কিন্তু সে আবদার ঐ মায়ের কাছে, বাইরের লোক ত আর মা নয়; তাদের কাছে আবদার চলত না।

ফলে বাইরে যতই সে আঘাত পেত ততই সে সঙ্কুচিত হয়ে তার ঘরের মা-টিকে আঁকড়ে ধরত। হয়ত তার

এই অত্যধিক আকর্ষণের ফলেই একদিন তার এই মাটিকেও সে হারিয়ে বসল। লতার আকর্ষণে অনেক তরুকে শুয়ে পড়তে হয়েছে এমন ঘটনা বিরল নয়।

এই একটি দিন পাড়ার লোকের পায়ের ধুলো তাদের বাড়ীতে পড়েছিল। তাদের হট্টগোল ও সান্ত্বনার বাণীর মধ্যে থেকে তার নিজেকে অত্যন্ত একলা মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাদের কারো ওপর রাগ করবার মতো ক্ষমতা তার ছিল না।

নিতান্ত নিঃসহায়ের মতো তার দিন কেটে যেত। সারা দুপুর আপিসের কাজের পর যখন সে বাড়ী ফিরে আসত তখন তার মনে হত যে, সারা বাড়ীর শূন্যতা চোখে মুখে বুকে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে! সেই সময় একটা আশ্রয়ের জন্য তার মন চীৎকার করে উঠত। কিন্তু বাহির থেকে চিরদিন সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এসেছে। সেই বাহিরই বা কেন আজ তাকে আশ্রয় দেবে।

অথচ একদিন একটু আশ্রয় পাবার আশাও তার হয়েছিল।

মা মারা যাবার দু'দিন পরে যখন সে নিতান্ত জড়ের মতো নিশ্চল ভাবে তার বিছানা আশ্রয় করে পড়ে ছিল সেই সময় তার প্রতিবেশী, তারই মতো সকলের অবজ্ঞাত একজন এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে, তাকে সাহায্য করে তার মনে শক্তি দিয়ে গিয়েছিল। সে বীরুর মা, কমলার শাশুড়ী। পরিচয় একটু অদ্ভুত হল বটে কিন্তু এইটেরই প্রয়োজন ছিল। যাইহোক, সেদিন তার মনে হয়েছিল কি জানি আশ্রয় হয়ত মিলতেও পারে। কিন্তু সে ঐ একদিন। তারপর আর কারো জননী এসে তাকে স্নেহ জানিয়ে যায় নি। তার মনের আশা মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল। তবুও সেই একটি দিনের স্নেহের পরশ স্মরণ করে সে নিজেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করত। আগে সেখানে সে শুধু আঘাতের আশঙ্কাই করত, এরপর থেকে তার মনে হতে লাগল যে, মাঝে মাঝে অভয়ের আশাও সে পায়।

পথে যেতে যেতে একদিন তার এক কলেজের সহপাঠী—প্রবোধের—সঙ্গে দেখা। একেবারে মুখোমুখি। কাজেই কিছু না জিজ্ঞাসা করে যাওয়াটা অত্যন্ত অভদ্রতা হবে ভেবে সে প্রশ্ন করলে—কিরে প্রাণকান্ত কেমন আছিস? বিয়ে-থা করেছিস নাকি?

প্রাণকান্ত কোন কথা না বলে শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে, না। প্রবোধ একটু উচ্চহাস্ত করে বললে—হ্যা, আমাদের আর কে বিয়ে করবে? আমাদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া আর মেয়ের গলায় দড়ি দিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া একই কথা। বরং শেষেরটাই ভাল। একদণ্ডেই সকল জ্বালা চুকেবুকে যাবে। তা বটে। কথাটা সত্য ও অপ্রিয় কিন্তু সেটাও কি শুধু এই দুটি লোকের পক্ষে খাটে, না এর ব্যবহার আরও ব্যাপক হতে পারে। এই একটি কথা নিয়ে সেদিনের সন্ধ্যাটা তার ভালই কেটে গেল।

বিবাহ কথাটা যেন একখানি রঙীন স্বপনের জাল। এরই ফাঁসে জড়িয়ে মন যেন নেশায় বুঁদ হ'য়ে যায় ...

মা মারা যাবার পর মায়ের ছবিটা নিয়ে তার সময় কাটত। ধূপধুনা ও আলো জ্বালিয়ে সে তাঁর ছবির সামনে চুপ করে বসে থাকত। কি মনে ক'রে, তা সে-ই জানে। আজও তেমনি করে ছবির সামনে বসে প্রতিদিনকার মতোই চুপ করেছিল। কিন্তু মনের দোলায় তার মনে হল যেন মায়ের মুখে একটা স্নেহের হাসি ফুটে উঠেছে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে। মনের পরতে পরতে অনুভব করলে—বিবাহের কথায় মায়ের অভয় আশীর্ব্বাদ। ...

সন্ধ্যার জমাট অন্ধকারের বুকে ক্ষীণ মোমবাতির শিখা, তারই নিরাশাদগ্ধ জীবনের ক্ষীণ আশার কম্প্রমান ছবি। তার মনের স্বপ্ন-বিলাস আর কি?

বসে বসেই অকারণে তার মনে হতে লাগল সে অত্যন্ত অসহায়! তার একটা আশ্রয় নেই। আজ যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে হয়ত মৃতদেহ তার বিছানায় মরে শুকিয়ে যাবে, কেউ এসে ছোঁবেও না, ঘরের কোণে মাকড়সা জাল বুনে যাবে। ক্রমশ ঘরটা ঝুলে ও ধূলায় ভরে যাবে।

তার চোখের সামনে থেকে মায়ের ছবি, বাতির আলো, ধুনুচির কয়লার রাঙাচোখ সব অস্পষ্ট হয়ে গেল।

ধ্যানী বুদ্ধের ধ্যান ভেঙেছিল মুক্তি পেয়ে, কিন্তু প্রাণ-

কান্তের মোহ কিছু না পেয়েই ভেঙে গেল। আর একান্তই যদি কিছু ইতিমধ্যে সে পেয়ে থাকে তা হচ্ছে মশার কামড়। ঠিকমতো আত্মস্থ হ'য়ে সে দেখলে যে, বাতি নিভে গেছে এবং ঘরের মধ্যে নিরেট অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

তখন বিশেষ কিছু বোঝবার চেষ্টা না করেই সে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। তন্দ্রাও যে না এসেছিল এমন নয় কিন্তু সেই তন্দ্রার আবরণের উপর নিদ্রার বদলে এসে পড়ল চিন্তার জাল। তারপর সে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নালোক ...

অসংলগ্ন প্রলাপী অবস্থার মধ্য দিয়ে, কাম্যলোকের কমনীয়তার স্রোত সন্তরণ ক'রে যখন সে জাগ্রত বাস্তবতার রাজত্বের কঠোরতার কবলে এসে পড়ল তখন রাত্রির অন্ধকারের সওদার গাঢ়ত্ব উষার আলোকের ভেজালে তরল হয়ে গিয়েছে; আর এর খরিদ্দার প্রভাতী পাখীর দল এই ভেজাল সওদায় বিরক্ত হ'য়ে বেজায় কলরব সুরু করে দিয়েছে।

প্রাণকান্তও শুধু বিছানা নয়, ঘর ছেড়ে বার হ'য়ে পড়ল। মনের মধ্যে যে বৈরাগী-পুরুষটি মাঝে মাঝে খেপে ওঠে হয়ত তারই ঠেলায় আজ এই অভিযান। আবার এ মিথ্যাও হতে পারে!

খানিকটা হন হন করে এগিয়ে গিয়ে প্রাণকান্ত থমকে দাঁড়াল! এত সকালে পথ দিয়ে লোকই দেখা যায় কম, আর যাদের দেখা যায় তারা চলে হয় কাজের তাড়ায়, নয় খেয়ালের তাগাদায়। এমন অবস্থায় লোকের বদলে যদি কোনো মেয়েকে দেখা যায় তাহলে কোন কিছু একটা সন্দেহ করা এমন কি দোষের?

কিন্তু ব্যাপার সন্দেহজনক কিছু নয়। মেয়েটি এই পাড়ারই, এবং বেলা হ'লে পথে লোক চলবে সুতরাং অতি প্রত্যূষে ঘরের জঞ্জাল প্রভৃতি পথের ডাষ্টবিনে ফেলে দেবার অজুহাতে তাকে এ কাজ করতে হয়েছিল। এ অবস্থাটাকে আর যাই বলা যাক, খুব সুবিধাজনক কিছুতেই বলা যায় না। মেয়েটি তার ছাইপাঁশ-মাখা হাত দিয়ে মাথার কাপড়টা টেনে দীর্ঘতর ক'রে তাড়াতাড়ি তাদের বাড়ীর দিকে প্রস্থান করলে। আর প্রাণকান্ত একবার ভালো ক'রে ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিজেকে চকিত ক'রে, আবার চলা সুরু করলে।

কিন্তু যে ব্যাপারটাকে এত সহজে হালকা ক'রে সে চলে গেল, সেটা ক্রমশঃ যেন ভারী হ'য়ে তার মনের উপর গেড়ে বসতে লাগল। বিরক্ত হ'য়ে সে পথ ছেড়ে ঘরে এল। সঙ্গে নিয়ে এল এক প্রশ্নের বোঝা—এ মেয়েটি কে?

এই মেয়েটি কমলা। একে চেনবার সুযোগ প্রাণকান্তের কখনও হয়নি যদিও এর শাশুড়ীকে একদিন দেখবার অবসর তার হয়েছিল। মেয়েটিকে সে এই প্রথম দেখল। এর শাশুড়ীকে সে দেখেছিল শ্রদ্ধার চোখে, একে সে কি চোখে দেখল সে-ই জানে।

কমলাকে দেখতে সুশ্রী বললে হয়ত অত্যন্ত বেশী বলা হতে পারে, তবে বিশ্রী বললে যে অপরাধ হবে তা নিশ্চয়। চকিতে লজ্জিত হ'য়ে ত্রস্তপদে পলায়নের মধ্যে নিখিল-তরুণীর যতটা আকর্ষণ থাকতে পারে, ঠিক ততটা শক্তি লীলায়িত ক'রেই যে সে চলে গিয়েছিল, এতে আর কোন সন্দেহ নেই। এতেই অনভ্যস্ত প্রাণকান্ত মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল।

প্রাণকান্ত তার মনের প্রশ্নের উত্তর পাবার চেষ্টায় নানা উপায় চিন্তা ক'রতে লাগল।

উপায় যতদিন না চিন্তার রূপ ছেড়ে কাজের বর্ম্ম পরে দাঁড়ায় ততদিন কোন সুবিধাই হয় না। মনে যেন সুখ থাকে না। ঘরের মধ্যে বদ্ধ বাতাসে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, আবার লোকারণ্যের মধ্যে নিরালার ব্যর্থ সন্ধানে মন বিষিয়ে যায়। প্রাণকান্তের হয়েছিল এই অবস্থা।

ঘরের কোণের ধূলা বিস্তৃত হ'য়ে কোণ ছেড়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। মা'র ছবির ফুলের মালা শুকিয়ে কালো হয়ে যাচ্ছে। ধূপ ধুনার সঙ্গে তা'র বিচ্ছেদ ঘটেছে। কিছুই ভাল না-লাগায় প্রাণকান্ত সকাল সকাল শুয়ে পড়ল, নিদ্রার নেশায় রাতটা কাটিয়ে দেবার অছিলায়। মাঝ রাতে ঘুমের নেশা চটে গেলে চোখে আর ঘুম আসে না। প্রাণকান্ত শুয়ে শুয়ে রাতের দীর্ঘতায় বিরক্ত হয়ে ভাবে, রাত যত দীর্ঘ তত আবশ্যকহীন।

ভোরের আলোর উঁকি পেতে না পেতেই সে ঘর ছেড়ে বার হয়ে পড়ল।...

কোন দিন মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়, কোন দিন হয় না; কিন্তু কোন কথা ব'লে তার পরিচয় জানবার সাহস হয় না অথচ দেখা হবার পর ঘরে ফিরে প্রতিদিনই সে স্থির করে যে পরদিন সে নিশ্চয়ই তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করবে।

এমনি ভাবে দিন ছয়েক কাটাবার পর একদিন সে স্থির প্রতিজ্ঞ হ'য়ে বার হ'ল। প্রতিজ্ঞা তার রক্ষাও হল, পরিচয়ও সে জানতে পারলে, কিন্তু কথা সে কমলার সঙ্গে কইতে পারে নি। ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছিল অন্য উপায়ে।

প্রতিদিনের মতো প্রভাতী অভিসারে বার হ'য়ে তার সাক্ষাৎ হল বীরুর মায়ের সঙ্গে। সে দিন কমলার বদলে তার শাশুড়ী এসেছিল তাঁর বৌয়ের কাজে। নিতান্ত সাহস সঞ্চয় করে প্রাণকান্ত তাঁকে প্রশ্ন করলে—আজ আপনি যে জঞ্জাল ফেলতে এসেছেন ?

বীরুর মা তার কথায় সচকিত হ'য়ে সোজাসুজি প্রাণকান্তের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—আর বাবা আজ দুদিন হল বৌমা পড়েছে জ্বরে। কাজেই আমার এই কর্ম্মভোগ।

প্রাণকান্ত তার স্মৃতির খাতার পাতা উল্‌টে দেখলে আগের দিনে মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয় নি বটে। কিন্তু লোকের সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ যে কখনও গ্রহণ করে নি, আজ এই আলাপের উত্তরে কি বলা যায় তা নিয়ে তার এক মহা সমস্যা উপস্থিত হ'ল। সে তার মাথা চুলকে শুধু একটি কথা বলতে পারলে—ও! বীরুর মা তাঁর গলার সুরে স্নেহের ধার মিশিয়ে বললেন—তা বাবা তুমি এত সকালে উঠেছ যে ?

ফস্ করে তার মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল—রাত্রে আর ঘুম হয় না, তাই ভোর না হ'তেই একটু বেড়াতে বার হ'য়েছি।

স্নেহের মাধুর্য্য প্রাচুর্য্যে ভরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—আহা হা বাবা, তোমার যে কি হচ্ছে তা কি বুঝি না। ছেলের কি কষ্ট তা এই মায়েরাই বোঝে। ক্ষেপার মতো বেড়িয়ে আর কি হবে বাবা? যা হবার তা' ত হ'য়ে গিয়েছে। কমলার শাশুড়ীর চোখের উদ্গত অশ্রু বাবার কাপড় দিয়ে মুছে ফেলে আবার বয়সের সঙ্গেই ব'লে চললেন—শরীর যে তোমার শুকিয়ে আধখানা হ'য়ে গিয়েছে। এ দিকে একটু মন দাও। বাঁচতে হবে ত।

বাঁচতে হবে নিশ্চয়ই। অন্তত এই কথাটাই আজ সব থেকে তার মনে লাগল; অথচ দু'দিন আগে সে এর উল্টোটাই ভেবেছিল, বেঁচে লাভ কি? বেঁচে লাভ কি তা সে জানে না; কিন্তু তাকে বাঁচতে হবে এই কথাটাই সত্য।

প্রাণকান্ত খুসী হ'য়ে উঠল। বিধাতা মানুষকে কত বিচিত্র ভাবেই না গড়েছেন! প্রাণকান্ত একান্ত করুণ ভাবে বললে—মা গেলেন, আমার আর থেকে লাভ কি!

ও কথা বলিসনি বাবা, তোর মা গেছে আমরা আছি ত! তোর যখন কিছু ভাল লাগে না আমার কাছে এলেই ত পারিস বাবা। ছেলেবেলা থেকে তোদের দেখছি, তোদের কষ্ট দেখলে যে আমার বুক ফেটে যায়। তোরা যে আমার বীরুর সমান। পথে পথিকের পায়ের সাড়া পাওয়া গেল। বীরুর মা ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে গেলেন—মাঝে মাঝে আমার আছে আসিস্ বাবা। আজ আবার বেলা হ'য়ে গেল।

প্রাণকান্তের আর বেড়ান হল না। সে বাড়ী ফিরে এল। অকারণে সে শিস্ দিয়ে সিঁড়িতে উঠতে লাগল। কিছু দিন আগে হলে সে নিজেই নিজের ব্যবহারে অবাক হ'য়ে যেত।

মরুভূমির পিপাসা আর কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। অনাদর ও অশ্রদ্ধার বোঝার তিক্ত মন আজ সকালের স্নেহের অমৃতে মধুময় হয়ে উঠেছে। মায়ের স্নেহাশীষের সাগরে অবগাহন করার জন্যে সে উতলা হয়ে উঠল।

আফিসের কাজ করতে করতে সে কতবার ভেবেছিল যে, আজ কাজ শেষ ক'রে সে কমলাদের বাড়ী যাবে কারণ সকাল বেলা জ্বরের খবর শোনার পর এ বেলা খবর না নিলে অভদ্রতা হবে, কিন্তু আফিস থেকে ফিরে আসার পথে তার সাহস যেন ক্রমশ কমে আসছিল। সে কমলাদের বাড়ীর দরজার কাছে এসে, কোন সাড়া না দিয়েই যখন ফিরছে তখন সে বাড়ীর জানালা থেকে বীরুর মা বললেন—কে কান্তি, আপিস থেকে ফিরছিস্ বুঝি ?

প্রাণকান্ত থমকে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—হ্যাঁ।

বীরুর মা বললে—আহা, তাই দেখছি মুখটা যেন শুকিয়ে গেছে। তা বাবা একটু জল খেয়ে যা না।

এ আহ্বান উপেক্ষা করার মতো শক্তি প্রাণকান্তর ছিল না।

কমলার জ্বর যেন ছাড়তে চাইছিল না। দেহে রোগের বীজাণু যেমন দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় করে ক্রমশ পুষ্টি-লাভ করে, মানুষের দুস্থ অবস্থাকে উপলক্ষ্য করে আলাপ পরিচয় তেমনি সুনিবিড় হয়ে ওঠে। কমলার জ্বর লক্ষ্য করে প্রাণকান্ত বললে—মা, অনেক দিন হ'ল জ্বর যখন ছাড়ছে না, তখন না হয় ডাক্তারই ডাকি।

বীরুর মা বললেন—বাঙালীর ঘরের মেয়ের জীবন এত পল্‌কা নয়। ডাক্তার না ডাকলেও সেরে উঠবে'খন। আর তা ছাড়া ডাক্তারকে টাকা দেবার মতো অবস্থাই বা কৈ বাবা।

আপত্তি যে কোন্‌খানে তা যখন বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠল তখন আর কোন কথা না ব'লে সে নিজের খরচেই ডাক্তার ডেকে আন্‌লে।

প্রাণকান্তর এই কাণ্ডটাকে বীরুর মা তাঁর জানা সকল রকম গৌরবজনক বিশেষণ দিয়ে অভিহিত করতে সে শুধু এই কথাটাই বললে—আপনি কি আমাকে পর মনে করেন?

বীরুর মা নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—না বাবা, তুমি আমার ঘরের ছেলের মতো।

প্রাণকান্ত শান্ত হল।

কমলার জ্বর বিশেষ কোনো রকম শক্ত হয়ে দাঁড়ায় নি। সে সুস্থ হ'য়ে ওঠার পর একদিন মা বললে—মা, এইবার একদিন কান্তিকে নিজের হাতে রেঁধে খাইয়ে দাও। তোমার রোগে ও যা করনা-টা করেছে।

এ কথার মধ্যে হয় ত কোনো ইঙ্গিত ছিল না। কিন্তু তবুও কমলা একটু রক্তিম হয়ে উঠল। বললে—আচ্ছা মা! তুমি ওঁকে বলে একটা দিন ঠিক কোরো। আপিসে যারা কাজ করে, তাদের ত আবার সব দিন সুবিধে হয় না।

তা জানি বৈ কি মা।

প্রবীণার সমস্ত রকম অভিজ্ঞতা ও আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে একদিন কমলার শাশুড়ী প্রাণকান্তকে আসতে বললে। নিমন্ত্রণ কথাটা বলা হয় ত অশোভন হতে পারে ভেবে তিনি বললেন—কান্তি, বাবা, বৌ-মা বলছিল যে সারা হপ্তাটা ত যা তা খেয়ে কোনো রকমে আপিস করিস। ছুটী-ছাটার দিনটা না হয় আমার ওখানেই কাটিয়ে যাস না বাবা।

এই কথার জালের বাঁধন কাটবার তখন তার ক্ষমতা কোথায়। সে বললে—শনিবার সবচেয়ে ভাল। খেতে ত বড় পাই না। একদিন যদি পাওয়া যায় ত নয় প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়েই খাব। তারপর যা হয় পরের দিন ছুটি ত রইলই। সেই ভাল।

খাবে ত একটি লোক কিন্তু সারাদিন ধরেই তার উদ্যোগ। সকাল বেলার পর্ব্ব সেরে কমলা সারা দুপুরই রান্না আর ভাঁড়ার ঘর নিয়েই ব্যস্ত। কাজের বেলায় সময় যেন ছুটে চলে। তার নাগাল পাওয়া শক্ত। পাঁচটার সময় মা বললেন—বলি বৌমা, সারাদিনই কি আগুনের সঙ্গে যুঝ্‌বে নাকি? এদিকে যে পাঁচটা বাজল—গা ধুয়ে নিতে হবে না?

কমলা ঝাঁঝাল সুরে জবাব দিলে—না।

শাশুড়ীর সুর নরম হয়ে এল। বললে—তোমার জন্যেই বলছি মা। ছোট বাড়ি; কান্তি এসে পড়লে তখন কেমন করে ও সব পাট শেষ করবে বল ত? এর পর আর কোন সাড়া এল না।

অন্ন না যত্ন কোন্‌টা তাকে ঠিক আকর্ষণ করল এ কথা বলা বড় শক্ত। প্রাণকান্তের যাতায়াত নিয়মিত হয়ে উঠল। আপিস যাবার পথে এই বাড়ীটা যেন তাকে আকর্ষণ করতে থাকে। চুম্বকে লোহা আকর্ষণ করার কথা অত্যন্ত পুরাতন বটে কিন্তু সত্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পাড়ার কারো সঙ্গে তার বড় বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল না। এবারে কিন্তু পাশা উল্‌টে গেল। তার সঙ্গে পাড়ার ছেলেদের আলাপ মুখ-চেনার পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে আরম্ভ হল। এতে সে অসুখী হয় নি কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে

ছিল। তাদের উদ্দেশ্য বোঝাবার সাধ্য তখনও তার হয় নি।

তারা আড়ালে যাই বলাবলি করুক, সামনে তখনও স্পষ্টভাবে কিছু বলবার মতো সাহস তাদের হয় নি! কি জানি লোকটিকে ত ভাল চেনা যায় নি। হয় ত শুনে খামকা চটামটিই করে বসবে। ...

প্রাণকান্তের কিন্তু ওদের কথার দিকে কান দেবার মতো সময়ও ছিল না। সকালবেলা কোনো রকমে নিজের আঙুল পুড়িয়ে রান্না সেরে সে আপিস করতে গিয়েছিল।

বিকালবেলা ফেরবার পথে সে তার গন্তব্য স্থানে যথামতো পৌছতেই—বীরুর মা তার হাতে ফোস্কার কাল দাগ দেখে, বললে—রাঁধতে গিয়ে বুঝি হাতটা পুড়িয়ে ফেলেছিস্ বাবা! বলি ত এখানে না হয় ও ব্যবস্থাটা কর। বৌমার আর কি কাজ বল না। দুটো মনিষ্যির রান্না, নয় তার ওপর আর একজন। ...

প্রাণকান্ত তাতে বাধা দিয়ে বললে—না না, তা কি হয়! আমার জন্যে আর একজনকে কেন কষ্ট দি। ও কিছু নয়।

বীরুর মা স্নেহের আতিশয্যে বললেন—না, সে হবে না। আমি থাকতে যে তুমি হাত পুড়িয়ে খাবে তা হবে না।

বীরুর মায়ের গলার স্বর উচ্চগ্রামে চড়ল—বৌমা, উনুনে আগুন আছে ত। বাতির জন্যে একবার হাঁড়িটা চড়িয়ে দাও ত মা।

কমলা একবার শাশুড়ীর সামনে এসে তারপর ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করলে।

পাড়ার মদনমোহন ঠাকুরের সন্ধ্যারতির বাজনার আওয়াজ হাওয়ায় ভেসে এল।

বীরুর মা চকিত হয়ে বললেন—তুই ত আছিস বাবা, আমি একবার না হয় ঠাকুরের আরতি দেখে আসি। কত পাপই যে গত জন্মে করেছিলুম, বীরু যাবার পর ওসব পাট ত এক রকম উঠেই গেছে।

তাঁর চক্ষু সজল হ'য়ে উঠল। অঞ্চলে অশ্রু মার্জনা করে বললেন—ঘরে সোমত্ত বৌকে একলা রেখে ত আর যাওয়া যায় না কোথাও!

সত্যি বটে।

প্রাণকান্ত চুপ করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার চোখে পড়ল রান্নাঘরের দিকে। কেরোসিনের ডিবিয়ার আলোর চেয়ে উনানের কয়লার আলো অনেক বেশী তীব্র। সেই আলোর আভায় কমলার মুখখানি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। কপালের ওপর থেকে কাপড়ের ঘোমটা খসে গিয়েছে।

লোভী মনের চোখ নির্নিমেষে সেই দিকে তাকিয়ে আনন্দ লাভ করেছিল, হঠাৎ মনে হল কমলা যেন সেই দিকে তাকিয়ে দেখলে। তারপর কমলা রান্নাঘর থেকে বার হয়ে এল।

প্রাণকান্তের বুকটা ঢুপ্ ঢুপ্ করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি তার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের ভিতরের দিকে একটা কৃত্রিম দৃষ্টিপাত করলে। হারিকেনের লাল আলোয় সমস্ত ঘরটাতে বেশ আলো-আঁধারের খেলা চলেছে।

মেঝের ওপর একটা কার্পেটের আসন পড়েছিল। সেটা হাতে তুলে নিয়ে লক্ষ্য হল যে, এটা অসমাপ্ত। প্রাণকান্ত অনাবশ্যক ভাবে এই আসনটার দিকে চেয়ে রইল।

কমলার গলার স্বরে চমকে উঠতে তার কানে এল—আমি ভাবলুম, আপনি বুঝি চুপ করে একলাটি বসে আছেন।

প্রাণকান্ত ঢোক গিলে বললে—না, আমি, মানে, এটার দিকে দেখছিলাম। ভারী সুন্দর হয়েছে এটা। তবে কিনা—মাঝে, এটা শেষ হয় নি দেখছি।

—যেটা শেষ হয় নি তা দেখে আর কি হবে? কমলার গলার সুরে ব্যঙ্গের পর্দ্দা বেজে গেল।

প্রাণকান্ত নিতান্ত অপ্রতিভ হয়ে বললে—না, এটা ভারী চমৎকার হয়েছে। তাই দেখছিলুম। ও আমি বলি বা আর কিছু। কমলার গলার সুরে হাসির চাপা লহর যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

প্রাণকান্ত সচেতন হয়ে কথার মোড় ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বললে—কিন্তু এটা শেষ করেন নি কেন?

—সুযোগ পাই নি বলে। কথাটি বলেই কমলা তার হাত থেকে বোনাটা কেড়ে নিল।

প্রাণকান্ত অত্যন্ত আশ্চর্য্যভাবে কমলার দিকে চেয়ে রইল।

এর মানে কি? মানে কিছু না। শান্ত দুপুরের অলস বাতাসে কি মাঝে মাঝে ঘূর্ণী ওঠে না?

নিজের অবস্থাটা একটু সুসংযত করে নেবার অছিলায় কমলা বললে—আর পশম ছিল না বলে, শেষ হয় নি। তা ছাড়া খালি এই বোনার কাজে কদিন মাথাটা বড় ধরে ছিল।

—বুনতে বুঝি ভারী ভালোবাসেন?

—অগত্যা ভালবাসি বলতেই হবে। না হলে যে চলে না। কমলার ঠোঁটে একটা চাপা হাসির রেখা খেলে গেল। কথাটায় হয় ত আর একটি মানেও থাকতে পারে।

প্রাণকান্ত এদের অবস্থাটা ঠিক জানত না। তবুও এদের অবস্থা যে নিতান্ত দুঃস্থ এইটাই সে কল্পনা করে নেবার চেষ্টা করতে লাগল।

—হয় ত ভাত ফুটে গেল। বলে দ্রুতপদে কমলা চলে গেল।

বাহিরের দরজা খোলার শব্দ কানে আসতেই কমলার পরিত্যক্ত বোনা প্রাণকান্ত হাতে তুলে নিয়ে তাতেই মনোযোগ দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

কমলার শাশুড়ী ঘরে ঢুকে বললে—কান্তি, বাবা, অনেকক্ষণ একলা চুপ করে থাকতে বড় কষ্ট হয়েছে, না?

প্রাণকান্ত প্রতিবাদ করে বললে—না না, আমি এইটি দেখছিলাম। ভারী পরিষ্কার কাজ।

—ও, ওই পশমের বোনা বুঝি। তা বাবা, ওই ত ওর কাজ। ওই বেচে ত দিন গুজরান করতে হয় আমাদের। তা বৌমা আমার ভারী কর্ম্মিষ্ঠি।—

বুড়ী তার বৌমার গুণ ব্যাখ্যান করতে বসল।

মাঝপথে কমলা এসে ঘোমটার আড়ালে চুপি চুপি বাধা দিয়ে বললে—মা, তুমি একটু এস না রান্নাঘরে। নয় ত খাবার হতে যে অনেক রাত হয়ে যাবে।

প্রাণকান্তের কাজ বেড়ে গেছে। আপিস করে চীনে বাজারে ঘুরে রঙ্ মিলিয়ে পশম কিনতে হয়। কাজটি বড় সোজা নয় কিন্তু তার আকর্ষণও বড় কম নয়, এই লাভ। কিন্তু লোকে কি সব সময়ে লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখে?

মানুষের একটা বয়স আছে যখন সে ভগবানের দিকে একবার ঝুঁকে পড়ে। কারণেও, অকারণেও! কমলার শাশুড়ীর ঠিক সেই বয়স এসেছিল কিনা বলা শক্ত, তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভগবানের পাদপদ্মের সৌরভে তাঁর মন ভোমরা একেবারে মত্ত হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যাকালে মদনমোহনের উৎসবারতির পূজা দর্শন না করলে তাঁর মনের যেন তৃপ্তি হত না। এই কথাটাই তিনি প্রাণকান্তকে বার বার বুঝিয়ে বলতেন।

প্রাণকান্ত তাঁর কথার উত্তরে অনেক ভেবে চিন্তে বললেন—তিনি যখন টানেন তখন এমনি করেই টানেন।

বুড়ী উদ্দেশ্যে তাঁকে বার বার প্রণাম জানায়। প্রাণকান্ত ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাঁর বাড়ী পাহারা দেয়।

এমনি করেই দিন কাটছিল ভালই। এমন সময় এক বিপত্তি ঘটল।

পঞ্জিকায় সন্ধ্যার একটু আগে, অথচ শহুরে রাত্রির আরম্ভের পূর্ব্বে, রাধাবাজারের পথে গাড়ীঘোড়া ও মোটরের ভিড় অসম্ভব বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় এ পথ মানুষের হেঁটে চলবার জন্ত তৈরী হয় নি, তৈরি হয়েছে মোটরে চড়বার জন্তে। গাড়ী ঘোড়া বা মোটরে চড়বার সম্ভাবনা যাদের কম, ওসবেতে চাপা পড়ার সম্ভাবনাও তাদেরই বেশী। কাজেই যারা পথটা নির্ব্বিঘ্নে পার হতে পারে তারা ভাবে, যাক্ অন্তত এ দিনের ফাঁড়াটা ত কাটান গেল। এমনি করে প্রাণকান্ত ত অনেক দিন পার হয়ে আসত। কিন্তু সে দিন হয়েছিল কি, একটা মোড়ের মাথায় আলো-আঁধারের ধাঁধার মধ্যে দিয়ে কোনো রকমে কয়েকটা গোরুর গাড়ী ও ঘোড়ার মুখ বাঁচিয়ে সে এসে পড়ল

একেবারে এক প্রকাণ্ড মোটরের সামনে। মোটর যিনি চালাচ্ছিলেন তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন—You silly ass! ধমক খেয়ে প্রাণকান্ত আরও বেশী করে ঘাবড়ে গিয়ে একেবারে মোটরের উপর হুমড়ে পড়ল। মোটর তখন অত্যন্ত মৃদু গতিতে চলছিল, কাজেই আঘাত তেমন বেশী লাগে নি কিন্তু সে ভাস্ত কলকাতার পথে ভিড় জমতে একটু দেরী হয় নি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা দিতে মোটরের অধিকারী তাড়াতাড়ি প্রাণকান্তকে মোটরে তুলে নিয়েই বললেন—কে, প্রাণকান্ত না?

প্রাণকান্ত ঘাড় নাড়লে। বললে—বিজয়?

বিজয় সে দিকে কান না দিয়ে ভিড়ের দিকে লক্ষ্য করে বললে—আমাদের পথ ছেড়ে দিন দিকি। আমি ডাক্তার, তার ইনি আমার বন্ধু, কাজেই কি করা উচিত না উচিত সে আমি আপনাদের চেয়ে ভাল বুঝি।

বিজয় মোটর নিয়ে ভিড়ের থেকে বের হয়ে বললে—তেমন কিছু হয় নি বোধ হয়।

প্রাণকান্ত বললে—না, তবে মুমড়ে গিয়েছে। বিজয় বললে—ও কিছু না, মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাব, বাড়ী পৌছে দেব।

—বাড়ী চল। প্রাণকান্ত বাড়ীর ঠিকানা বলে দিলে। সে একটু আশ্চার্য্যও হ'ল; বিজয়ের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

প্রাণকান্তদের বাড়ীর ঠিক সামনে পর্য্যন্ত মোটর যেতে পারে না। মোটর থামল কমলাদের বাড়ীর সামনে।

প্রাণকান্ত আঘাতটাকে যতটা সামান্য ভেবেছিল, মোটর থেকে নামতে গিয়ে দেখলে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। অগত্যা বিজয়ের কাঁধে ভর করে সে কমলাদের বাড়ীতেই উঠল।

কমলার শাশুড়ী আর্ত্তস্বরে বলে উঠলেন—এমন সর্ব্বনাশ কি করে হল?

বিজয় তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—বিশেষ কিছুই হয়নি। পা-টায় একটু লেগেছে।

কমলা প্রাণকান্তকে নিঃসঙ্কোচে ধরে পালঙ্কের উপর শুইয়ে দিলে।

একজন অপরিচিতের সামনে কমলার নিঃসঙ্কোচ আচরণে বিজয় একটু আশ্চর্য্য হয়েই এই তরুণীটির দিকে তাকিয়ে দেখল।

কমলা তখন নিপুণহস্তে প্রাণকান্তের সেবার উদ্যোগ করছে।

বিজয় ভাল করে একবার প্রাণকান্তের পায়ের অবস্থা দেখে বললে—বিশেষ কিছু না, সামান্য sprain হয়েছে। রাত্তিরে খানিকটা গরম জলের সেঁক দিলেই হবে। আর আমিও কাল আসব এখন।

যাবার সময় বিজয় একবার কমলার দিকে চেয়ে গেল। কমলা তখনই জলগরম করার উদ্যোগ করছে।

পায়ের শব্দে চকিত হয়ে কমলা বললে—কাল আপনি একবার দয়া করে আসবেন। আঘাতটা সামান্য হলেও একটু দেখা ভাল।

বিজয় সম্মতি জানিয়ে হেসে চলে গেল।

কমলার শাশুড়ী প্রাণকান্তকে প্রশ্ন করলেন—ওটি তোমার বন্ধু বুঝি। ভারী ভাল ছেলে। তোমায় কত কষ্ট করে পৌছে দিয়ে গেল। অত বড়লোক, তবুও কত মিশুক ...।

প্রাণকান্ত চুপ করে শুয়ে রইল।

সে ভাবছিল—সেবা গ্রহণ করার মধ্যে ভারী একটা আনন্দ আছে। রৌদ্রে পথে চলতে চলতে পথশ্রান্ত পথিকের কাছে গাছের ছায়ার স্নিগ্ধতা বড় কম মিঠে লাগে না। কিন্তু সেটা কারো সম্পত্তিবিশেষ বলে মনে করলে ভুল করা হবে।

প্রাণকান্তেরও হয়েছিল সেই দশা। বিজয় ডাক্তার, তার নিত্যকারের কাজ সেরে তাকে যখন দেখতে আসত, তখন স্পষ্ট বোঝা যেত সেও যেন বড় শ্রান্ত। তার এই শ্রান্তিটাকে প্রাণকান্ত হিংসা করত আর কমলা তার শ্রান্তিবিনোদনের জন্য ব্যবস্থা করত।

সামান্য রোগের শেষ হ'তে বিশেষ দেরী হয় না; কিন্তু সামান্য সূত্রের আলাপ পরিচয়ের নিবিড় বাঁধনেরও

শেষ হয় কি? বিজয় ডাক্তারের মোটর মাঝে মাঝে কালে অকালে এলে প্রাণকান্ত অখুশী বই খুশী হত না।

একদিন নিতান্ত মরিয়া হ'য়ে প্রাণকান্ত বলে ফেললে—বিজয় ডাক্তারের সময়ে অসময়ে আসাটা পাঁচজনে মন্দ ভাবতে পারে।

কমলার শাশুরী বললেন—ওমা, বিজয় আমার ঘরের ছেলের মতো। আমার কাছে তুমিও যা, বিজয়ও ত তাই। ও আমার এমন কি অপরাধ করলে।…

প্রাণকান্ত খুশী হল না। সে কমলার মুখের দিকে চাইলে। কিন্তু সে মুখে হাসিও নেই অশ্রুও নেই। প্রাণকান্ত মনে মনে সশঙ্ক হ'য়ে উঠল। হয়ত সন্দেহের ঝোঁকেই পশমের রঙ্ ঠিক্ মিলিয়ে কিন্‌তে পারে না। কিন্তু চেষ্টা করে।

এই চেষ্টার ফলেই একদিন সে আবিষ্কার করলে—আর পশম কেনার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনের অতিরিক্তই তখন ভাণ্ডারে মজুত রয়েছে।

মনটা ক্রোধে ও ক্ষোভে বিষিয়ে উঠল। সে কমলার সামনেই বলে ফেললে—পাঁচজনে যে তা হলে—

মন্দই ভাবে সেটা তাদের স্বভাব। অত্যন্ত সহজভাবে অথচ কঠিন স্বরে তার পদ সমাপ্ত করে কমলা ঘর থেকে বার হ'য়ে গেল।

এতদিনে প্রাণকান্তের ঘরের দিকে লক্ষ্য হল। ভিতরে অনেক আবর্জ্জনা জমে উঠেছে। কিন্তু তা সাফ্ কর্‌বার প্রবৃত্তি আর নেই।

পাড়ার পাঁচজনের সঙ্গে সেও মিশে গেল। বৈঠকী আলাপ যে এত রসাল তা নূতন করে সে বুঝতে পারলে।

নিন্দা করলে নিন্দা করবার প্রবৃত্তিই বেড়ে যায়। নিজের আক্রোশ তাতে কমে না। তাই আপিস থেকে ফেরার পথে অন্যদিনের মতো সেদিনও বিজয়ের মোটরের চিহ্ন না দেখে, খোলা দরজা পেয়ে সে একরকম নিজের অজ্ঞাতসারেই কমলাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলে।

বাড়ীতে বোধ হয় আর কেউ ছিল না। কমলা রান্না ঘরে। প্রাণকান্ত রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াল, কমলা তার হাতের কাজ ফেলে দরজার দিকে ফিরে তাকাতেই প্রাণকান্তের মূর্ত্তি দেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললে—নিন্দার কালি ছিটিয়ে বাস তোলা যায় না বলে কি নতুন উপায়ে—

প্রাণকান্তর মনে কিন্তু সত্যই সে রকম কিছু ছিল না। নিজেরই সৃষ্ট অভিমান-ক্ষতের শান্তির আশায় সে এসেছিল।

কমলার সমস্ত কথায় ও বলার ভঙ্গীতে এমন একটা উগ্র জ্বালাময়ী আঘাত ছিল যে, সমস্তটুকু শোনবার মতো ক্ষমতাও তার ছিল না। সে তাড়াতাড়ি অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে রাস্তায় এসে পড়ল। গলির মোড়ে একটা মোটরের আলো তার চোখে এসে পড়তে সে চোখ বুজেই তার ঘরের দিকে ছুটে গেল। মনে মনে ভাবল—এ নিশ্চয়ই বিজয়ের মোটর।

দু'দিন বাদে তার এ চিন্তা বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেল। কমলাদের বাড়ীতে তালা বন্ধ। দরজায় একটা কাগজে লেখা বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে।

প্রাণকান্ত প্রথমে অকারণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। একটু পরে নিজেই বিচার করে শান্ত হয়ে এল। ভাবলে—ভাল। কথাটা উচ্চারণ করে নিজের মনে একবার হেসেও নিলে।

হাসির সঙ্গে যদি কিছুর শেষ হত তা হলে শেষ ভালই হয়েছে বলা যেত কিন্তু জগতে শতকরা নিরানব্বইটি ব্যাপারই আর যে ভাবেই শেষ হ'ক না কেন তার সঙ্গে হাসির সম্পর্ক বড় কম।

প্রাণকান্ত আবার তার ঘরটাকে আশ্রয় করে দিন কাটাবে স্থির করলে। ঘরের কোণের আবর্জ্জনা দূরে ঠেলে দিলে, মায়ের ছবিতে মাকড়সা জাল বুনেছিল, সে গৃহচ্যুত হল। আবার ধূপধূনার ভারে সন্ধ্যার বাতাস মন্থর হয়ে উঠল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, ক্রিয়া চলে কিন্তু তার মধ্যে জীবনের অত্যন্ত অভাব। প্রাণকান্ত এটা অনুভব করে। বোঝে এ যেন নিজেকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা। পূর্ণ উৎসাহে কাজ আরম্ভ করে দেখে শেষ করার আর কোনো স্পৃহা নেই। মাঝপথে সব গতি থেমে যায়।

এমনি ভাবে প্রাণকান্ত যখন নিজেরই ওপর নিজে বিরক্ত হয়ে উঠে একটা কিছু সাংঘাতিক করে বসবার

মতলব ভাঁজছিল এমন সময় প্রবোধের সঙ্গে দেখা। সেই রোগা একহারা চেহারার ছেলেটি দিব্য দোহারা শরীর লাভ করেছে। আর একটা বাহ্যিক পরিবর্ত্তনও তার ঘটেছে, তার পূর্ব্বের ছিন্ন বস্ত্রের স্থান অধিকার করেছে নূতন গৈরিক বসন। কিন্তু স্বভাবটি আছে পূর্ব্বেরই মতো—কি রে প্রাণকান্ত কেমন আছিস?

প্রাণকান্ত প্রবোধকে দেখে ভারী মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে তার মনের অশান্তির কথা প্রবোধকে খুলে বলতেই, প্রবোধ হো হো করে হেসে বললে—এ ছি সংসার! তুই আমাদের দলে চলে আয়। মানুষ বড় হয়ে কত সময়ে তাদের সেই ছাত্রজীবনে ফিরে যেতে চায়। আমাদের এই জীবন হচ্ছে ঠিক সেই ছাত্রের জীবন।

প্রাণকান্ত প্রবোধের সঙ্গে ভিড়ে পড়ল।

এই নতুন জীবন-যাত্রার পথ তাকে মুগ্ধ করল। তার মনের অশান্তির কোন খবর আর তার কানে পৌঁছায় না। তার মনে হল সে ভারী তৃপ্ত।

অতি প্রত্যূষে উঠে, মঠের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তার মনে হল গঙ্গা স্নান করে আসি। সঙ্গে প্রবোধ। সে বললে—চল আমার কোন আপত্তি নেই।

মঠের বাগান পার হয়ে যখন তারা ফটকের কাছে পৌঁছেছে তখন একটি কচি ছেলের কান্না তাদের কানে এল।

ঘাসের ওপর একটা কাপড় বিছিয়ে তার ওপরে একটি সদ্যোজাত ছেলে ... জগতের প্রবেশ-পথে প্রথম আঘাতে রোরুদ্যমান।

গঙ্গাস্নান করা হল না। প্রবোধ হেঁট হয়ে ছেলেটিকে বুকে তুলে নিলে।

প্রাণকান্ত যন্ত্রের মতো প্রবোধকে অনুসরণ করে চলল।

মঠের মহারাজজী ছেলেটিকে দেখে বললেন—একে কোথায় পেলে?

রাস্তায়। বলে প্রবোধ হাসলে।

মহারাজজী ছেলেটিকে বুকে তুলে নিয়ে বললেন—মেয়েরা নিজের ভুলে নিজেকে হারিয়ে ফেললে তাদের দেবীত্ব যায় না, কিন্তু যে দিন তারা মাতৃত্ব ভুলে যায় তখন তারা রাক্ষসী সাজে।

প্রাণকান্ত এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হয় ত অকারণে তার মনে হল ছেলেটির মুখে যেন কমলার মুখের আদল।

ও চিন্তা আর নয়। প্রাণকান্ত নিজের মনকে এক ঘা চাবুক কসিয়ে পুঁথির সাগরে ডুব মারলে।

কুড়ের বাথান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

কতকগুলো লোক একটা দেশজুড়ে বসেছিল। কেউ করত সাহিত্যের চর্চ্চা, কেউ করত গানের, কেউ দর্শনের। ধর্ম্মপ্রচারকও ছিল অনেক। যখন যার খুসি একটা না-একটা দলে ভিড়ে যেত। মনে নূতন ধরণের কিছু উদয় হলে' ছন্দবেঁধে কাব্য লিখ্‌ত। দেশে শস্য ছিল অপর্য্যাপ্ত। তখনো পেটের জ্বালা ধরেনি. রোগ শোক ছিল কম। ছেলেপুলে ম'রে গেলে তাদের মা মাসী কাঁদত। কচি কচি মেয়ে পুতুলের বিয়ে দিয়ে সময় কাটাত'। পয়সাগুলো ছিল লোহা ও তামায় মেশান্‌। তার নাম ছিল ঢেবুয়া।

এদের প্রধান স্বভাব ছিল নাকডেকে ঘুমানো। নাক ডাকত সকলেরিই; কিন্তু কেউ স্বীকার করত না। এটা যে মিথ্যা কথা তাও নয়। কেননা, নিজেদের নাক ডাকা তারা

শুন্‌তে পেত না। যদি ঘটনাক্রমে কারও ঘুম ভেঙে যেত, সে অন্যের নাক ডাকাটাকে নিজের বলেই মনে করত। সর্পে রজ্জুভ্রমের মতো।

কেউ যে মেহনত করত না, তাই বা কি করে বলা যায়? চাষীরা ঘণ্টা দুই তিন লাঙ্গল টান্‌ত। লাঙ্গলের ফাল বেশী মাটির নীচে প্রবেশ করত না। সে রকম ঘটনা হঠাৎ হয়ে পড়লে গরু ও চাষী উভয়েই চিৎপাত হ'য়ে প'ড়ে যেত। কোঠা বাড়ী কি ছিল না?—তাও ছিল। ইট তৈয়ারী করতে তিনবৎসর লাগ্‌ত। তার মধ্যে শেয়াল কুকুর তিন বৎসর ধ'রে সন্তান সন্ততি প্রসব করলে, তবে পাঁজা ভাঙা হ'ত। যাতায়াতের জন্য গরুর গাড়ী ও পাল্কী ছিল। সকালে খেয়ে বেরুলে ওপাড়ায় পৌঁছতে সারাদিন লাগ্‌ত। ফেরতার সময় বেয়ারাদের পাওয়া যেত না। বলদগুলো কারও ক্ষেতে ঢুকে পড়ে চরে খেত। বেয়ারাগুলো ভাঁটিতে মদ খেয়ে কুপোকাৎ হয়ে পড়ত। চুরি ডাকাতির দরকার ছিল না, কেননা কারও ক্ষেতের সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল না। এক তরফ থেকে কারও ফসল কেটে আন্‌লেই হ'ল। ফসল এত যে, কাটবার লোকই পাওয়া যেত না। যদি কেউ মেহনত ক'রে কাট্‌ত তবে দশ আঁটির মধ্যে সে পেত একটী। কিন্তু এই একটাই তার পক্ষে গুরুভার হয়ে পড়ত। ফলে সকলেরই বোধ হত যে সংসার একটা ভূতের ব্যাপার। অনিত্য ও অগ্নিমান্দ্যের প্রধান আড্ডা। এত খাদ্য যে হজম করা দুষ্কর।

কেবল মানুষ না, জানোয়ারগুলোরও তাই মত ছিল। তাদের ঘুমের মাত্রা ছিল মানুষের চেয়ে বেশী। কলুর বলদ চল্‌তে চল্‌তে ঘুমত। আপেক্ষিক গতির উপর তার জাগরণ নির্ভর করত। কলুর ঘুমের মাত্রা কম হলে ঘানিতে তেল বেরুত। বেশী হলে ঘানিতে খইলের গাদা বেশী জমে যেত। ধোপা কি ছিল না?—ছিল বৈ কি। কিন্তু ধোপার ছেলে ও মোটা কাপড়ের পিঠবোচকা একত্রে টেনে নিয়ে যেতে গাধার লাগত চব্বিশ ঘণ্টা, অর্থাৎ যে সময়টার মধ্যে পৃথিবী তার মেরুদণ্ডে ঘুরে আবার পূর্ব্বস্থানে এসে হাজির হয়।

তখনকার সাহিত্যিক উপুড় হয়ে, বালিশে ঠেস দিয়ে, শরের কলমে, হলদে মোটা কাগজে মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করত। মাথাটা পাঁচের মতো বেঁকে যাওয়াতে মেরুদণ্ডে টান পড়ত বেশী, কাজেই হৃদয়টাতে চাপ পড়াতে সেই দিক্‌কার ভাব বেরিয়ে পড়ত কলমে। মাথা থাক্‌ত ঘুমিয়ে। সাত দিন দিবা নিদ্রার পর কাব্যের দুলাইন লেখা হ'ত।

বাণিজ্য কি ছিল না?—ছিল বৈকি। নদীবক্ষে বড় বড় নৌকায় মাল বোঝাই করে সদাগর নিয়ে যেত অন্যদেশে। বিশ বৎসর পরে সে ঘরে ফিরত। সঙ্গে আন্‌ত গোটা কতক মণিমুক্তা, কিংবা গোটা দুই তিন বৌ। কাকাতুয়া কিংবা হীরামনের মতো তারা গৃহপ্রাঙ্গনে বসে কপ্‌চাত, কিংবা মাথা দুলিয়ে অভিনয় করত। তাই দেখে দেশের লোক দাঁত বার করে হাসত ও তাদের জন্য খাঁচার মতো পাকাকোঠা করে দিত। কখনো উড়ে পালিয়ে গেলে সদাগর তাদের ধরে আবার খাঁচায় পুরে ফেল্‌তেন।

এমন দেশে রাজা না হয়ে যায় না। কিন্তু রাজা ঠিক কি রকম মানুষ, তা সকলে জান্‌ত না। প্রথমত রাজা এত দূরে থাক্‌তেন যে, তাঁর কোনো খোঁজ খবর রাখা অসম্ভব। রাজার হাতী ঘোড়া সৈন্য সামন্ত ছিল, কিন্তু তারা রাজধানীর বাহিরে কদাচিৎ গেলেও সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আস্‌ত। কখন কেউ গরুর গাড়ী করে ছমাস ধরে পথ বেয়ে রাজাকে দেখ্‌তে যেত, কিন্তু এতগুলো পোষাক পরা লোক রাজদ্বারে পায়চারী করে হাওয়া খেত যে, ঠিক রাজা যে কোন্‌টা তা সে বুঝ্‌তে পারত না। দেশে ফিরে এসে বল্‌ত রাজার সঙ্গে দেখা হওয়া অসম্ভব। তিনি কেবল মন্ত্রণা করেন বাটীর মধ্যে বসে। সেখানে মন্ত্রী, রাণী ও ষণ্ড ছাড়া আর কেউ ঢুক্‌তে পায় না। তবে হাতী ঘোড়া রথগুলো খুব জমকাল। সৈন্যগুলো তলওয়ার ঘুরিয়ে ঘেমে পড়ে, দরওয়ানগুলো গলা হাঁকায়, বাঘের মত শব্দ করে। আমাদের লেঠেলরাও সে রকম কি পারে না? তবে তাদের পোষাক ভাল। যা হোক রাজধানীর দৃশ্যগুলো দেখে এসে দেশের লোক নকল করত খুব সরস রকমের। তাকে বলত তারা যাত্রা-অভিনয়। অভিনয়ে থাকত নট, নটী, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাজা, মন্ত্রী সেনাপতি, ও নানাপ্রকার সং।

ক্রমশঃ নটীর প্রভাব হত বেশী, রাত্রি জাগার মাত্রা বেড়ে গেল, দিবানিদ্রায় ঘুম হল পূর্ব্বের চেয়ে দ্বিগুণ, মদের কাট্‌তিতে ছয়লাপ।

অবশেষে রাজার মন্ত্রী বল্লেন যে, দেশে অধর্ম্ম বেড়ে যাচ্ছে. যারা ধর্ম্মের তত্ত্ব জানেন তাঁদের ডেকে আইন কানুন করে একটু কড়াকড়ি করা উচিত। ধর্ম্মের তত্ত্ব জান্‌তেন যারা তাদের নাম ছিল ব্রাহ্মণ। তাঁরা স্বর্গের তারা-নক্ষত্র ও মানুষের নাড়ীর মধ্যে যে সম্বন্ধটুকু আছে সেটা জান্‌তেন। তিথিগুলোর মর্ম্ম বুঝতেন। তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন যে, ধর্ম্মের একটা সোজাপথ আছে—সেই পথে না চল্লে মানুষ বিগ্‌ড়ে যাবে। মনুষ্যত্ব না দেখ্‌লে পরস্পরের কাহারো উপর শ্রদ্ধা ভক্তি থাক্‌বে না। এর ব্যবস্থা করতে হবে মানবধর্ম্মশাস্ত্র ও নূতন পঞ্জিকা দিয়ে।

পুরাণো পঞ্জিকা একখানা ছিল, সেটার মধ্যে কি পদার্থ ছিল তা সকলে বুঝতে পারত না। নূতন পঞ্জিকা দেখে লোকে জান্‌তে পারল যে, দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা তার মধ্যে জাগ্‌তে হবে বেশী ঘুমুতে হবে কম। হাঁচি, কাশী, নাক-ডাকা কমিয়ে দিতে হবে। গর্ভাধান থেকে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত যত রকম ক্রিয়া-কলাপ মেনে চল্‌তে হবে। উপবাস চাই। যখন যেটা ইচ্ছা খেলে চল্‌বে না। অনাবৃষ্টি হলে তিথি-নক্ষত্র দেখ্‌তে হবে। মানবধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে জাতির বিভাগ হয়ে গেল। যার যা পেশা তাকে তাই কর্‌তে হবে, নিশ্চয়, নচেৎ সমাজ টিঁকবে না। কান যদি হাঁচে, নাক যদি খায়, মুখ যদি শোনে, আর চক্ষু যদি নিঃশ্বাস ফেলে তবে শরীর মানুষের মতো থাক্‌বে না। সেই রকম, ধোপা যদি দাড়ী কামায়, নাপিত যদি দর্জ্জির কাজ করে, কুম্ভকার যদি খড়ম তৈরী করে, তা হলেও সমাজের দেহ অদ্ভুত হয়ে পড়বে। সকলকে নিজের নিজের কাজে মশগুল থাক্‌তে হবে। স্ত্রীলোকদের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল! তারা আল্‌পনা দেবে, পূজা করবে, রাধ্‌বে ও কেঁদে কেঁদে সারা হবে, কেমনা সংসার মায়াময়। মানবধর্ম্মশাস্ত্র পালন করলে সেটা বোঝা যাবে অংশ্য চাল-চলনে সেটা সাব্যস্ত হবে না।

এই প্রকাণ্ড সামাজিক আইনকানুনটা বজায় রাখবার জন্য দণ্ডবিধানের বন্দোবস্ত সুরু হ'ল। কিন্তু যেমন ব্যবস্থা হ'ক না কেন, ব্যবস্থার চেয়ে মানুষ চালাক্। ব্যবস্থা-গুলোতে অকাতরে নাক ডেকে ঘুমান চলে না। দেশের লোকে বল্ল—আমরা মুক্তি চাই। ব্যবস্থাকর্ত্তারা বল্লেন—তবে পূজো আরম্ভ কর্। দেবমন্দিরে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকিস্। ধনরত্ন সেইখানে রাখিস।

লাগ্‌ল তৈয়ারি হতে—মন্দির আর মঠ। প্রথমে একটু মেনে চলেছিল সকলে, তার পরে সকলে মন্দিরে আঁকতে লাগল্ নটীর ছবি, গানবাজনা, সেবাদাসীর ও নর্ত্তকীর অভিনয় আরম্ভ হল। জ্ঞানের মন্ত্র ও রসের তন্ত্র পরস্পরের হাত ধরে' নাচ্‌তে সুরু কর্‌ল।

রাজা ফাঁপরে পড়্‌লেন। দেশ বিদেশে সংবাদ গেল যে, একটা প্রকাণ্ড দেশ আছে সেখানে মেহনত না করলেও ধনরত্ন ও খাবার অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। এ রকম দেশ খুঁজে বেড়াচ্ছিল কতকগুলো কুড়ের বাদশা। রাজা যদি ধর্ম্মের জন্য ব্যস্ত না হতেন তবে এককালে তিনিই বাদশা হয়ে দাঁড়াতেন। ধর্ম্ম পালন কর্ত্তে গিয়ে তাঁর আত্মীয়গণও গিয়েছিল চটে'। কাজেই তারা দু'চার জন বাদশাকে ডেকে রাজাকে তাড়িয়ে দিলে। ব্রাহ্মণেরা নিরুপায় হয়ে টোল পেতে বস্‌লেন ও রাজাকে বুঝিয়ে দিলেন—এ সব প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মের ব্যাপার। 'সময় হলেই আপনি আবার ফিরে আস্‌বেন।' বাদ্‌শারা এসে প্রথমে ধরলে গরু আর মুরগি। সাঁওতালগুলো মুরগি তাড়িয়ে ঘোর জঙ্গলে পালিয়ে গেল। কেবল বিপদে পড়ল বামুন কায়েত চাষা-ভুষো, কেন না তারা গরুর দুধ খেয়েই চিরকাল মানুষ। যা হ'ক, তখন বাদ্‌শাহদের দলবল বেশী ছিল না। তারা এসেছিল দুদিনের জন্য মরুভূমি পার হয়ে বিশ্রাম কর্ত্তে। প্রথমে মারকাট্‌ করেছিল বটে, কিন্তু তারাও কুড়ের দলে মিশে গেল। তাদের হুকুম হল, দেবতাপুতুল ভেঙে ছেলেমেয়েদের পুতুল বাড়িয়ে দে'। মানুষের সঙ্গে দেবতার ভাগাভাগি হতে পারে না। সুতরাং রাজার সময় যে-ভাগটা দেবতার ভোগে যেত, তার বেশী আস্‌তে লাগ্‌ল বাদশার ভোগে। রাজার বংশধরগুলো দেখ্‌লে—এ আবার নূতন কর্ম্মভোগ, কেননা বাদশার বংশ হুকুম কল্লেন যে,

তাদের ভোগের জন্য থালা বয়ে নিয়ে আস্‌তে হবে। রাজার যে সব বংশধর খুসি করতে পারবে, তাদেরই নাম হবে 'রাজা'। রাজার বংশ দেখ্‌ল বন্দোবস্তটা মোটের মাথায় মন্দ না। আবার সুনিদ্রা হবার উপক্রম হল। রাজবংশ ও বাদশার বংশ নিজের প্রভুত্ব আপোষে বাটোয়ারা ক'রে পাকিয়ে নিলে।

পাছে নূতন রাজাগুলো বাদ্‌শাকে ফাঁকি দেয়, সেই জন্য দেশটা চক্‌বন্দি হয়ে গেল। ছত্রিশ জাতির মতো ছত্রিশটা রাজা হয়ে পড়ল। দেশের লোকের খুব সুবিধা হয়ে গেল। বাদশার অভিনয় করত রাজা, ও রাজার নকল করত প্রজা। খবর পেয়ে বাদশা বড় খুসি হলেন। তিনি হুকুম দিলেন—'এখন সকল ধর্ম্মের, ও সাহিত্যের কাব্যের ও ইতিহাসের সঙ্গে তোদের ঐ অভিনয়গুলো মিশিয়ে সামঞ্জস্য কর্। কেবল পুতুলের দেবতা দেখ্‌লেই মাথা কেটে নেব। মন্দিরগুলো ভেঙে দেব।'

ব্রাহ্মণেরা লাগ্‌ল কাঁদতে। তারা স্ত্রীলোকদের ডেকে বল্লে, 'মা, তোরাই এ সময় ধর্ম রক্ষা কর্। পুরুষগুলো নির্ঘাত বিগ্‌ড়ে যাবে।' স্ত্রীলোকদের একটু বুদ্ধি আছে, তারা 'আচ্ছা' বলে' অন্দর মহলে লুকাল। পুরুষগুলো বাদসাপসিন্দ রসকলার চর্চ্চা করতে লাগল।

ধর্ম্ম অন্দরমহলে লুকিয়ে ত্রাহিরবে চীৎকার করতে লাগ্‌ল। জমির চকবন্দির মধ্যে অনাবৃষ্টি আরম্ভ হল। রোগে দেশ ছেয়ে গেল। এক নম্বর কুড়েরা বল্লে, 'কোটাল্! হচ্ছে কি!' কোটাল্ বল্লে, 'গরু ও মানুষ কাবু হয়ে পড়েছে।' দু নম্বরের কর্ম্মচারী কুড়েরা বল্লে, 'ধরে চাবকানি দিলেই সোজা হয়ে যাবে।' পুরুষগুলো মেয়েদের ধ'রে ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করলে। কেবল খাপ কতকগুলোকে ছেড়ে দিলে। দেশজুড়ে একটা কান্নার রোল উঠ্‌ল। বাদ্‌শা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কচ্ছে কি?' ফকিরগুলো বল্লে, 'রহমের' দরকার।' ফকির, ভিক্ষু, সন্ন্যাসীর দল বেড়ে গেল। জীবের উপর করুণা নিয়ে সাহিত্য আরম্ভ হ'ল। তখন বাদশা বল্লেন, 'মন্দির ভেঙে ভাঙবার দরকার নেই। তোরা মিলে মিশে কান্নাটা থামিয়ে দে।' মহাপুরুষের অবতার হল। বিশ্রী ক্ষেত্রের আবর্জ্জনা পায় ঠেলে সকলে দলবেঁধে চলতে লাগল শ্রীক্ষেত্র ও তীর্থক্ষেত্রের দিকে।

ভিক্ষুকের দল গেল বেড়ে। মঠ্‌ধারী বল্লে, 'দেখ্ বাবা! এটা ফকির ফাক্‌রার দেশ। আমরাও ভিক্ষুক তোরাও ভিক্ষুক, রাজাও ভিক্ষুক, বাদশাও তাই। যার যেমন সখ্, তারা জগতে এসে মিটিয়ে নেবেই। সে সখ মেটাতে গেলে জন কতক লোককে লাঙল ধরতেই হবে, কিংবা গতর খাটাতেই হবে। তারাই দেবে ভিক্ষে। যদি না দেয় রাজদ্বারে দণ্ড হবে। যদি দণ্ডের চোটে তারা ক্ষেপে ওঠে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এটা ধর্ম্মের মামলা। আমাদের হাত নেই।'

যে দেশটার কথা হচ্ছে সেটার তিনদিকে সমুদ্র। এক দিকে পাহাড়। সমুদ্রের পরপারে ছিল অনেক দেশ, সে দেশগুলোর লোক জাহাজে চ'ড়ে নূতন দেশ খুঁজে বেড়াত। তারা চুপ করে' বসে' থাকা ভালবাস্‌ত না। তাদের জন কতক লোক এদেশে এসে পড়াতে বাদ্‌শার কাছে খবর গেল। বাদ্‌শা বল্লেন, 'আপনারা কে?' তারা বল্লে, 'আমরা বাণিজ্য করি।'

বাদশা মন্ত্রীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুঁথি খুলে দেখ ত, বাণিজ্য জিনিষটা কি?' মন্ত্রীরা বল্লে, 'খোদাবন্দ! বাণিজ্য একটা রোগ, হাকিম্ সাহেব সেটার তথ্য জানেন।' হাকিম বল্লেন, 'এটা একটা বায়ু রোগ।' যারা চুপ করে' বসে থাক্‌তে পারে না, তারা বাতে ধর্‌বে বলে টো টো করে বেড়ায়। বাদশা বল্লেন, 'আমাদেরও যখন বাতে ধরেছে তখন একবার তাদের সঙ্গে টো টো করে সেরে যেতে পারে। ডেকে আন তাদের।'

পরপারের বণিক্‌রা বল্লে, 'বাদ্‌শা! খট্টাঙ্গে কিংবা সিংহাসনে অনেক দিন অকর্ম্মা হয়ে বসে থাক্‌লে বাতে ধরে। আমাদের দেশেও রাজা বাদশা অনেক থাকে, তারাও বাতে ধর্‌লে সিংহাসন ছেড়ে দেয়।'

বাদ্‌শা। যদি না ছাড়ে?

বণিক। যুদ্ধ বেধে যায়।

এদেশের রাজা ও বাদশারা পরীক্ষা করে দেখলেন তাদের যুদ্ধটা কি রকম। গোলাগুলি দেখে সকলেই বল্লেন,

'এ যুদ্ধটা আমাদের পছন্দ নয়। কোনো কালেই যুদ্ধ করে আমাদের কারও এমন কষ্ট হয় নি। সুতরাং আপনারা সিংহাসনে বসে একটু বিশ্রাম করুন।'

তারা বল্লে, 'ওটা বাহুল্য। আমরা নামমাত্র সিংহাসনে বস্‌ব, কিন্তু আসলে, টো টো করে বেড়াব। মোট কথা হচ্ছে পরিশ্রম। দেশের শরীরের সর্ব্বাংশে পরিচালনা চাই। সকল দেশ মিলে শেষে একদিন পরিচালিত হবে। এই হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণী।'

বাদ্‌শা। তা'হলেই ত সর্ব্বনাশ। কেবল একটু হাওয়া খেলে হয় না?

তারা। হাওয়াও খাবেন, জলও পাবেন, যা খুসি তাই খেতে পারেন; কিন্তু যেমন পরিশ্রম তেমনি খোরাক। যদি রোগী থেকে যান, তবে রোগীর পথ্য খেতে হবে। পরিশ্রম না করলেই রোগে ধর্‌বে।

বাদশা। অভিনয়টা মন্দ নয়। এটাকে আপনাদের দেশে কি বলে?

তারা। থিয়েটার!

বাদশা। তার মর্ম্মটা কি?

তারা। যে যেমন উপার্জ্জন করে সেটা তার 'স্বত্ব'। বিদ্যাবুদ্ধি, কায়িক পরিশ্রম, সব ক'টাই স্বত্ব-সংস্থাপন করে। কার কতটুকু স্বত্ব, সেটা নিয়ে মতের মিল না হলে' যুদ্ধ ঝগড়া বেধে যেতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের সর্ব্বসম্মত নিয়মগুলো সকলকেই পালন কর্‌তে হবে। চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, বলাৎকার প্রভৃতি হবার যো নেই। ধর্ম্মের দেবতার সম্বন্ধে আমাদের জোর জবরদস্তি নাই। যার যেমন খুসি পূজো পাঠ নেমাজ কর্‌বে। সেগুলোর সার্থকতা তারা লেখাপড়া শিখে বুঝবে।

কথাটা মনঃপূত হওয়াতে সকলেই বল্লে, 'তবে বাণিজ্যের অভিনয়ে লেগে যাওয়া যাক!'

প্রথমে দরকার হল স্বত্ব ঠিক করা। স্বত্ব ঠিক না হলে পয়সা রোজগার হবে না। পয়সা না হলে বাণিজ্য হবে কি ক'রে? তারপর দেশের মধ্যেই একটা রিহার্সেল না দিলে বিদেশে গিয়ে অভিনয় করা নিতান্ত হাস্যাস্পদ হবে, সেটা সকলে বুঝতে পার্‌লে। কাজেই নিতান্ত দরকার হল নূতন দেশগুলোর ভাষা শেখা।

দেশটার সাড়ে তের আনা চাষী ও তাদেরই মজুর, তাই দেখে প্রথমে তাদের স্বত্বাধিকারের আইন হয়ে গেল। নিজের জমি তারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করবে, ইচ্ছা হলে বেচ্‌তে পাবে, খাজনা দিলে কেউ কাড়তে পারবে না।

বাদশাকে যাঁরা ভোগের থাল যুগিয়ে দিতেন তাঁরা ঘটনাক্রমে কেউ ছিলেন রাজবংশ, কেউ মন্ত্রীবংশ, ব্রাহ্মণ বংশ, সদাগরের বংশ ও কেউ কোটালের বংশধর। তাঁদের উপর নির্দ্ধারিত হল রাজস্ব, সেটা পাকা ও চিরস্থায়ী।

বাঁধা বন্দোবস্ত হল টাকার হিসাবে। টাকা দিতে পারলেই খালাস।

সমস্যা দাঁড়াল মেহনত ও টাকার মধ্যে। জমিটা চাপা প'ড়ে গেল দুটোর মাঝখানে। মেহনত কর জমি থেকে টাকা হবে ফসল বিক্রী হলে। কাঁচা মাল মেহনতের গুণে পাকা তৈরি করলে বিক্রী করে টাকা হবে। টাকা থাকলে এ দেশের মাল অন্য দেশে পাঠাতে পারবে, অন্য দেশের মাল এ দেশে আন্‌তে পারবে। ইচ্ছা হয় টাকা জমিয়ে রাখতে পার, সুদে খাটাতে পার। মেহনত ক'রে জঙ্গল কাট, জমির নীচে লোহা, কয়লা, সোনা, রূপা আছে বে'র কর, অন্য দেশ সেগুলো কিনে নেবে। দেশের লোকে বাণিজ্যের সরবরাহ ক'রে দেবে। তাদের হাতে ফেলে দেও ও ঘরে টাকা আন। তাদের বুদ্ধি থাকে তারাও ক'রে নিক্। ক্রমশ বুদ্ধি আর মেহনতের মধ্যে লাগ্‌ল টক্কর।

কত টাকা চাও? পেট ভরে খেয়ে পূর্ব্বেকার মত যতটুকু সুনিদ্রা হয়। আর কোনো সখ নাই?—আছে বৈ কি। মণি-কাঞ্চনের ঢেরি, গাড়ী ঘোড়া, কোঠাবাড়ী, নাম ইজ্জত, সুন্দরী রমণী, এই প্রকার অনেক রকম। যত রমণীয় ও কমনীয় জিনিষ দেখব, সেইগুলো ভোগ ক'রব। স্বত্বটুকু কত? বিঘা কতক জমি। মেহনতটুকু কার? মজুরদের। কত টাকা হলে সখ্ মিটবে? দেশটার দাম কষলে সিকি লোকেরও একদিনের সখ্ মেটে না। তা হলে বাণিজ্যের অভিনয়টা কি? যদি মেহনত করতে

পারে তবে সখ মেটাও ও পেটে খাও। কিম্বা আপোষের মধ্যে বুদ্ধি খরচ করে একজনের ভাগ থেকে, নিজে সংগ্রহ করতে পার, তা হ'লেও টাকা জুটবে। দোকান ফাঁদ বেশী ক'রে, মন-ভুলান মাল আন, খদ্দেরকে ডেকে যত পার দু'পয়সা আদায় কর। সেই টাকা জমিয়ে কল খাড়া কর, টাকার লেনদেনের কারখানা কর। কম মেহনতে অনেক লাভ। টাকা এল কোথা হতে? মেহনত হতে। কলকারখানা দিয়ে যে নূতন টাকা হচ্ছে, সেটা কোথা হতে? মেহনত হতে। জমির চাষ হয় কি ক'রে? মেহনত হতে। বুদ্ধি দিয়ে মেহনত চালিয়ে নেও।

এ দিকে জোর জবরদস্তি ক'রে টাকা করবার দিন চ'লে গিয়েছিল। চুরি ডাকাতি কমে আস্‌ছিল। ধর্ম্মেও কেউ হস্তক্ষেপ কচ্ছিল না। অথচ দিন চলা কষ্ট। শরীরে বল নেই। রোগে চেপে ধরতে লাগ্‌ল আবার। যারা মেহনত করতে একটু পারে তারা মেহনতের দাম বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে—হয় জমিতে রাখ্‌ মেহনতের পুরো দাম দিয়ে, নয় ত বনে চলে' যাই। মেয়েছেলেদের ছেড়ে দিয়ে তারা মার্‌লে চম্পট। মেয়েছেলেরা না-ঘরে না-বাইরে, না-কুত্রাপি অন্নের স্বচ্ছলতা দেখ্‌তে পেলে। পুরুষদের বলতে লাগল, 'আমরাও বনে চলে যাই!' বলা বাহুল্য যে, মেহনতি পুরুষ ও স্ত্রী, সকলেরই বুদ্ধি বিদ্যা ও সখ্‌ ক্রমশ বেড়ে উঠছিল।

ইতিমধ্যে লেখা পড়া শিখে ফেল্লে একদল লোক। তারা আরম্ভ করলে চাকুরী নূতন রাজ-সরকারে। বাদশার সময় চাকুরীর মেহনতানা ছিল কম, কিন্তু মর্য্যাদা বাড়াবার ও সখ মেটাবার উপায় ছিল। ক্রমে স্বত্বাধিকার টাকার উপর দাঁড়িয়ে যাওয়াতে, রাজস্বের টাকা ষোল আনা আদায় করা দরকার হল। তা না হলে, প্রহরী পুলিষ থাকে না, সদ-বিচারের ধর্ম্মাধিকরণ থাকে না, বার বার সেকালের ধর্ম্ম সেও রক্ষা হয় না। এ দেশের ধর্ম্ম কি, আর কর্ম্ম কি, সমাজ কি, আর স্বত্ব কি, সেগুলি বুঝিয়ে-দেবার জন্ত আর একদল লোক খাড়া হয়ে গেলেন। তাঁরা বিচারকদের বুঝাতেন, দেশের লোককে বুঝাতেন, নিজেও বুঝতেন, আইনের সামঞ্জস্য করতেন। যাঁদের জ্ঞান ছিল পাকা, তাঁরা দেশবিদেশের ইতিহাস পড়লেন, সাহিত্য কাব্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রগুলো তন্ন তন্ন ক'রে বিচার করলেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রচার করলেন, ও সাহিত্য দিয়ে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা কর্‌লেন। কেউ বল্লেন—ঈশ্বর নিরাকার, এইটেই সব দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র একত্র ক'রে বেশ বোঝা যায়। কিন্তু আনাড়ি লোকের ভাগই বেশী, তারা নিরাকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ না পেয়ে কেবল ডেকে ডেকে হায়রান হল। পূর্ব্বে তারা সাকারকে ডেকেছিল, তাতে মন্দিরে ধন্না দিলে দুটো ভিক্ষে পেত। ক্রমে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়ে দেখ্‌ল, সাকারও নিরাকার হয়ে পড়েছেন। কেউ বল্লেন—মানুষই ঈশ্বর। সেটা পরখ ক'রে তারা আরম্ভ করলে নমস্কার কর্‌তে, সেলাম ঠুক্‌তে, দরখাস্ত কর্‌তে। তাতেও তাদের মনের মতো টাকা জুটল না। গুরুভক্তি ও কর্ত্তাভক্তির পেছনে তারা সেকালে কিছু খরচ করেছিল, তার চতুর্গুণ খরচ করে' দেখ্‌লে যে, মেহনতই সার, কিন্তু মূল্যটা ভগবান এখনো ঠিক ক'রে দেন নি। নেয় সকলে বেশী, দেবার বেলা কম।

বিদ্যেটার মূল্য বেশী, লাভ কিছুই না। কতকগুলো বিদ্বান বল্লেন, 'তোদের সমাজটাই সর্ব্বনাশের মূল। দলাদলি, গোঁড়ামি, হাঁকামি, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পরব পার্ব্বন, একান্নবর্ত্তী পরিবার, স্ত্রী-পীড়ন, স্বাস্থ্য-রক্ষার অনিয়ম। লেখাপড়া ভাল রকম না শিখ্‌লে, নিজের হক্‌দাবী দুরস্ত ক'রে না নিলে কিছুই ঠিক হবে না। তার পর দেশের জন্ত লড়বি, বিপ্লব একটা না হ'লে তোরা যা চাচ্ছিস তা পাবি না।'

কেউ বল্লে যে, বাণিজ্য ব্যবসাটাই ঠকান। যারা বাণিজ্য করে তারা কেবল ঠকিয়ে দু পয়সা আদায় করে। নূতন রাজ্যশাসনটাই মেকি রকমের। এহেন রাজ্যশাসনতন্ত্র থাক্‌লে দেশের উত্থান অসম্ভব। যাতে উত্থান হয় সেই রকম সাহিত্য তৈরি কর।

জন কতক লোক বিপ্লবের চেষ্টা করল। কিন্তু নিজের মনের ও শরীরের বিপ্লবেই চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। এক জন মহাত্মা এসে বল্লেন যে, তোদের আসলে শক্তি আছে কি না সেটা প্রথমে পরখ করা উচিত। তোরা একবার চরখায় সুতো কেটে দেখ।

বাপ বল্লে মাকে, ‘একবার সুতো কেটে দেখাও।’ মা বল্লে বেটা কে, ব্যাটা বল্লে বৌ-মাকে। বৌ-মা বল্লেন খোকা ও খুকীকে। জমিদার বল্লেন প্রজাকে, প্রজা বল্লেন জমি-শূন্য মজুরকে। মজুরগুলো বল্লে, ‘কলে সুতো কাটা হচ্ছে, আমরা কাট্‌ব কেন? সুতো কেটে মেহনত যে করে তার চেয়ে কি বেয়াকুফ আছে? টাকা দিলে খুব সস্তায় সুতো পাওয়া যাবে।’

টাকা কোথায়?

একদল বল্লে, ‘টাকা কলের মধ্যে। বিজ্ঞান শেখ, টাকা আস্‌বে, কেবল কলটা তৈরি করার ওস্তাদ। বাণিজ্যটা মোটের মাথায় মন্দ নয়, কিন্তু বল ও বুদ্ধি এ দুটো পুরো মাত্রায় সংগ্রহ করতে হবে।’

সকলে ভাব্‌ল কথাটা মন্দ নয়। দিন কতক এই ভাবে চক্ষু বুজে সব সহ্য ক’রে গেলে টাকা জম্‌বে দলপতিদের হাতে, তারা শেষে কল খাড়া ক’রে দেবে নিশ্চয়। তাদের সাহস দিয়ে জনকতক লোক কল খাড়া করল, ‘ব্যাংক’ নামক একটা টাকার কুঠি খুলে বস্‌ল, হিস্যার উপর লাভ ঠিক হল, বাজার দরের উপর হিস্যার ইমারত খাড়া করল, টাকার বাজারের উপর বাজার দর কাকাতুয়ার মতো দুলতে লাগল। ক্রমে সকলে দেখ্‌ল যে, অবস্থা যেমন ছিল প্রায় সেই।

এই সুযোগে যারা কলকারখানা, ব্যবসা, চাকুরি, প্রভৃতির সংস্রবে থেকে অদৃষ্টক্রমে হঠাৎ টাকা কামিয়েছিল, তারা জুটলো গিয়ে জমিদার ও মহাজনদের সঙ্গে। তারা বল্লে, ‘সাহিত্যটাকে জাঁকিয়ে না তুল্লে, দেশটা একেবারে ধসে’ ধসে’ যাবে। সাহিত্য না হ’লে আত্মশক্তি জাগে না। এই সাহিত্য কেবল সহরে প্রচার করলে চল্‌বে না, পল্লীগ্রামের আমূল সংস্কার ক’রে তার মধ্যে চালাতে হবে। তারা পৃথিবীর চল্‌তি যুগের চিন্তার স্রোত দেখে সেই দিকে ভাস্‌বে। যেমন ভাসা, সেই মুহূর্ত্তে একটি বড় জাতি হ’য়ে যাওয়া। মোট কথায়, সাহিত্যেরও বাণিজ্য কর্‌তে হবে। অন্য দেশের সাহিত্য আমদানী হবে এ দেশের সাহিত্য রপ্তানী ক’রে। মনটাই আসল। জ্ঞান অর্জ্জন কর্‌লে মনের গতিক ফিরে যাবে। আত্মচৈতন্য প্রস্তুত হয়ে বিশ্বচৈতন্যে গিয়ে দাঁড়াবে।

সাহিত্যের বাজার জেঁকে উঠ্‌ল। বাদশার আমলে ছিল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাহ-নামা। এ দেশের ছিল দর্শন পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র ও গ্রাম্য-কবিতা। সেগুলো উদ্ধার ক’রে দেখা গেল যে, সে রকমটি কোনো দেশেই নাই। তবে এখন কি রকমটি চাই?

প্রথমে বেরুল ভূগোলবৃত্তান্ত ও ইতিহাস। সাহিত্যিকগণ বল্লেন, ‘এতে কিছু নূতনত্ব পাচ্ছ?’

দেশের লোক বল্লে, ‘ইতিহাসগুলো জীবহিংসার, ভোগের ও বিলাসের। নূতন ত কিছুই দেখা গেল না। কেবল বাণিজ্যই নূতন। ভূগোলবৃত্তান্ত প’ড়ে কেবল দেখা যায় যে, এ দেশের চেয়েও দুর্দ্দের দল অনেক দেশে আছে, যাদের সমাজ এখনো অসভ্য ও বর্ব্বর। তাদের দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় কিন্তু শরীর অচল, বেড়াবার খরচ নাই। নিজেকেই নিজে দেখবার সময় নাই, অপরকে দেখে চৈতন্য বেশী বিস্তার করলে ক্রমে অচৈতন্যের অবস্থা দাঁড়ান সম্ভব।

সাহিত্যিক। ইতিহাসের মধ্যে শাসন-তন্ত্রের ও রাজনীতির ব্যাপারটা লক্ষ্য ক’রে দেখেছেন কি?

দেশের লোক। দেখেছি বাবা, ও সকল এই দেশেই। যখন দেশটাই নির্জ্জীব ও মুক্তি-কাতর, তখন তাদের ঠেঙিয়ে সজীব করা কি সম্ভব? আমরা সেটা বলদগুলোকে দিয়েই দেখেছি। তাদেরও কোনো সখ্ নাই, মেহনত যথাসাধ্য আমরা করিয়ে নিইছি। দেবতা বৃষ্টি না দিলেই সব ভণ্ডুল।

সাহিত্যিক। তবে কি রকম সাহিত্য পছন্দ হবে?

দেশের লোক। বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সব নূতন রসের কথা আপনারা সাহিত্যে পেয়েছেন সেইগুলো প্রকাশ ক’রে বল্লে একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠা যেতে পারে। পুরাণো জিনিষে একেবারেই অরুচি হয়েছে।

সাহিত্যিকগণ বুঝতে পারলেন, এবং সেই সঙ্গে দেশের ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীরগণও দেখ্‌তে পেলেন যে, রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বচৈতন্য আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। নানা দেশের লোক এক জায়গায় জড় হ’লে হাটের গোলমাল খুব ঝাঁকালো হয়ে পড়ে। সেকালের আদর্শ, জন্মভূমির মায়ার

টান, সবই রোগেশোকে সেকালের চৈতন্যের মধ্যে জমাট বেঁধে পাথরের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখন কোনো রকম করে' গাড়ির ধাক্কাতে এদের বিষকাটের মধ্যে এনে গ্রামচৈতন্য থেকে উদ্ধার না ক'রতে পারলে দেশের আর রক্ষা নাই, কারণ দুটো চৈতন্য একসঙ্গে টেঁকা মুস্কিল।

অভিনয়টা যাতে সুশোভন হয়, তার জন্য রাজসরকারে ঘন ঘন দরখাস্ত প'ড়তে লাগ্‌ল। রাজসরকার বল্লেন, 'তোমাদের যে রকম পছন্দ আমরা তাহাতে কোনো বাধা দেব না, তা পূর্ব্বেই বলেছি। তবে অভিনয় করতে করতে অক্কা না পাও, সেজন্য তোমাদের প্রাণপণে রক্ষা করতে হচ্ছে।'

রেলগাড়ীর প্রাদুর্ভাবে লোকগুলো হাওয়া-পরিবর্ত্তন করতে সুরু করলে। দোকানের প্রাদুর্ভাবে অন্নবস্ত্রের রুচি বদলে গেল। চা খেয়ে ও সিগারেট্ ফুঁকে শরীর ও মন তাজা হতে লাগ্‌ল। নানা রকম তেলে ভাজা ও ঘৃতপক্ক জিনিষের গন্ধে জাতিভেদের ব্যবধান খাটো হয়ে গেল। বিচিত্র ঔষধ খেয়ে রোগগুলোর চেহারা ফিরে গেল। সাবান মেখে রংটা ধবলের দিকে হেলে পড়ল। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, নারীতত্ত্ব, বংশতত্ত্ব, প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রকাশ হতে লাগ্‌ল খবরের কাগজ ও পত্রিকায়। শারীরতত্ত্ব বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লেন ডাক্তারের দল। সব তত্ত্বগুলোর বিস্তারিত সমালোচনা হতে লাগল একটা নূতন ধরণের সাহিত্যের মধ্যে। তার নাম হল উপন্যাস।

এই তোফা চিজ্ দেখে দেশের লোক খুসি হয়ে বল্লে, 'এটাতে আমাদের সমাজের অরুচিটা দমন হয়ে যাচ্ছে। সকলে মিলে একবার প্রেমের কথা কহ। প্রেমেই মুক্তি এটা পূর্ব্বে শুনেছিলেম, কিন্তু এ রকম রুচিকর মুক্তির আস্বাদন আগে পাই নি।'

পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদেরও রুচি বদলান স্বাভাবিক। অনেক দিন পরে তারা একটু ঘুমোবার ও হাওয়া খাবার চেষ্টা করতে লাগল। সেকালের বজ্জাতগুলোর সেটুকু পছন্দ না হওয়াতে তারা আপত্তি করল যে, এটা শাস্ত্রসম্মত নয়। তখন নবীন দল বল্লে, 'এটা ভারি অন্যায়, আমরা বরাবর যে মুক্তির জন্য চেষ্টা করছি, সেটা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই জন্য। তাদের পথের মাঝে বেঁধে রাখা ঘোর বেয়াদবি! রুচিবিরুদ্ধ কাজ! এতে আপনাদের পুরাণো শাস্ত্র চলবে না। বিশ্বাস না হয়, দশটা দেশের লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, দশটা সাহিত্য আলোচনা করুন।

আর চালাকি চল্ল না। দশটা দেশের লোক এখন এদেশের হাটে। তারা একবাক্যে বল্লে, 'হে পূর্ব্বপুরুষের নমুনা! বাণিজ্যের অভিনয়টা কেবল মাল কেনা-বেচার অভিনয় নয়। এক এক দেশের লোক অন্যদেশের যে টুকু রস আছে, গ্রহণ করবে নির্ঘাত। তাকেই বলে বিশ্ব প্রেম। তখন আমাদের দেশে তোমরা জুটবে, ও তোমাদের দেশে জুটে যাব আমরা। কোন্ দেশ কার, তার কোনো চিহ্ন থাকবে না। কেবল চেষ্টা কর রসগ্রহণ করতে। তাতে যদি দশ জন পরলোকে যায় দ্রুতগতিতে, সেটাও লাভ, কেননা তারা বেরসিক। বুদ্ধি খরচ করে, বিদ্যা ও বিজ্ঞানের বলে মধ্যে মধ্যে একে, কিংবা এদেশকে, মধ্যে মধ্যে ওকে কিংবা ওদেশকে যদি খাটিয়ে নিতে পার, তবে সব দেশই টিঁকে যাবে কিছু কিছু, পরে কি হবে, সেটা জগদীশ্বরের হাত। সেটার ভাবনা যদি বেশী হয়ে থাকে তবে কেঁচে আবার ইতিহাস পড়। কোনো যুগেই কোনো জাতি চিরস্থায়ী হয় নি। তোমরা যা মনে করছ, সে জাতিও যে তোমরা, তার কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই।

হাটের মাঝে ভয়ানক গোলমাল দেখে বুড়োরা সরে পড়ল। নবীন দল ঈষৎ হেলে দুলে গ্রীনরুমে নবীনাদের সঙ্গে চা খেতে বসে গেল। একজন নবীন দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বল্ল, 'বড়ই দুঃখের বিষয়।'

নবীনা। কেন বল ত ভাই?

নবীন। সংসার অলীক, এটা জেনে শুনে বুড়োগুলোর মাথায় সেটা 'লীক' হয়ে যায়।

নবীনা। বেরসিক লোকই কুড়ের বাথান।

স্বপ্ন-ব্যথা

শ্রীঅনিন্দিতা দেবী

আমি মাষ্টার। বিশ বছর হইল, গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিতেছি। একটি বাক্যের দ্বাদশ বার ব্যাখ্যা করিয়াও যে কিছুতে আমি হাঁপাইয়া পড়ি না তাহা দেখিয়া নিজেই আমি সময় সময় আশ্চর্য্য হইয়া যাই। এই বিংশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি যে বিশ বছর মাষ্টারী করিলে ব্যাসকাশীতে মৃত্যুফলের আস্বাদ মানবজন্মেই অনুভব করিতে পারা যায়। তবু আমি মাষ্টারী করিতে ভালোবাসি, কেননা তেতাল্লিশ বছরেরর এই আইবুড় মাষ্টারটিকে ছেলেবুড়ো সবাই যেমন করিয়া ভালোবাসে, আমি একশ টাকা তন্‌খার মাষ্টার না হইয়া হাজার টাকা মাহিনার একটা ডেপুটী হইলে তেমন ভালো তাহারা বাসিত না। এই ভালোবাসাই যে আমার সম্বল।

এমন একদিন ছিল যখন পুরুষকারের বলে যুগপৎ লক্ষ্মী-সরস্বতীকে অমরাবতী হইতে ছিনাইয়া আনিয়া আমার গৃহে তাঁহাদের বসবাস কায়েম করিয়া দিব, এ স্বপ্ন দেখিতাম। অথচ বি, এ, পাশের মাত্র ছাপ্, আর মাসিক একশ'টি রৌপ্যমুদ্রা বিধাতাপুরুষ আমার জন্ত মাপিয়া রাখিয়াছিলেন।

আলালের ঘরের দুলাল বড়ঠাকুরে বাপের বড়ছেলে তখন আমি সবে বি, এ পাশ করিয়া সাগরপারে যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি, দেশহিতৈষণার হাজার স্কন্ধে মাথা তখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। বাবা বলিলেন, বিবাহ করিয়া বিলাত যাইতে। প্রস্তাব শুনিয়া মনটা নাক সিঁট্‌কাইয়া উঠিল; কর্ম্মজীবন আরম্ভ না হইতেই এ সর্ব্বনাশী বন্ধন! —বাবাকে চিঠি লিখিলাম, একটি ঘোমটা-ঢাকা বালিকা-বধূকে বিশেষরূপ বহন করিতে আমি এখনও রাজী নই। একথা শুনিয়া মা'কে নাকি তিনি বলিয়াছিলেন, আমি ডেঁপোমীতে বিশেষ পরিপক হইয়া উঠিয়াছি; এবং প্রকাশ্যে আমায় লিখিলেন, "বিবাহ না করিলে তোমায় বিলাত পাঠাইব না।"

আদুরে ছেলে বলিয়া আমিও বদ্‌মেজাজী ছিলাম, উত্তর দিলাম, "বিলাত পড়তে না পাঠালে এ দেশের অকেজো মামুলী পড়াও আমার খতম। আমি আর পড়ব না।"

বাবা রাগ করিয়া লিখিলেন, "যা ইচ্ছা তাই কর, কিন্তু পরে পস্তাবে, বলে রাখছি।"

আমি উত্তরই দিলাম না, ভাবিলাম, বাবাকে বড়ই জব্দ করিয়াছি। তারপর পড়াশুনা ছাড়িয়া কত কি সমাজ-সংস্কারের কাজে লাগিলাম তাহার তালিকা দিব না। মাঝে মাঝে জল্পনা করিতাম জাহাজের খালাসী হইয়া আমেরিকা যাইয়া একটা বিদ্যাদিগ্‌গজ হওয়া কতদূর সম্ভব!

এমন সময় সাহিত্য-পরিষদের কি একটা ক—ম উপলক্ষে পাটনায় আমার বাল্যবন্ধু ও সাহিত্যিক সুরেশদের বাড়ীতে আমি নমিতাকে দেখি। কলিকাতায় একটা বিখ্যাত সংবাদ-পত্রের সহকারী সম্পাদকরূপে আমি তখন কাজ করিতে ছিলাম। দেশের কাজ তখনও পুরা দমে চলিতেছে এবং বিবাহবিমুখতা পূর্ব্ববৎ সুতীব্র।

সুরেশ এম্-এ পাশ করিয়া সে বছর মাত্র পাটনা কলেজে অধ্যাপক হইয়াছে। আমাকে লইয়া নীচের হল হইতে তাহার পড়িবার ঘরে দ্বিতলে যাইতে যাইতে সুরেশ বলিল, "তুমি আসবে বলে বাড়ীতে আমাদের তো একটা হুলুস্থূল পড়ে গিয়েছে হে!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম. "কেন ?"

সুরেশ বলিল, "বাঃ, কেন ? যে স্ত্রী-বিদ্বেষী দেশের কাজের জন্ত বন্ধনগ্রস্ত হবে না বলে এত বড় একটা ভবিষ্যৎ মাটী করলে, সে কি একটা কম লোক ?"

গলার আওয়াজে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না সুরেশ

বিদ্রূপ করিতেছে কি না ; আমি নিঃশব্দে সিঁড়ি উঠিতে লাগিলাম। সুরেশ ফের বলিল, 'মা আর নমিতা,—আমার বোন—তোমায় দেখার জন্য একেবারে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন।' —বলিতে বলিতেই সিঁড়ি ছাড়াইয়া আমরা দোতলার বারান্দায় পা দিলাম। বারান্দা পার হইয়া সুরেশের পড়িবার ঘর।

'এই যে মা, আমাদের পরিতোষ এসে হাজির।' বলিয়া সুরেশ তাহার মা'র সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল। তিনি বারান্দার এক পাশে কুটনা কুটিতেছিলেন। 'এসো বাবা, এসো।' বলিয়া তিনি বটিটা কাৎ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইতেই তিনি ফের কহিলেন, 'রাত্তে তো কিছুই বোধ হয় খাওয়া হয় নি বাছা, ঘুমও বোধ হয় হয় নি, মুখ চোক ব'সে গিয়েছে। যা' সুরেশ, ওকে মুখ হাত পা ধুতে দেগে যা! আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সুরেশ দুষ্টামি করিয়া বলিয়া উঠিল, 'এমন নামজাদা 'স্বদেশী' লোকটা যে চা খাবে এ তুমি কি করে বল্‌তে পারলে মা?'

সুরেশের মা তাহার রকম দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইতেই আমি তর্জ্জনী দিয়া সুরেশের কাঁধে একটা ঘা দিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'নে, তোর আর বখামী করতে হবে না। না মা, আমি চা খাই এবং বেশ রকমই খাই।' এবং সুরেশকে আগু হইবার জন্য আস্তে ধাক্কা দিলাম। স্থানটা তাড়াতাড়ি ত্যাগ করিবার আর একটা বিশেষ কারণ ছিল। বারান্দার আর এক পাশে একটি মেয়ে ফুটন্ত জল সমেত ষ্টোভের কাছে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বসিয়াছিল। আমার হঠাৎ লক্ষ্য পড়িয়াছিল যে, আমাকে দেখিয়া তাহার ঘাড় নীচু হইতে হইতে প্রায় হাঁটুর সঙ্গে যাইয়া মিলিয়াছে। অনুমানে বুঝিলাম এই নমিতা। শুনিয়াছিলাম নমিতা বেথুনে থার্ড ইয়ারে পড়ে।

তাহার এ অপরিসীম লজ্জা দেখিয়া আমার একটু হাসি পাইল। মনে মনে ভাবিলাম, বি-এ পড়িলে কি হইবে,—বাঙালীর মেয়ে তো,—'অভ্যাস যায় না ম'লে।'

এক ঝলকে যে-টুকু দেখিয়াছিলাম তাহাতে মাত্র নজর পড়িয়াছিল জ্যোৎস্নার মতো শুভ্র তার গায়ের রং, সারা পিঠ ছাওয়া অকুঞ্চিত এক রাশ চুল, আর চওড়া লাল পেড়ে শাড়ীর ঘেরা-টোপের ভিতর হইতে উঁকি মারিতেছে নিখুঁত সুন্দর দু'খানি পা। মুখখানি নীচু হইয়া থাকায় দেখিতে পাই নাই, তবে তাহা দেখিবার জন্য স্বাভাবিক একটু ঔৎসুক্য হইলেও নারী-আকর্ষণ-বীতরাগ আমার ব্যগ্রতা মোটেই হয় নাই ইহা হলফ করিয়া বলিতে পারি।

সুরেশের সঙ্গে বসিয়া কথা কহিতেছি—এমন সময় নমিতা চা লইয়া আসিল। চকিতে একবার আমার মুখের উপর দৃষ্টি তুলিয়া সে নিঃশব্দে চায়ের বাটী রাখিয়া প্রস্থান করিল। নবাগতকে ভদ্রতানুযায়ী প্রতি-নমস্কার-টুকুও সে করিল না বলিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম—বি-এ, পড়া মেয়ের এ লজ্জা, না সমীহাধিক্য!

নমিতা সুন্দরী কি না সে বিচার আমি করিব না। তবে এ কথা ঠিক, প্রথম দৃষ্টিতে তাহার চমৎকার রং ছাড়া আমার চোখে আর কিছু ধরে নাই। নয়নে তাহার খঞ্জন বা হরিণ কোনটারই আভাস আমি পাই নাই ; ভ্রূরেখা অস্পষ্ট,—মদনশরাসনের মতো সুবঙ্কিম মোটেই নয় ; নাসিকা টিকলো তো নয়ই বরং তাতে নেপালী সুন্দরীর আভাস আছে ; অধরোষ্ঠ কুৎসিত না হলেও সুপুষ্ট, কোনো কবিবর তাহাকে পাকা ডালিম-দানার রংএ-ছোপান উর্ব্বশী মেনকার ঠোঁট বলিয়া ভ্রম করিতেন না ইহা সুনিশ্চিত।

পরে ভাবিয়া দেখিয়াছি নমিতা আর আমার মানসী চিরপ্রিয়ার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। কর্ম্মসঙ্গিনী রূপে আমার মানসী-বধূকে আমি কল্পনা করিয়াছিলাম বিদ্যুন্নিভা চঞ্চলা, হাস্যমুখরা, সপ্রতিভা, বাক্‌চতুরা, কর্ম্মকুশলা, আদর্শবাদিনী, সুগায়িকা, সুদর্শনা, সুশিক্ষিতা। শেষোক্ত গুণটি ছাড়া নমিতার আর কোনোটা ছিল না, অথচ তাহাকে ভালোবাসিলাম।

কেমন করিয়া ভালোবাসিলাম কবে বাসিলাম তাহা স্মৃতিপটে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাল্যকালে ঐ যে রূপকথায় নদীতটচারী হরিণের গল্প পড়িয়াছিলাম,—একচক্ষু হরিণ সতর্ক আঁখি তাহার তীরের পানে সজাগ রাখিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু মরণ যখন নিকটে আসিল, আসিল

তখন অভাবনীয় পথে,—নদীগামী ব্যাধের শরশরে সে প্রাণ হারাইল. এক চক্ষু বেচারার জলপথ পানেও যে ছ' একবার সতর্ক দৃষ্টি পাতা উচিত তা' মনে জাগে নাই। আমার হইল সেই দশা। যে প্রকার নারীর আকর্ষণ হইতে আমি বিপদমুক্ত বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পরাজয় আসিল আমার সেই দিক হইতেই।

এক মনস্তত্ত্ববিৎ বলিয়াছেন ভালোবাসিবার জন্য মনের মিল বা মতের মিল কোনোটারই দরকার হয় না। একটি চাহনি, গলার আওয়াজ, চলন ভঙ্গিমা, এমন কি আঁচল খানি ঘুরাইয়া গায়ে দিবার ধরণ টুকুকে উপলক্ষ্য করিয়া পর্য্যন্ত না কি মৌন আকর্ষণের সৃষ্টি হইতে পারে। আমার চিত্তবিকার কখন ঘটিয়াছিল জানি না. তবে, একদিন মনে পড়ে দুপুর বেলা সুরেশের ঘর হইতে নীচে নামিতে 'হলে' দেখি নমিতা ঘুমাইয়া আছে। আবক্ষ তাহার একটা পাতলা চাদর দিয়া ঢাকা, মুখ খানা দেয়ালের দিকে ফেরান, দেখা যাইতেছিল না। ভাঁজ করা বাম বাহুখানির উপর স্রস্তকেশ-নিদ্রাশিথিল মাথাটি এলাইয়া আছে। আর সেই ঘন কৃষ্ণ চুলের উপর ঈষৎ-মুদ্রিত চাপা কলির মত আঙুলগুলি দেখাইতেছিল যেন মেঘের বুকে বিজলীশিখার মতো! মুহূর্ত্তে আমার মনে পড়িল ঐ আঙুলের প্রত্যেকটি সহস্রবার চুম্বন করিবার জন্যই মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে। মনে হইবামাত্রই ব্রহ্মচারীর অন্তর্নিহিত পবিত্রতা ভ্রূকুটি করিল; আমি কল্পনার রাশ টানিয়া ধরিলাম।

তারপর প্রথম সন্দর্শনের পর কত তুচ্ছ খুঁটিনাটি ঘটনা! নমিতার প্রত্যেকটি ব্যবহারে মনে হইত আমার প্রতি অনুরাগ মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে। ভাবিতাম, কেনই বা হইবে না—আমি যদি তাহাকে এত ভালোবাসিতে পারিতাম, সেও আমাকে ভালো না বাসিয়া পারে কিরূপে? অথচ, 'হাঁ' 'না' ইত্যাদি দুই একটা সম্মতি-অসম্মতিসূচক কথা ছাড়া সে আমার সঙ্গে কোনো কথা বলিত না। আমায় যেন এড়াইয়াই চলিত! আমি ভাবিতাম—লজ্জা। চুরি করিয়া তাহাকে একবার দেখিতে চোখে চোখে মিলিলে সে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া চোখ ফিরাইয়া লইত; আমি ভাবিতাম, এ অনাসক্ত আপাতদৃষ্টির তলে প্রীতিসরস মনখানি তার কি আমারই মতো গোপন লজ্জায় রাঙিয়া উঠিতেছে না?

মনে পড়ে এক দিন দুপুর বেলা খাইয়া আসিয়া খবরের কাগজে পড়িতেছিলাম, বাংলার কোন এক গ্রামে একটি মেয়ে একাকিনী ছুরি হাতে আততায়ীর হস্ত হইতে রুগ্ন স্বামীকে রক্ষা করিয়াছিল। এমন সময় নমিতা আমার পাণ দিয়া গেল। আমি ঐ ব্যাপারটা উপলক্ষ্য করিয়া কি একটু রসিকতা করিয়া একটু চুণ চাহিলাম। সে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। আমি উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম, সে চুণ লইয়া ফের নিশ্চয় ফিরিবে। কিন্তু কক্ষান্তর হইতে ছোট ভাই অনিমেষকে যখন ডাকিয়া আমায় সে চুণ দিয়া আসিতে বলিল, আমি স্পষ্ট বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলাম না, নমিতা আমার সহিত বাক্যালাপে হয় তো ইচ্ছুক নহে। চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইবার ট্র্যাজেডি জীবনে এমন একবার দুইবার তো নহে বহুবারই হয়। আত্ম অভিমান কি করিয়া বিশ্বাস করিতে দিবে আমি যাহার নিশ্বাস পড়িবার শব্দটুকু শুনিবার জন্য বা উড়ন্ত আঁচলের প্রান্তটুকু দেখিবার জন্য অথবা কেশবেশের মৃদুগন্ধ পাইবার জন্য সর্ব্বদা ক্ষুধিতচিত্ত হইয়া থাকি, সে আমাকে তার বাড়ীর ছট্টু সিং চাকরের চাইতে কিছুমাত্র অন্য চক্ষে দেখে না!

মনে পড়িতেছে, একদিন স্নানান্তে ধুতি কোথায় শুকাইতে দিব ইতস্তত করিতেছি দেখিয়া নমিতা নিঃশব্দে আসিয়া কাপড়খানার জন্য হাত বাড়াইল। কম্পিত হস্তে তাহা তাহার হাতে দিতে তাহার আঙুলে আমার তর্জ্জনীটা ঈষৎ ছুঁইয়া গেল। সেই ছোঁয়ায় যেন আমি মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম; নখের ডগা হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত যেন কি এক পুলকে শিহরিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম নমিতার সুগৌর মুখও একটু রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য। সে ধীর পদে চলিয়া গেল। এমনি তুচ্ছ ঘটনা আমাকে দিনের পর দিন পাগল করিয়া তুলিতেছিল।

সেবার কলিকাতা ফিরিয়া পরাস্ত মানিলাম; ভাবিলাম বাধা যখন পড়িয়াছি তখন তা অবোধ শিশুর মতো স্বীকার করিয়া লওয়াই ভালো। কিন্তু অর্থহীন সঙ্গতিহীন

আমি— কারণ বাবার এ বিবাহে কিছুতেই মত হইবে না আমি জানিতাম—কি করিয়া যে তাহাকে পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিব তাহা ঠাহর করিতে পারিলাম না। কত ব্যারিষ্টার সিভিলিয়ান হয় তো নমিতার পাণিপ্রার্থী হইয়া আছে; আমার বামন হইয়া এ চাঁদে হাত দিবার দুরাশা বলিয়াই যে মনে না হইতেছিল তা নয়। কিন্তু তবু তো আশা ছাড়িতে পারি নাই!—লোকে আশাকে নইলে কুহকিনী বলিবে কেন? মনে হইল, হইলামই বা আমি অযোগ্য—তবু সে যদি আমায় একটু প্রীতির চক্ষে দেখিয়াই থাকে, যদি সে আমাকে ছাড়া অন্যকে বিবাহ করিতে রাজী না হয়, আমি তাহাকে এত ভালোবাসি, কেহ কি তাহাকে এত ভালোবাসিতে পারিবে কখনো—এ কি সে বুঝিবে না? যদি—যদি—সহস্র 'যদি' আমার মনটাকে পাগল করিয়া তুলিল। অস্থির চিত্ত হইয়া একদিন স্থির করিলাম সুরেশকে স্পষ্ট করিয়া এ বিষয়ে লিখিব। ভবিষ্যৎ জীবনের একটা প্ল্যান্‌ও মাথায় চট্‌ করিয়া তৈরী করিয়া লইলাম, এবং সেই স্কীমের কঙ্কালের' ওপর মনে মনে রক্ত মাংস সংযোজনা করিতে করিতে সেদিন ভবানীপুরে আমার এক খুড়তুত বোনের বাড়ীতে বেড়াইতে গেলাম। ঘরে বসিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তা' ছাড়া আর একটু কারণও যে না ছিল তাহা নহে। সে বোন্‌টি বেথুনে পড়িতেছিল। আমার মনে হইল সে নমিতার সহাধ্যায়িনী,—সেখানে গেলে তাহার সম্বন্ধে দু' একটা কথা হয় তো শুনিতে পাইব!

তাহাদের বাড়ী যাইয়া শুনিলাম, ভগ্নী প্রতিমা বোট্যানিকাল গার্ডেনে গিয়াছেন। সেদিন রবিবার, আমারও কাজ হইতে ছুটি ছিল, ভাবিলাম এতদূর যখন আসিয়াছি ওদের সঙ্গে দেখা না করিয়া যাইব না। প্রতিমার পড়ার ঘরে বসিয়া এটা সেটা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছি এমন সময় দৃষ্টি পড়িল ব্লটিং প্যাডের উপরে একখানা খোলা চিঠি পড়িয়া আছে, চিঠিখানা পড়িবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু অলস কৌতূহলে নীচের নামটার পানে চাহিতেই চমকিয়া উঠিলাম। "তোমার নমিতা।" ত্রস্তে চিঠিটা উল্টাইয়া দেখিলাম পাটনারই চিঠি বটে। পরের চিঠি পড়া সম্বন্ধে ঔচিত্যবিচার তখন আমার ছিল না। চিঠিখানা পড়িবার পর আর একটা অপরাধও করিয়া বসিলাম—চুরি করিয়া ভগ্নীর সঙ্গে দেখা না করিয়াই সেদিন ফিরিলাম।

চিঠি খানা এইরূপ :—

পাটনা
—মে

প্রতিমা!

তোমার চিঠি অনেক দিন পেয়েছি কিন্তু আলস্যের দৌরাত্ম্যে জবাব দেওয়া হয়ে ওঠে নি, তুমি সে জন্যে খুব রেগো, কিন্তু চিঠি বন্ধ করে এর শোধ দিও না। এখানে যা' বিশ্রী গরম পড়েছে তাতে আলস্য জিনিষটার এমন অখণ্ড প্রতাপ না হওয়াটাই আশ্চর্য্য ছিল। কলিকাতায় তোমরা নিশ্চয় এখান থেকে ঢের আরামে আছ।

দিন পনের' হোলো ইংল্যাণ্ড থেকে তার এসেছে, আমার হবু "তিনি" Imperial service পেয়েছেন। কাল আমিও এক চিঠি পেয়েছি, Imperial service পেলেও "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়' —অতএব তিনি তা'তে ইস্তাফা দিয়ে স্বাধীন ভাবে co-operative agricultural firm খুল্‌তে চা'ন—এবং আমার অভিমত জান্‌তে চেয়েছেন। আমি এ সংকল্পে আপত্তি না করলেও হিতোপদেশের বিদ্যাটা একটু ঝেড়ে দেবার লোভ ছাড়তে পারলুম না—'য ধ্রুবানি পরিত্যজ্য' ইত্যাদি—আরো বিশেষ করে লিখে দিলুম যে, আদর্শবাদ খুব ভালো জিনিষ বটে কিন্তু সংসারে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যে বস্তুটির সঙ্গে তার সহজ তুলনা হতে পারে সে হচ্ছে কর্পূর, কিন্তু বাজার খরচের টাকার দাবীটা হচ্ছে চিরন্তন। আমার এ চিঠি পেয়ে আদর্শবাদী পণ্ডিতপ্রবর হয় তো আমাকে নিছক একটা ঘোর বস্তুতান্ত্রিক বলে ঠাওরাবেন, এবং ফেরত মেল্‌-এ হয় তো "a fine product of materialism" বলে আমায় ব্যঙ্গোক্তি সইতে হবে।

কিন্তু জানো কি ভাই—একটু রাশ টেনে না রাখলে এ সব স্বপ্নবিলাসীদের নিয়ে ঘর করা চলে না।... আর ঘর যখন আমায় বাঁধতেই হবে।...

ভালো কথা, আর একটি স্বপ্নবিলাসীর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার ইতিমধ্যে হয়েছিল। তিনি দাদার সহাধ্যায়ী বন্ধু—নামটা—থাক্, তোমায় বলে লাভ কি, চিন্‌বে না তো নিশ্চয়ই। তিনি নাকি নারী-বিদ্বেষী কর্ম্মবীর হবার কসরৎ কচ্ছেন। কিন্তু আমি হলফ্ করে বল্‌তে পারি কর্ম্মবীর তিনি কক্ষণো হবেন না, বীর হতে হলে যে রকম শক্তি সম্পন্ন স্বভাবের হতে হয় তা' তাঁর মোটেই নয়। দ্বিতীয়ত তাঁর নারী-বিদ্বেষের স্বরূপ দেখে আমার করুণাই উদ্রিক্ত হয়েছে। সত্যি ভাই, জানো, যে পুরুষ যত বড় গলা করে নারী-বিমুখতার বড়াই করে তাদের বেশীর ভাগই জান্‌বে নারীর আকর্ষণের প্রতি তত বেশী উন্মুখ। তারা যে নারীসাহচর্য্য পছন্দ করে না তার মানে হচ্ছে যে, তারা উপযুক্ত নারীর সঙ্গলাভ করবার সুযোগ পায় না। যে পুরুষের যত অদম্য প্রকৃতি তার উপযুক্ত সঙ্গিনী লাভের আকাঙ্ক্ষাও তত তীব্র; শুধু যোগ্য পরশ রতনের ছোঁয়া পাবার সুযোগ পায় না বলেই পুরুষত্বের অহঙ্কার এই আকাঙ্ক্ষাটাকে বিদ্বেষের খোলসে ঢেকে রাখে। আমাদের engagement-এর পূর্ব্বের অমর বাবুর অবস্থা আর এখনকার অবস্থাটা একবার তুলনা করে দেখ তো। আমায় অহঙ্কারী বলে হয় তো তুমি বিদ্রূপ করবে, হয় তো আরো বল্‌বে লোকচরিত্র সম্বন্ধে আমি নিরতিশয় জ্ঞানী বলে নিজেকে মনে করি, কিন্তু—থাক্। অমরের সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে কতকটা কথা কইবার অধিকার থাকলেও এ বেচারা ভদ্রলোকের সম্বন্ধে অনাবশ্যক আলোচনা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। যাই হোক্, এই ভদ্রলোকের মতো ভাবপ্রবণের দলের আত্যন্তিক ব্যথাকাতরত্ব অনেক অনর্থক দুঃখের সৃষ্টি করে, ভগবান করুন সে দুঃখকে বইবার শক্তি এদের হোক।

তুমি আমার বিশ্বপ্রেম দেখে টিপ্পনি কাটবার জন্য হয় তো অস্ত্র শানাচ্ছ,—তা শানাও। এই ধারটুকু থাকে বলেই তোমার পত্র পাঠ্য হয়, নইলে প্রতিমাভর্ত্তা-সংবাদ বহুলতায় তোমার চিঠি পড়্‌তে পড়্‌তে কারুর ঝিমুনি ধরলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না; ঢের লম্বা চিঠি হয়ে গেল, আজ ইতি।

তোমার নমিতা।

পত্র পড়িয়া নিজের মনে মনে বলিলাম যে, ইহাকেই বলে বেকুবের স্বর্গে বিভ্রম; এবং ধপ্ করিয়া বাস্তব জগতে পড়িয়া ঠাওরাইলাম সত্যই আমার কর্ম্মবীর হওয়া হইবে না; আর নারী-বিদ্বেষ তো ইতিপূর্ব্বেই বিদায় লইয়াছে। অতএব নূতন করিয়া আবার একটা আরম্ভের পত্তন করা যাক। কয়েক দিন পরে একটা মাষ্টারী জুটিল; সংবাদ পত্রের কাজে ইস্তাফা দিলাম—কারণ বুঝিয়াছিলাম, আমার মতো মেরুদণ্ডহীন নিকর্ম্মা লোকের মাষ্টারী ছাড়া আর কিছু পোষাইবে না। নমিতার কথায় 'উপযুক্ত সঙ্গিনী লাভ' আমার ঘটিয়া ওঠে নাই—সে জন্য অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিব কি অভিসম্পাত করিব বুঝি না, কেন-না মনোমন্দির উজল করিয়া নমিতার যুগ্ম আঁখির দেউটি এখনও সমান জ্বলিতেছে।

মদন ভস্মের পর

শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

যুবা কয়েকটির সান্ধ্য আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য বিষয়—বাঙালী ছাত্র-জীবনের ধারা। পরিহাস-রসিক-বক্তা সুরেশ তথ্যগুলিকে বেশ রসাল করিয়া তুলিয়াছে। এ আসরে সে একাধারে ভাঁড় ও ভাবুক দুইই।

সুরেশ বলিয়া যাইতেছিল, 'তোমরা যাই বল, প্রেমে পড়ার ইচ্ছাটা বাঙালী ছেলেদের একটা সাধারণ বিশেষত্ব হলেও তার রূপটা দিন দিন বদলে যাচ্ছে। সাহিত্যের সাহায্যে এটা বেশ দেখা চলে। আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে মোটামুটি দুটো ভাগ করা যায়। প্রথম হচ্ছে 'যমুনাপুলিনের ভিখারিণী' "মায়াপুরী"র যুগ! আমরা নিজেরা এই আবহাওয়ায় লালিত। একবার পাঁচ বছর আগেকার ছাত্রজীবনটার কথা ভাব ত! সেই বর্ষাকাল, সঙ্গীত-সঙ্ঘের হার্মোনিয়মের রঙীন নেশায় সন্ধ্যা কাটিয়ে রাতের পর রাত তার কাব্য কাটা, ব্যথিত হৃদয় নিয়ে একটি নিমিষের চাওয়ার ধ্যান—এ সব ত নিশ্চয়ই ভোল নি; আর এও নিশ্চয়ই ভোল নি, কি করে এক একদিন অমৃতবাজারের Society wedding-এর খবরে এক একটি ব্যথানাট্যের যবনিকা পড়ত! আজকালকার বাঙালী ছেলেদের ভিতর কিন্তু এ যুগের শেষ হয়ে 'দেবদাস' 'শ্রীকান্ত'র যুগ আরম্ভ হয়েছে। এখনকার প্রেমদেবতা কোঁচান চাদর এবং ঢিলে পাঞ্জাবী ছেড়ে খাটো পাঞ্জাবী-শার্টের উপর আশ্রয় নিয়েছে। হোটেল মেসে আজকাল ভগ্নহৃদয় মহারথীরা দীর্ঘশ্বাসত্যাগ ছেড়ে 'মৃন্ময় দেহের পাত্রে তপ্ততিক্ত প্রাণ' মরিয়া হয়ে পান করছে।

আগেকার যুগটা অবশ্য একেবারে মরে নি, ইতিহাসে কোন যুগই মরে না—তাই মাঝে মাঝে এ-মেসে সে-মেসে এখনও তার অখণ্ড প্রভাব দেখা যায়। অন্ততঃ আমার মেসে আমার ঘরে একটি ছেলে একটি রীতিমত সে যুগের জীব, তার কোন সন্দেহ নেই। আজ বছর খানেক তার ছাত্রজীবনের আশা নৈরাশ্যের প্রহসন আমি দেখছি।

ছেলেটিকে তোমরা দেখেছ। কিন্তু সে যে কি ভাবে জীবন যাপন করে তা জানলে তোমরা ঘরটিকে প্রেমকুঞ্জ ছাড়া অন্য কোন নাম দিতেই চাইবে না। প্রথমটা ত ল পরীক্ষার গোলমালে আমি নিজেই বুঝি নি যে, মাংস মেদবহুল দীর্ঘস্থূলবপু পাঞ্জাবী চেহারা নবজীবনের ভিতরটা এত শাঁসাল; কেবল দেখতাম ঘৃতদুগ্ধপুষ্ট দেহটি তার একটি খোলসবিশেষ অর্থাৎ তার ভিতরকার লোকটির স্বভাব চরিত্র, এমন কি কণ্ঠস্বর পর্যন্ত, আশ্চর্য্য রকম অদ্ভুত ভাবে অধিকার করে আছে। যেন মনে হয় কে একটা মস্তবড় পিপের ভিতর একটি মাত্র সুপুরি প্যাক করে রেখেছে। সে যে একটি রীতিমত অবস্থাপন্ন জমিদার-নন্দন তাও তার মনি-অর্ডারের পরিমাণ দেখে বুঝতে পারছিলাম।

কিন্তু নবজীবন চৌধুরীর অন্দরমহলের খবর পাওয়া গেল আমাদের ঘরের তৃতীয় লোকটির—অর্থাৎ সেই গলায় মাফলার-পরা মুন্সেফ-নন্দন শ্রীচরণের কৃপায়। শনিবার রবিবার সে খুব সাজগোজ করে একখানা বই নিয়ে কোথায় যেন যেত আর জিজ্ঞাসা করলে তরল কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব জমাট করে সংক্ষেপে বলত—ভবানীপুর। নবজীবনের সঙ্গে তার খুব মাখামাখি। রবিবার রাত্রে সে ফিরে এলেই নবজীবন তার পাশে গিয়েই ব্যাকুল ভাবে নানা প্রশ্ন করত। শীঘ্রই জানলাম, ভবানীপুর মানে দিদির শ্বশুরবাড়ী এবং তার মানে জনৈকা ডাইওসিশানের ছাত্রী—রেণু। শ্রীচরণ মাঝে মাঝে আমার কাছে কার পড়বার জন্যে বই চাইত তার মানেটাও জানা গেল। কিন্তু এ নাটকে নবজীবন দর্শক, কি অভিনেতা, তা তার ভাবগতিক থেকে ধরাই মুস্কিল।

ক্রমে দেখলাম, শ্রীচরণ একটি সত্যকারের রোমান্সের 'হিরো' হয়ে পড়বার চেষ্টা করছে। কেন না, তার একটি সদ্য পাশ করা ছোকরা ডিপুটি প্রতিদ্বন্দ্বীও আছে। তার

রং নাকি ফর্সা এবং সে জীবনে সুবিধাও খানিকটা করে নিয়েছে, এদিকে শ্রীচরণ একে মাত্র বি, এ, পড়ে, তার ওপর বেচারার গাল বেশ যেন মাংসপেশীবহুল অর্থাৎ কিনা muscular. তবু সে বুঝত এবং নবজীবনকে এ কথা বুঝিয়েও দিত যে, রেণু সে ডিপুটি বেচারাকে আমল ত দেয়ই না বরং তারই কাছ থেকে সব মনের ভাব এবং সেলাইয়ের প্যাটার্ণ সংগ্রহ করে। দেখতাম নবজীবনও এ প্রতিদ্বন্দ্বীটির ওপর মোটেই প্রসন্ন নয়—এবং এসব ক্ষেত্রে কি করা উচিত তার সম্বন্ধে নানা উপদেশ শ্রীচরণকে দিয়ে দিত।

ক্রমে দেখলাম, নবজীবন গল্পের উটের মত ঘরের ভিতর একটু নাক ঢোকাবার চেষ্টা করছে। একদিন শুনি খুব কাতর ভাবে এবং লজ্জার সঙ্গে শ্রীচরণকে জিজ্ঞাসা করছে, 'ভাই, একদিন আমার কথা জানিয়ে দিবি না?' তার উত্তরে শ্রীচরণ বলছে, 'হ্যাঁ, সে ত বলেছিই। সে দিন আমার এক বড়লোক বন্ধু আছে শুনে তায়োই মশায় (বোধ হয় রেণুর বাবা) জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'তারা কি জাত?' আমি বল্লাম, 'ব্রাহ্মণ।' তিনি 'ও-বলে চুপ কর্লেন।' সঙ্গে সঙ্গে নবজীবনের আক্ষেপোক্তি, 'এঃ তুই বল্লেই পার্তিস,—কায়স্থ!' শ্রীচরণ মুখ গম্ভীর করে বল্লে 'না ভাই, রেণুর কাছে পায়ে সত্যি ছাড়া মিথ্যা বলব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।' এক একদিন নবজীবন খুব ব্যাকুল প্রার্থনা জানাত, 'ভাই, ওদের ফোন নম্বরটা বল্ না? তুই সেখানে গেলে তোকে ডাকব।' শ্রীচরণ ভয়ে ভয়ে বলে, 'দূর্ সে কি হয়?'

একদিন সোমবার ঘরে এসে দেখি শ্রীচরণ অতি মনোযোগের সঙ্গে আমার টেবিল-ঢাকার নক্সাটা নকল করছে আর তার পাশে বসে নবজীবন একখানা লাল রবার নিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে দেখছে। আমাকে দেখেই শ্রীচরণ (আজকাল আমারও রেণুতত্ত্ব মাঝে মাঝে শুনতে হচ্ছিল) বলে উঠলে, 'সুরেশ বাবু' এই নক্সাটা নকল করে দেবার জন্যে রেণু এই রবার আর পেন্সিল দিয়েছে। আর মজা জানেন, নবটা বলে কি যে, সে এ পেন্সিলটা রেখে দিয়ে একটা কোহিনুর কপিং দিয়ে দেবে।' নবজীবন ক্ষীণকণ্ঠে যথাসম্ভব চীৎকার করে আমায় জানিয়ে দিলে যে, এ সব বানানো —শ্রীচরণ একটা আস্ত পাগল।

রবিবার সকালে ঘুমের ঘোরে শুনতে পেলাম—নবজীবন শ্রীচরণকে বোঝাচ্ছে,—'যদি চটে যায় ত বলবি ভুল হয়েছে, বুঝলি?' বুঝলাম দু'একদিন বায়োস্কোপ খরচ করে শেষটা নবজীবন পেন্সিলটা গছিয়ে দিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই নবজীবন ঘরে ফিরে এল! এত আগ্রহ কেন তা ত বুঝতেই পাচ্ছ? আটটার সময় কলরব কর্ত্তে কর্ত্তে শ্রীচরণের প্রবেশ এবং অট্টহাস্য করে নবজীবনের দিকে তাকিয়ে আমায় সম্ভাষণ, 'সুরেশ বাবু, নবর মজাটা শুনুন।' নবজীবনের উৎসুক মুখে তখন প্রাণদণ্ডের ছায়া।— 'নব সেই দু'পয়সার পেন্সিলটা রেখে একটা কোহিনুর রেণুকে দিতে বলেছিল। পেন্সিল দিতেই ত রেণু মহাখাপ্পা! বল্লে—'আমার দু'পয়সার পেন্সিল-এর বদলে আপনি চার আনার পেন্সিল আনতে গেলেন কেন? বলতে বলতে হঠাৎ তার নজর পড়্ল পেন্সিলের উপর খোদাই করা N. C. অক্ষর দুটোর 'পর'—তখন জানতে চাইলে—N. C-কে? আমি বল্লাম,—আমার সেই বড়লোক বন্ধু, আমাদের জিনিষপত্র সব প্রায় এক কিনা, তোমার পেন্সিলটা হারাতে তার এটা দিয়ে দিয়েছে।' তখন রেণু কি বল্ল জানেন? তার ছোটভাইকে পেন্সিলটা দিয়ে দিলে আর আমার মুখ চোখ বাঁকিয়ে বল্ল, 'আপনার বন্ধুকে বলবেন—এ পেন্সিল আমি সাদরে নিচ্ছি কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এটা আমার ছোটভাই-এর প্রাপ্য।' বলতে বলতে শ্রীচরণ খিল খিল করে হেসে উঠল। নবজীবনের গালে একটা ব্রণের উপর তুলো দিয়ে কি যেন লাগান ছিল, চেয়ে দেখি তুলোটা উঁচু হয়ে উঠেছে। হবারই কথা!

এর পর শ্রীচরণ অসুখ করে দেশে চলে গেল আর সেই থেকে নবজীবন আমার পিছু নিলে। এটা অবশ্য আমার ভালই লাগল, কেন না তখন একটা বড়লোকের টুইশনি আমার নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছিল। আর তা ছাড়া কাঙাল বেচারাকে আমি ভাল বাসতেই আরম্ভ করেছি! ভেবে দেখ ঐ স্থূল দেহের ভিতর কেমন সুকুমার একটি

হৃদয় যেখানে কত 'লজ্জা আশা ভয় সদা কম্পমান !' জীবনের কাছে তার কত কম প্রত্যাশা ? নইলে আমি যে আমি, এমন একটা নাম করা ছেলে, সে ব্যাপারটা তাকে মোটেই চঞ্চল করে নি যতক্ষণ না সে দেখেছে আমার একটা আসল ব্রাহ্ম বন্ধু আছে—অর্থাৎ নিরঞ্জন। 'ব্রাহ্ম' কথাটা শুনেই যাদের মন দোলানো বেণীর মায়ারাজ্যে উড়ে যায় তাদের কল্পনা কি সোজা elastic ?

কিন্তু বড়লোকের ছেলের মনস্তত্ত্ব আর হৃদয়ের সঙ্গে তার শিক্ষার ভার নেওয়া আমার কপালে নেই। কিছুদিন বাদে নবজীবন আমায় ধরে বসল, একটা প্রফেসর টিউটার দিতে। কি আর করি নাম করতে লাগলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, বেথুনের নতুন অধ্যাপক নলিনীবাবু সেদিন বলছিলেন যে, বড়লোকের ছেলের টুইশনি আজ কাল নাকি আর পাওয়াই যায় না। কাজেই তাঁর নাম বল্লাম। বলতেই নবজীবন লাফিয়ে উঠল। 'তিনি বেথুনে পড়ান !' আমি বল্লাম, 'হ্যাঁ'। 'দিন না সুরেশ বাবু, তাঁকে যোগাড় করে—তিনি আড়াইশ টাকায় পড়াবেন ?" আমি ত অবাক। আড়াইশ টাকায় বোধ হয় প্রফুল্ল ঘোষকেই পাওয়া যাবে। নবজীবন বলে, "না না, অত বড় প্রফেসার চাই না—এঁরাই ভাল পড়াবেন।' ভাবলাম হায়রে, আজ যদি কোন মেয়ে-স্কুলের বাস-ড্রাইভারও হতাম তবে এ রকম মাসে আড়াই শ ফস্কে যেত না।

ক্রমে জানা গেল, এই রোমান্সপিয়াসী লোকটার প্রাণকে বিশ্বের প্রত্যেক তরুণীই একটি করে বাণ মেরে শরশয্যায় শুইয়ে রেখেছে। কবে যে কোন্ বাণের ব্যথা টন টন করে ওঠে তা বোঝাই যায় না। আমাদের ছাত্র-সমিতির সভাপতি বীরেন বাবু—যিনি এখন লক্ষ্ণৌয়ে অধ্যাপক—তাঁর সেই রমা সেনের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ের কথাটা মনে আছে ত ? যেদিন রাত্তিরে ফিরে প্রথম এ খবর নবজীবনকে বল্লাম, সেদিন অন্ধকারে তার স্তব্ধ মূর্ত্তি দেখে বড় সহানুভূতি হল, ভাবলাম, এ বুঝি বা কোন গুপ্ত ক্ষত। জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম, 'রমা সেনকে আপনি চেনেন নাকি ?' উদাস কণ্ঠে জবাব এল, 'হ্যাঁ—সেই ইনষ্টিটিউটে অপর্ণার পাঠ করেছিলেন।' আমার ইচ্ছে হচ্ছিল এই অতিকায় শিশুটিকে একটা দোলনায় শুইয়ে আদর করি।

এর কিছুদিন বাদে কি একটা বিষয় নিয়ে ছাত্র-সমিতি থেকে বীরেন বাবুর বাড়ীতে একটা পার্টির আয়োজন হচ্ছিল। পার্টির দুদিন আগে রাত্তিরে বীরেন বাবু তাঁর ফোর্ড গাড়ীখানি নিয়ে আমার মেসে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে প্রেসে গিয়ে নিমন্ত্রণপত্রগুলো এনে তখুনি সেগুলো লেখবার বন্দোবস্ত করতে হবে। এত রাত্তিরে একলা এত খাটতে ইচ্ছা কর্চ্ছিল না, তাই ভলান্টিয়ারিলোলুপ নবজীবনকেও সঙ্গে নিলাম। প্রেসে পৌছিয়ে বীরেন বাবু বল্লেন, 'তোমরা চিঠিগুলো নিয়ে এস, আমি এই কাছ থেকে মিসেস রায়কে উঠিয়ে আনি। অনেক রাত হল, তোমাদের সমিতিতে নামিয়ে একেবারে বাড়ী ফিরব।' অন্ধকারে ঠিক ঠাওর হচ্ছিল না, তবু যেন মনে হল, পুলকে নবর পমেটম-আঁটা চুল যেন নড়ছে। কোন রকমে হাসি চেপে ভেতরে ঢুকলাম !

মিনিটপনের বাদে কাজ সেরে বেরিয়ে এসে দেখি গাড়ীতে রমা দেবী বসে। মনে মনে একটু দুষ্টুমি গজাল। ফোর্ড গাড়ী, একসঙ্গে চারজন ধরবে না। তাই আমি আগেই ড্রাইভারের পাশে উঠে বসলাম। নবজীবন কি ক'রে এত বড় কাজটা কর্ব্বে ঠিক না কর্ত্তে পেরে কেমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন বীরেন চাবু তাকে ডেকে বল্লেন, 'এস, এস, উঠে পড়।' মাঝখানে মহিলাটি, একধারে নব আর একধারে বীরেন বাবু। গাড়ী চলেছে। আমি ভাবছিলাম, হায় রে আত্মগোপনশীল সভ্যতা, নইলে এ সান্নিধ্যলাভ—যা যুগ যুগান্তে কপালে মেলে না—এ যে বজ্রনির্ঘোষে জগৎকে জানাবার জিনিষ। একবার মনে হল—ওর হার্ট-ফেল হবে না ত—যে রকম মোটা। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, নবর নিষ্পন্দ মুখে sphinx-এর চেয়েও থম থমে নীরবতা।

সমিতিতে নেমে দেখি নবজীবন প্রায় মুমূর্ষু, নমস্কার করে ঘুরে দরজায় না ঢুকে পিছু হটছে। ব্যাপার কি ? গাড়ী তখন চলতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ আমার ঘাড়ে ঝড়ে পড়া পাখীর ছানার মতন আছড়ে পড়ে

নবজীবন আর্ত্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'সুরেশ-দা, সর্ব্বনাশ হয়েছে!' 'কি হল, কি হল?' 'এই দেখুন না', বলে নবজীবন তার পাঞ্জাবীর পেছন দিকটা আলোয় তুলে ধল্লে। দেখি সেই ত্রিশ টাকা দামের সাদা সিল্কের পাঞ্জাবীটার পেছন দিকটায় হলদে খানিকটা কি যেন লেগে! জিজ্ঞাসা কল্লাম, 'এটা কি—?' নবজীবন কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্লে, 'পেঁপে!' 'পেঁপে এল কেমন করে?' 'রমা দেবীর পেঁপে, কেউ খেতে দিয়েছে, অসময়ের জিনিষ—এঃ, সুরেশ-দা আমার কি হবে? তিনি জানলে ত আমার লজ্জায় মুখ দেখানো চলবে না!' হাসি কি আর সহজে চাপতে পারি—তাও বোঝাবার চেষ্টা করলাম,—'আহা তা হঠাৎ হয়ে গেছে। তা তিনি ত আর তোমায় চেনেন না।' কে কাকে সান্ত্বনা দেয়, বোধ হয় কোন ভবিষ্যৎ কল্পনায় বেচারার ভরসা পাবার অবস্থাই ছিল না।

এই ত গেল ছেলেটির স্বভাবের নিয়ম! এ যেন পথ ভুলে ইউরোপের মধ্যযুগের গল্প-কাব্য থেকে একেবারে আধুনিক বাংলায় এসে পড়েছে! কথা ছিল, চারু বাঁড়ুয্যে মণি বোস এ পাড়ি জমানর কাণ্ডারি হবে কিন্তু কখন্ যে অমৃত বোস জাতীয় লোক উঠে পড়েছে তা বোঝাই যায় নি। তাইতেই বোধ হয় যেখানে সে কালের তরুণীরা হতেন বিপন্না আর নবজীবনরা করত লড়াই, সেখানে বিপন্ন হচ্ছে নবজীবন আর লড়াই কর্ত্তে হচ্ছে মেয়েদের—এই তফাৎটুকু হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারটা বুঝবে, এই কিছু দিন আগেকার ঘটনাগুলো শুনলে।

মাস তিনেক হল' একদিন দেখি নবর সঙ্গে একটি খদ্দরের দড়ি বাঁধা বৃন্দাবনী ফতুয়া-পরা, ঝাঁকড়া চুল এক বিদ্রোহী কবি-মূর্ত্তি—যেন চেনা মনে হল। ঘণ্টা দেড়েক বাদে সে যেতেই তার পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্লাম। নব খুব রহস্যময় স্বরে উত্তর দিলে, 'ও আমার এক ক্লাস্-ফ্রেণ্ড—বন্ধু!' দেখি তার ছোট চোখ দুটিতে অস্বাভাবিক দীপ্তি। মনে ভয়ঙ্কর সন্দেহ হল, বল্লাম, 'ও কি ব্রাহ্ম?' প্রথমটা একটু থতমত ভাবে তারপর বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে নব বল্লে, 'না, ঠিক ব্রাহ্ম নয়। তবে ভারি cultured. বাড়ীতে মেয়েরা লেখাপড়া শেখেন, সাহিত্য-চর্চ্চা করেন। সন্ধ্যে বেলায় ওঁদের ওখানে খুব [illegible] [illegible] আলাপ আলোচনা হয়। কাল আমার ওঁদের ওখানে চা খাওয়ার নেমন্তন্ন।" সম্ভ্রমে তার গলাটা ভারি—আর সঙ্গে সঙ্গে দেহটি বিস্ময়-গর্ব্বে আরও ফোলা।

পরদিন আমি ভয়ে ভয়ে পালালাম। বাড়ী যে কার সে বুঝতে বাকী ছিল না। তিনি আমাদেরই কলেজের এসিষ্টাণ্ট লাইব্রেরিয়ান গোপাল বাবু। নানা সূত্রে তার সঙ্গে পরিচয় এককালে আমার ছিল। তাঁর পারিবারিক আভাসও যে খানিকটা পাই নি এমন নয়। সে আভাস কতটা বিপজ্জনক তা তোমরা তাঁর মেয়েকে দেখলে বুঝবে। মানুষ রক্ত মাংসের না হয়ে যদি জ্যোছনা দিয়ে তৈরী হত তা হলেই এই মেয়েটির দেহহীন লাবণ্যের খানিকটা অনুধাবন হত। সুতরাং ভয় আমার হওয়া স্বাভাবিক। একে সুন্দরী তায় বেশ বিদূষী। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকের কাছে একেবারে ভীম নাগ। আর কিছু না হোক, রাত্তিরে ঘুমোতে যে দেবে না এটা ঠিক।

সকালে মেসে ফিরে দেখি নবজীবন একমনে বসে কলেজের টাস্ক করছে। এত বড় অভাবনীয় সংঘটনের ছায়া পর্য্যন্ত তার মুখে চোখে নেই। মাঝে ধারণা জন্মাচ্ছিল, তাক-লাগিয়ে দেওয়া ব্যাপারগুলো সেই সব সেকালের অতিকায় জানোয়ারদের সঙ্গে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে—কিন্তু আজ এ ধারণায় এক্টা কঠিন আঘাত লাগল! তবু কিছু শুনবার আশায় আশায় জিজ্ঞাসা কল্লাম,—'কি নব, ব্যাপার কি।" শান্ত গম্ভীর উত্তর পাওয়া গেল, 'টাস্ক করছি।'

তারপর কয়েকদিন সেই বিদ্রোহী কবিটি অর্থাৎ গোপাল বাবুর ছেলেকে যেতে আসতেও দেখলাম। এক দিন ত পরিষ্কার কানে এল, 'মা বলেছেন, আপনাদের যাওয়ার কথা।' কিন্তু নবর মন যেন মায়াময় রাজ্যের অপর পারে শাস্ত্রকারদের নিষ্কাম নিস্পৃহ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-হীন লোকে। কোন সাড়া শব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই। বেচারর ফাঁপা চেহারাটা যেন একটা বিরাট আহ্লাদের ঐশ্বর্য্যে ভরাট—কোথায় বা সে অন্তহীন 'রাজভোগ' খাওয়া, কোথায় বা নিত্য বায়োস্কোপ—কোথায় বা সে হাস্য-কম্পিত দেহের পুঞ্জ পুঞ্জ মাংসের পর্ব্বতগুলির নর্ত্তনলীলা! আজ কাল সে খুব ধীর স্বরে 'কচ ও দেবযানী' পড়ে

আর মাঝে মাঝে শূন্যদৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ভুঁড়িতে হাত বুলায়। এ সব যে ভগ্নউদ্যম হতাশ প্রেমিকের লক্ষণ! মেয়েটি প্রেম না হতেই প্রত্যাখ্যান করলে না কি?

কিছুই কূল কিনারা পাই না। এর মধ্যে একদিন দৈবক্রমে বাদুড় বাগানের মোড়ে স্বয়ং গোপাল বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি ত আমায় দেখেই একরাশ কথাবার্ত্তা বলতে আরম্ভ কর্লেন। তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে পার্চ্ছেন না, অমন ভাল মেয়ে; কিন্তু একটি ভাল ছেলেকে সুলভে কি করেই বা পান? ছেলের এক বড়লোক বন্ধুর কথা শুনে ছলে বলে কৌশলে তাকে বাড়ীতে আনালেন যদি পছন্দের দ্বারা খরচ কমে। কিন্তু সে ছেলে না কয় কোন কথা, আর আসতে না আসতেই এম্নি মলিন মুখ নিয়ে বসে থাকে যে, মনে হয় তার যথাসর্ব্বস্ব বুঝি বা শেয়ারের বাজারে লাগান হয়েছে, এতে ত আর সাহস করে এগুনো যায় না? আমার হাতে কি কোন পাত্র নেই?—ইত্যাদি। অন্ধকারের ভেতর একটা পথের আভাস পেলাম!

বাড়ী এসেই নবকে সোজাসোজি ডেকে বল্লাম, 'ওহে, তোমার গোপাল বাবুদের বাড়ীর খবর কি?' প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে দেখি তার মুখ বেশ পাণ্ডুর হয়েছে—একটু কাঁপা গলায় বলতে আরম্ভ কর্ল, "সুরেশ-দা—একটা কথা আজ কেবলি মনে হচ্ছে—'রমলায়' পড়েছিলাম ..' এককথায় কিছুই না—জীবনের অমৃত কেবল পিপাসা সৃষ্টিই করে—বুক পুড়িয়ে দেয়—গোপাল বাবুদের এতে নাম গন্ধও নেই।

তোমাদের নিরেট মাথায় বোধ হয় ব্যাপারটা ঢুকছে না। আসলকথা, নবজীবন প্রেমে পড়েই নি, তবুও ব্যর্থতার বিষে তার পেয়ালা ভরপুর। এ আজকালকার প্রেম কিনা—ল্যাজা মুড়ো আছে, দেহ নেই। আশার আবেগ এতে তীব্র—না পাওয়ার শূন্যতায় এ খাঁ খাঁ করছে, কিন্তু আসল প্রেম হওয়াটা এতে নেই! অনঙ্গদেবতা ত আজকাল দেহধারণ করে সারা ভুবনে বেড়ান না—ভস্ম হয়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছেন। তাই যে ধন পেতে সে আজীবন কঠোর তপস্যা করে—পাণ পর্য্যন্ত খেলে না—দাঁত লাল হওয়ার ভয়ে, সে তপস্যার ধন যখন হাতে এল তখন সে ভাবতে আরম্ভ করেছে যে, এ জীবনে আর তা পাওয়া হল না।

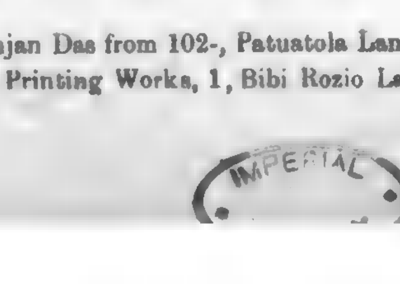

Published by Sj. Dineshranjan Das from 102-, Patuatola Lane and Printed by K. Lahiri,
at the Britannia Printing Works, 1, Bibi Rozio Lane, Calcutta.

IMPERIAL

কল্লোল

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

কল্লোল
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

সব পুড়ে' হ'ল ছাই

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শাঙনের গাঙ্ ভাঙন ধরেছে—এমনি তোমার দেহ,
বুকের সোনার গাগরী ভরিয়া এনেছ কি অমুলেহ !
ময়ূরপঙ্খী তনু
ময়ূরের মত পেখম মেলেছে,—দেখিয়া উতলা হ'নু।
প্রবালের ডিবা ছুটি ঠোঁটে কিবা প্রবল কামনা মাখি'
আমার নয়নে রেখেছিলে তব মদমুকুলিত আঁখি !
গিরিকর্ণিকা কর্ণে তুলিত, বক্ষে ললন্তিকা,
দেহদীপাধারে জ্বলিত লেলিহ যৌবন-জয়শিখা !
সব পুড়ে' হ'ল ছাই,
তোমার মাঝে যে বিধবা বিরাজে সে কথা ত জানি নাই।
কই তব সেই মণিকঙ্কন, কই মালাচন্দন,
উদয়-তারার শাড়ি কই সই, কই বেণীবন্ধন ?
আজি সখি গিয়ে দূরে
রজনী ভরিয়া তারার আলোয় খুঁজিছ কি বন্ধুরে ?
বন উচ্ছের তুচ্ছ পাতায় তোমার চাহনি দেখি,
সন্ধ্যার ঐ সন্ধ্যাভাষায় মোরে তুমি ডাকিলে কি ?
অন্তরঙ্গতার
সুখসৌরভ আনিল কি বহে' মৃত্যু-অন্ধকার ?

বর্ণ-সমস্যা

শ্রীঅমিয়া চৌধুরী

'তরুণ সমিতি'র সেক্রেটারী শ্রীমান সঞ্জয় রায়ের বিবাহ উপলক্ষে সহরের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

সঞ্জয় পিতৃহীন। তাহার খুড়া কলিকাতায় গিয়া পাত্রী দেখিয়া আসিয়াছেন, এবং সেই হইতে ভাবী বধূর রূপগুণের কথা সঞ্জয়ের অন্তঃপুরে, তরুণ সমিতির মিলন-বৈঠকে, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের মুখে সর্ব্বত্র আলোচিত হইতেছিল। সমিতির অধিকাংশ সভ্যই বিবাহিত; তাঁহাদের পত্নীরাও সমিতির সভ্যা, কেহ বা আড়ালে থাকিয়া, কেহ প্রকাশ্য ভাবে, তবে অল্পশিক্ষিতা নারীর সংখ্যাই বারো আনা। কয়েকটি বয়স্কা কুমারীও এই সভার আছেন। গীত বাদ্য, সাহিত্যের চর্চা, নবযুগের বিপ্লব-বাদী আন্দোলন, শিক্ষা ও সমাজ-রীতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচার এই তরুণ সভ্যদের উদ্দেশ্য।

সহরের কয়েকটি যুবকের হঠাৎ-হুজুগে এই তরুণ সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বক্তৃতা দিয়া, সভা করিয়া তাহারা এমন কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল যে, অনেক পরিবারের বৃদ্ধ অভিভাবকের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহারা বুঝি অন্যায় রকমেই বধূ, কন্যা, স্ত্রী ভগ্নীগণকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সময় বিশেষে যে খুব পাকা মাথাও বেঠিক হইয়া যায় তাহা সকলেই জানেন।

যাহা হৌক, সেই সব আন্দোলনের ফলে সমিতিতে বহু সংখ্যক নারী-সভ্য জুটিয়া গেলেন। শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কারে তাঁহারা কেহই উন্নত ছিলেন না; সমিতির উৎসাহী সভ্যগণ তাহাদের এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। ফলে, তামার পাত্রের উপর গিল্টির পালিশের মত সভ্যা মহিলাগণের মুখে চোখে বাক্যে ও ব্যবহারে একটা উজ্জ্বল পালিশ ধরা পড়িল; কিন্তু অন্তঃপুরে গৃহধর্ম্মে অতিমাত্র ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল এবং মাতৃকর্ত্তব্যবোধ সর্ব্বপ্রকারে অচেতন হইয়া পড়িল।

দিন অবাধে কাটিতেছিল; এমন সময় সঞ্জয় রায়ের ভাবী পত্নীর গুণালোচনা সকলকেই একটু ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

বধূ বরেন্দ্রী ধনী বংশের কন্যা। আজন্ম কলিকাতাতেই প্রতিপালিতা। সম্প্রতি ইস্কুলের পড়া শেষ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। তরুণ সমিতির একটি সভ্যাও কলেজে পড়া তো দূরে থাক্—মোটে শিক্ষিতাই নহেন; আচার ব্যবহারে তাঁহারা শিক্ষিতা ভগিনীগণের অন্ধ অনুকারিণী মাত্র।

শিক্ষাহীনাদের স্বামীদের অন্তরেও শান্তি ছিল না। তাঁহাদের মধ্যেই একজন অন্তরে ঈর্ষাদগ্ধ হইয়া ও মুখে হাসি টানিয়া কহিলেন, 'ওহে সঞ্জয়, বিয়ে তো কোরচ, তারপর তোমার দর্শন পাওয়া যাবে ত ?'

সঞ্জয় উত্তর দিল, 'যাবে নাই বা কেন ?'

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে যেন বিরক্তির প্রচ্ছন্ন সুর বাজিয়া উঠিল। বন্ধু কহিলেন, 'না, তাই জিজ্ঞেস করচি, শিক্ষিতা পত্নীর সাহায্য ত্যাগ করে কি আর এই হতভাগ্যদের কাছে আসতে ইচ্ছে হ'বে ?'

কুমারী চন্দ্রিকাদেবী অত্যন্ত মুখরা; সে কহিল, 'সঞ্জয় বাবুর শিক্ষিতা পত্নী আমাদের সভায় সভ্য হ'বেন না, নাকি !'

সঞ্জয় শুধু কহিল, 'এমন কথা তো আমি বলি নি।'

এই উত্তরে কেহই সন্তুষ্ট হইল না। মিসেস্ নীলিমা সেন ঈষৎ হাস্যে ওষ্ঠাধর অনুরঞ্জিত করিয়া কহিলেন, 'মুখে না বল্লেও আপনার ভাবে সেই রকমই বোধ হচ্ছে; আর বলা-কওয়ার দরকারই বা কি, কাজে যা করবেন সে তো চোখেই দেখ্‌তে পাব।'

সঞ্জয় স্পষ্টই বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'তবে তাই অপেক্ষা করে দেখুন না। আগে থাক্‌তেই আমাকে দোষী করে রাখচেন যে?'

সভাপতি সুরেশ কহিলেন, 'সঞ্জয়ের দেখচি আজকাল অল্পেই রাগ হয়ে যায়; এতে তো দোষাদোষীর কথা কিছু হচ্ছে না, বিয়ে করে তুমি যে খুব বদলাবে তা আমিও এক রকম লিখে দিচ্ছি।'

'কিসে তার প্রমাণ পাচ্ছেন?'

সুরেশ গম্ভীর ভাবে কহিলেন, 'আজ মাস কয়েক যাবৎ দেখচি, সমিতির প্রতি তোমার আগেকার মত টান নেই।'

সঞ্জয় কি বলিবার উপক্রম করিতেই সুরেশবাবুর স্ত্রী সুনন্দা কহিলেন, 'প্রতিবাদ করলে কি হবে সঞ্জয়বাবু, এ তো সত্যি কথাই। আজকাল প্রায় তোমার কাজই হয়েছে সমিতির দোষ খুঁজে বার করা।'

সঞ্জয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; সত্যই, প্রতিবাদ করিয়া কি হইবে! অনেক দিন হইতেই সমিতির কাজে তাহার তেমন আগ্রহ নাই। সভ্যদের মুখোসপরা ভদ্রতার অভিনয়, সভাগুলার [illegible] [illegible] তাহার অন্তরকে অহর্নিশিই বিদ্ধ করিতেছিল।

সঞ্জয়ের অকস্মাৎ নীরবতায় সমস্ত সভায় একটা অপ্রীতিকর মৌনভাব বিরাজ করিতে লাগিল। কেহই বলিবার মত কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। এমন কি প্রগল্‌ভা চন্দ্রিকা দেবী পর্য্যন্ত নীরব নতমুখে স্বরলিপির পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল সঞ্জয়ের খুড়তুতো ভাই রাজীব। রাজীব বি, এ, পড়ে। গান বাজনার সখ ছিল বলিয়া তাহার চর্চ্চার উদ্দেশ্যে সে তরুণ সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। মনের মধ্যে কিন্তু সে মোটেই সমিতির অনুরাগী ভক্ত নহে।

রাজীব প্রবেশ করিবামাত্র সুরেশ সহাস্য উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, 'কি হে রাজু, সমিতি পরিত্যাগ করবার মতলবে আছ নাকি। দেখাই যে পাওয়া যায় না!'

সঞ্জয়ের মুখ লাল হইয়া উঠিল। রাজীব সুরেশের ঠাট্টা গায়ে না মাখিয়া কহিল, 'আপাতত খানিকটা সময়ের জন্য পরিত্যাগ করে যাচ্ছি। ছোড়দা, চল, জেঠাইমা ডাকচেন—কি কাজ আছে নাকি—'

চন্দ্রিকা অহেতুক পরিহাসের স্বরে প্রশ্ন করিলেন, 'গায়ে হলুদ নাকি!'

রাজীব উত্তর দিবার আগেই সঞ্জয় আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। এবং একটি নমস্কারে সকলকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। দাদার পলায়নের রকম দেখিয়া রাজীবও একটু মৃদু হাসিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সভা সেদিন আর তেমন জমিল না।

২

বিবাহ করিয়া অতিশয় গম্ভীর মুখে নববধূসহ সঞ্জয় বাড়ী ফিরিল। নবপরিণীত বরের অপ্রফুল্ল মুখ দেখিয়া পরিজনরা বিস্মিত হইল, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া কোন প্রশ্ন করিল না।

বরণ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম শেষ হইয়া গেলে সঞ্জয় স্নান বা খাওয়ার কোনই উদ্যোগ না করিয়া সোজা নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

সঞ্জয়ের ছোট বোন ঊষা ব্যস্তভাবে বিবাহবাড়ীর নানা কাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। দাদার গতিবিধি তাহার চোখ এড়াইল না। সে গিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল।

মা কহিলেন, 'কি রে!'

ঊষা কহিল, 'দাদার রকম তো কিছু বুঝি না; কাল বিয়ে করে এল, তা মুখখানা কি বেজায় গম্ভীর—একটা হাসি না, কথা না। এ আবার কি

ঢং বাপু! আবার এখন দেখ—না খেয়েদেয়ে ঘরে গিয়ে শুল'। কি হয়েচে, জিজ্ঞেস করে দেখ—'

'কি হল আবার!' বলিয়া মা উদ্বিগ্নচিত্তে পুত্রের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। চারি মেয়ের মধ্যে মা'র এই একমাত্র পুত্র সঞ্জয়। অতিরিক্ত আদরে ও শাসনের একান্ত অভাবে সঞ্জয়ের চরিত্র অতিমাত্রায় স্বাধীন ও জেদী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মা সর্ব্বদাই অসীম ধৈর্য্যের সহিত পুত্রের সকল আবদার ও অভিমান সহ করিয়াছেন। এখন সে বড় হইয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়াছে। তবু সে মায়ের 'আদুরে খোকা।'

সঞ্জয় বিছানায় পড়িয়াছিল, মা আসিয়া কহিলেন, 'কি রে খোকা, নাইতে খেতে হবে না। রাস্তার কষ্ট যে—'

সঞ্জয় বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল 'মা, তোমরা বেশ কাণ্ড তো করেছ! এই নাকি বৌ খুব ফর্সা?'

মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 'ফর্সাই তো।'

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে পুত্র বলিল, 'কোথায় ফর্সা! আমাদের গোরার মতও নয় সে।'

গোরা সঞ্জয়ের ছোট বোন। মা কহিলেন, 'গোরার রং তো শাদা, সে কি অমন ভাল, বৌ-এর রং-এ বেশ লালের ছোপ আছে—'

সঞ্জয় ক্রুদ্ধস্বরে কহিয়া উঠিল, 'তবে তো ভারি ভাল হ'ল আর কি! কাকা তখন দেখে এসে বলেন নি, খুব শাদা রং!'

মা ভয়ে ভয়ে কহিলেন, 'খুব' বলেন নি, বলেছিলেন, বেশ ফর্সা, তা তখন বোধ হয় পাউডার মাখিয়ে—না—কি—'

'সে সব আগে ভাল করে খোঁজ নিতে হয় মা—' বলিয়া সঞ্জয় আবার শুইয়া পড়িল। উষা এতক্ষণ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। বয়সে ছোট হইলেও সে ছেলেপিলের মা, একটা সংসারের গৃহিনী। দাদার চেয়ে সাংসারিক অভিজ্ঞতা তাহার বেশীই।

ঘরে ঢুকিয়াই উষা কহিল, "আজ নাওয়া খাওয়া হবে না মা! দাদাকেও ধন্যি বলি বাবু, এসে না নামতেই মা'র সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েচ, একটু সবুর সয় নি!'

এই কনিষ্ঠা ভগ্নীটির সহিত সঞ্জয় সর্ব্বদাই কথায় পরাজিত হইত। কাজেই তাহার আগমনে সে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'তোকে কে পাকামী করতে ডাকলে শুনি! তুই এ সব বুঝিস্ কি!'

উষা রাগ করিয়া বলিল, 'তোমার চেয়ে আমি কম বুঝি না। কেমন সুন্দর বৌ হয়েছে, রং তো বেশ ফর্সাই, আর মুখখানা একেবারে—'

'দেখ্ উষি, অতিরিক্ত উদারতা দেখাস্ নে, কাকা এসে বল্লেন, খুব ফর্সা। এখন তো তা দেখছি না—!'

'যা দেখে এসেছেন তাই তো বলবেন? না, সে রকম দেখাটা তোমাদের পছন্দ নয় বুঝি। বৌ-এর গালে ভিজে গামছা ঘষে রং পরীক্ষা করাটাই উচিত ছিল!'

'তোকে আমি কিছু বলছি না উষি, মিথ্যে আমাকে রাগাস্ নে—'

'মিথ্যে কি বলছি—' বলিয়া উষা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেই মা তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলেন—'যা এখান থেকে; দুপুর বেলা—বিয়ে বাড়ী ভাই-বোনে কি ঝগড়া করতে লাগলি, লোকে শুনলেই বা বলবে কি!'

উষা মুখভার করিয়া কহিল, 'লোকে যা বলবে তা তো আর চাপা দেওয়া চলবে না, আমি ভাল ভেবেই বল্‌তে এসেছিলুম।'

মা কহিলেন, 'আচ্ছা থাক্ বাছা, তোর আর ভাল ভাব্‌তে হ'বে না,—হাাঁ রে খোকা, তোর বন্ধুদের খাওয়ার ব্যবস্থা হ'বে না! কালও বীরেন এসেছিল, আমায় বল্লে, 'মাসিমা, আমাদের সমিতির সবাইকে কিন্তু আলাদা খাইয়ে দিতে হ'বে।' তার কি বন্দোবস্ত হ'বে বল্।'

সঞ্জয় কহিল, 'থাক্ তার আর দরকার নেই।'

'সে কি রে! বৌ দেখ্‌তে চাইবে না ওরা!'

'কে দেখাবে যে দেখবে! আমি ওই কালো বৌ সবাইকার সাম্‌নে বার করতে পারব না—' বলিয়া সঞ্জয় উঠিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

মা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। উষার কিছু কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে তখনকার মত মনের রাগ মনেই পরিপাক করিয়া নববধূর উদ্দেশে চলিয়া গেল।

* * * * *

খবরটা আর একস্থানেও পৌঁছিয়াছিল।

বাড়ীতে চারদিকে লোকজনের আনা-যাওয়া। কেবল গণ্ডগোল। উষা নববধূকে কাপড় ছাড়াইয়া, জল খাওয়াইয়া দ্বিতলের একটি নিভৃতকক্ষে বসাইয়া দিয়াছিল। বালক বালিকা, বৌ ঝি সব এতক্ষণ বধূর কাছেই ঘুরিতেছিল, আহারের ডাক পড়ায় এই মাত্র সবাই উঠিয়া গিয়াছে; বধূ লীলা চুপ করিয়া বসিয়া বাপের বাড়ীর কথা ভাবিতেছিল।

তাহার ঝি আন্নী আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। লীলা মৃদুস্বরে কহিল, 'কোথায় ছিলি আন্নি! একা বোসে আছি—'

আন্নী কাপড়ের আঁচলে তাম্বুলরঞ্জিত ওষ্ঠাধর মুছিয়া ফেলিয়া লীলার কাছে বসিতে বসিতে কহিল—

'আমাকে জল খেতে ডাকলে কি না, তা সবাই যে এখানেই ছিল।'

'তারা সব চলে গেছে, তুই এতক্ষণ ধরেই খেলি না কি!'

'খেয়ে তো কোন্ কালেই চলে আসছিলুম, তা এদিক্‌কার দালান পার হয়ে আসতে শুনি জামাইবাবু তানার মা'র সঙ্গে ঝগড়া করতে লেগেচে, তাই দাঁড়িয়ে একটু শুনে এলাম।'

লীলা একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, 'পরের কথা তুই শুনতে গেলি কেন?'

আন্নী চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত করিয়া কহিল, 'পরের কথা কি গো! তোমার কথাই হচ্ছে যে!'

বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া লীলা কহিল, 'আমার কথা কি হচ্ছে রে!'

'জামাইবাবু বলচে তুমি নাকি ফর্সা নও। মা বোঝাতে গিয়েছিল। তা কে শোনে কথা! তোমার ননদ যে, সেও ছেলো, কত শুক! বন্ধুরা নাকি তোমায় দেখতে আসবে। এই শুনে জামাইবাবু রেগে মেগে বাইরে চলে গেল, বলে গেল, 'কালো বৌ আমি লোকের সামনে বার করতে পারব নি। আমায় লজ্জা করবে।—শুনলে কথা। মাগো—কি ঘেন্নার কথা দিদি, তুমি নাকি কালো!'

'কালোই ত!' বলিয়া লীলা একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিল। মনটা ধীরে ধীরে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব অশান্তির ছায়ায় ভরিয়া উঠিতেছিল। এই পরিণীত জীবনের সূচনা! অচ্ছেদ্য বন্ধনপাশে আবদ্ধ নূতন জীবনপথের অপরিহার্য্য সাথীটির চোখে কেবল বাহিরের আবরণটাই বড় হইয়া উঠিল! সে সত্যই কালো নয় বটে। কিন্তু কালো হইলেই বা তাহার কি অপরাধ হইত! কালো মেয়েরা কি মানুষ নয়! কালো চামড়ার নীচে কি একটা রক্ত শিরা-বিশিষ্ট নারী-হৃদয় নাই! কালোর প্রাণে কি স্বাভাবিক অন্তঃপ্রেরণা, সংসারের সাধ আশা, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জাগিবার কোন অধিকার নাই! পুরুষের এত নির্ম্মম পক্ষপাত কিসের জন্য!

'বৌদি!'

লীলা চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, উষা আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যেই উষার মুখেই লীলা উহার নামধাম সম্পর্কের পরিচয় পাইয়াছিল। উষার দিকে চাহিয়া সে একটু হাসিয়া আবার মাথা নত করিল। 'কি ভাবচো বৌদি, বাপের বাড়ীর কথা?'

বলিয়া উষা কাছে বসিয়া লীলার হাতখানা সস্নেহে হাতে তুলিয়া লইল।

৩

সঞ্জয় যতই রাগ করুক, ভদ্রতার খাতিরে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করিতেই হইল। নববধূর সহিত ভাব করিয়া লইবার সে কোন চেষ্টাই করিল না। এবং তাহার মন ও মুখ অন্ধকার হইয়াই রহিল।

আগামী কল্য প্রীতিভোজ। আজ সঞ্জয় মুখখানা আরো গম্ভীর করিয়া রহিয়াছে। লোকের কাছে উপহসিত হইবার দুর্দিন অতি আসন্ন, তাহা ভাবিতেও তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিতেছিল। কত সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া সে সাগ্রহে কলিকাতার এই সম্বন্ধে রাজী হইয়াছিল তাহা তো বন্ধু ও বান্ধবীদিগের অবিদিত নয়। কাল লীলার মুখ দেখিয়া মনে মনে সবাই হাসিবে। চন্দ্রিকা কি বলিয়া বসে তাহার ঠিক কি !—

তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া তাহার বৌদিদি, রাজীবের সহোদর-পত্নী কনকতারা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেন।

‘কি ভাবা হচ্ছে, ঠাকুরপো !’

সঞ্জয় বলিয়া উঠিল, ‘আচ্ছা বৌদি, কালকের খাওয়ার ব্যাপারে বৌ-দেখানোটা বাদ দিলে হয় না !’

কনকতারা হাসিয়া উঠিলেন, ‘খেতেই তারা আস্‌চে কি না ! এসে আগেই বৌ দেখতেই চাইবে—সকলেই চায়, তখন বুঝি না দেখিয়ে অভদ্রতা করবে !’

‘তা কি পারা যায় ! কি মুস্কিল, বল দেখি।’

‘কেন, হয়েছে কি ! বৌ তো বেশ সুন্দরী, তবে রংটা খুব সাদা নয়—একেবারে চোখ ঝল্‌সানো না।’

সঞ্জয় চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। কনকতারাও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা কহিয়া উঠিলেন, ‘আচ্ছা, ঠাকুরপো, এক কাজ করলে হয় না !’

সঞ্জয় বৌদির মুখের দিকে চাহিল।

‘বৌকে একটু পেন্ট্ করলে হয় না !’

সঞ্জয় উৎসাহিত হইয়া কহিল, ‘পারবে বৌদি ! বেশ ভাল করে ! আর কিছু তো না, কেবল রংটা একটু সাদা করে দেওয়া !’

‘আমি ! আমি কি করে পারব ! এ কি শুধু পাউডার আর ঘোতেই হবে ! একেবারে টের পাওয়া যাবে না এম্নিভাবে পেন্ট করতে গেলে অনেক কারিগরি লাগে।’

সঞ্জয় বিমর্ষ হইয়া কহিল, ‘তবে !’

কনকতারা কহিলেন, ‘আমার মেজদা কিন্তু বেশ পারেন। তাঁকে তো জানই—ছেলেরা যে থিয়েটার করে—তাতে যারা রাণী টানী সাজে, ওদের তো মেজদাই সাজিয়ে দেন। কালো কুচ্ছিত ছেলে ওঁর হাতে পড়ে যেন পরীটির মত হয়ে দাঁড়ায় !’

‘তাঁকে বলে কি রকম দেখাবে !’

‘কেন, কি হবে ! আজকাল কত বিয়ের ক’নেকে পর্য্যন্ত উনি সাজিয়ে দিচ্ছেন। তুমি তো ছিলে না—সেদিন ওঁদের নির্ম্মলার বে’তে আমি গিয়েছিলুম। কি কালো মেয়ে দেখেছ ত ! মেজদা চমৎকার করে রং দিয়ে দিলেন, কে বলবে সেই মেয়ে !’

‘তাহলে ওঁকেই বলা যাক্ বৌদি। আমার সঙ্গে জ্ঞানবাবুর পরিচয় আছে—উনি আমাদের সমিতির সভ্য কি না, তার ওপর তোমার ভাই উনি—আমার কোন আপত্তি নেই, আর মা—’

কনক হাত নাড়িয়া কহিলেন জেঠী মা তোমার কোন্ কথাটায় আপত্তি করেন ! আর করলেও একটু চেপে ধরলেই হয়ে যাবে।’

‘সে আমি পারব। তুমি জ্ঞানবাবুর কাছে একখানা চিঠি লিখে রাখোগে, আমি মা’র কাছে যাই একবার—’

সঞ্জয় উঠিল। কনকতারাও চলিয়া যাইতেছিলেন, সঞ্জয় সহসা কহিল, ‘শোন, বৌদি, আর কেউ যেন না শোনে। উমি শুন্‌লে অনর্থ করবে কিন্তু।’

‘আমি কাউকে বলবো না, ভয় নেই’—বলিয়া কনকতারা হাসিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মাকে সম্মত করাইয়া সেইদিন বিকাল বেলা জ্ঞান বাবুর কাছে কনকতারার পত্র পৌঁছাইয়া, অনেকদিন পরে সঞ্জয় একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল।

• • • •

সন্ধ্যা আসন্ন; উৎসব মুখরিত প্রকাণ্ড বাড়ীটায় কান পাতিবার জো নাই। লীলা তাহার শয়ন কক্ষের জানালায় দাঁড়াইয়া সম্মুখের সবুজ প্রান্তর ও অস্তসূর্য্যের আভামণ্ডিত আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। বাড়ীশুদ্ধ লোক আজ তরুণ সমিতির সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত প্রীতিভোজের

ব্যাপারটি সর্ব্বপ্রকারে নিখুঁত করিবার জন্য উৎসাহের সহিত লাগিয়া গিয়াছে। লীলাকে কেহ কিছু বলে নাই; তবু সে নিজেই যে ইহার একটা মস্ত খুঁত তাহা লীলা বুঝিয়াছে। তাই তাহার চিত্তে শান্তি ছিল না।

দরজার নিকট পদশব্দ পাইয়া সে আনত মুখে একটু বেশী করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল। সেই অবস্থাতেই শুনিল, কনকতারার কণ্ঠস্বর, 'ওমা, আঁধারে দাঁড়িয়ে কেন ভাই, আলোটা পর্য্যন্ত জ্বালো নি'—বলিয়া আলোর সুইচ্ টানিয়া দিলেন। টেবিলের উপর কতগুলো কি জিনিষ রাখিয়া দ্বার সমীপবর্ত্তী কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, 'দাদা, এসো।'

একটি সুবেশ যুবক ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইনি জ্ঞানবাবু, কনকতারার ও সঙ্ঘের অনুরোধ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। কনক কহিলেন, 'বৌ, এদিকে এসো ভাই।'

লীলা নড়িল না। সে ভাবিতেছিল, এই বুঝি মুখ দেখানোর পালা সুরু হইল। কিন্তু এক একজন করিয়া কেন আবার! যে মুখ দেখাইতে স্বামী লজ্জিত, সেই মুখ যদি নববধূত্বের দায়ে ঠেকিয়া দশজনের সামনে দেখাইতেই হয়, তবে একবারে একসঙ্গে সেই অপমানকর কাজটা শেষ হইয়া গেলেই ত সে বাঁচিত। দশবার করিয়া ঘোমটা খোলার এ দুর্ভোগ কেন! নিরুপায় নিরুদ্ধ বেদনায় লীলার বুকের ভিতরে ঝড় বহিতেছিল, কিন্তু সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কনক সেই নির্ব্বাক সচল প্রতিমার হাত ধরিয়া আনিয়া একখানা আসনে বসাইয়া দিলেন। লীলার মুখে দীর্ঘ অবগুণ্ঠন, তবু তাহারই ভিতর হইতে তাহার নজরে পড়িল, সম্মুখে টেবিলের উপর পাউডার স্নো, ক্রীম ও সরু মোটা তুলির ছড়াছড়ি। মুহূর্ত্তেই তার মনে একটা সংশয় জাগিয়া উঠিল। ইঁহারা তাহার, রং-এর উপর পালিশ দিবেন ভাবিয়াছেন নাকি! লীলা মনে মনে ভাবিল, যদি সেই অপমানই তাহার ভাগ্যে ঘটে তবে সে কখনও নীরবে সহিবে না। তাহাতে যদি বধূত্বের সীমালঙ্ঘন করিতে হয় তবুও না।

কনকতারা কহিলেন, 'আগে হাতটা থেকে আরম্ভ কর দাদা, ওর একটু লজ্জা ভাঙুক, ঘোমটা দিয়েছে দেখ না, যেন কনে-বৌ! দেখি ভাই তোমার হাত—' বলিয়া কনক লীলার কম্পিত দেহটির একখানি হাত আপনার হাতে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞানচন্দ্র অগ্রসর হইয়া সেই হাতখানা ধরিতে গেলেন, তৎক্ষণাৎ যেন অশুচিস্পর্শের নিদারুণ ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিয়া লীলা হাত সরাইয়া লইল এবং সবেগে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কনকতারা কহিলেন, 'ওকি, বোস, উঠে যাচ্ছ কেন!'

লীলা অনুচ্চস্বরে কহিল, 'কেন বস্‌বো!'

কনকতারা অবাক হইয়া গেলেন, গালে হাত দিয়া কহিলেন, 'অবাক করলে যে, তোমার কাছে আবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি! জান না, সমিতির সব সভ্যরা আসবে, দাদা তোমাকে একটু পেণ্ট করে দেবেন।'

লীলা মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, 'না।'

'না! জান, ঠাকুর পোর এই হুকুম! তুমি নূতন বৌ, তোমার সাহস তো কম নয়। যা বলি তাই মুখ বুজে করে যাবে, না, মুখের উপর জবাবদিহি! আর একটু রং করে দিলে তোমার কি মানের হানি হয়ে যাবে তা' তো দেখ্‌তে পাচ্ছি না।'

লীলা আর সহ্য করিতে পারিল না। রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, 'দেখতে পাবেন কি করে! যদি দেখতে পেতেন তবে আর ঘরের বৌকে রং দিয়ে অভিনেত্রীর মত সাজাতে আসতেন না!'

কনকতারা ও জ্ঞানচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেক ভদ্র পরিবারে বধূ ও কন্যাগণকে পেণ্ট করিয়া এতকাল যাবৎ জ্ঞানবাবু বহু বাহাদুরী অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আজ এই নূতন বধূর মুখে এত স্পষ্ট কথা শুনিয়া তাঁহার মুখ কালি হইয়া গেল। কনকতারা বুঝিলেন, রাগ দেখাইয়া কোন ফল হইবে না, তিনি একটু নরম হইয়া কহিলেন, 'কি পাগলামী কর, দেরী হয়ে যাবে, তারা এখুনি এসে পড়বে—'

লীলার ঘোমটা সরিয়া গিয়াছে। উত্তেজনায় তাহার সুন্দর মুখখানি ঘোর রক্তিম ও সারা দেহ কম্পিত হইতেছিল। সে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'আসুক না তাঁরা, একজনের সামনেও আমি বার হব না ত। দু'একজনের সভ্যতার যা পরিচয় পেয়েছি, আর ঐসব সভ্যদের সামনে বার হবার আমার প্রবৃত্তি নেই!'

কনকতারা বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, 'তুমি ঠাকুরপোর কথাটাও শুনবে না!'

উত্তেজিতস্বরে লীলা কহিল, 'শুনবো না-ই ত! এতটুকু আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান যাদের নেই তাদের একটা কথাও আমি শুনবো না। মানুষকে তো আপনারা মানুষ বলে ভাবচেন না। নূতন সভ্যতার আলোয়—আপনাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। কোন্ দিকে যাচ্ছেন তা টের পাচ্ছেন না। আর এমন কেউ নেই যে হাত ধরে ফিরিয়ে দেয়!'

'ইস্, তুমি যে পাদ্রী সাহেবের মত বক্তৃতা দিতে লাগ্‌লে। হাতে ধরে ফেরাবার ভারটা তুমিই হাতে নেবে বোধ হয়!'

'নিশ্চয় নেব, আপনাদের মত স্রোতে ভেসে যাব না এটা ঠিক।'

'আচ্ছা নিয়ো, খুব নিয়ো, কেউ তাতে আপত্তি করবে না। কিন্তু আজ্‌কে—এসো, এসো—' বলিয়া কনকতারা তাহার হাত ধরিয়া টানিলেন।

সজোরে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া লীলা দূরে গিয়া দাঁড়াইল। কম্পিত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'কেন মিছে একটা কেলেঙ্কারী করবেন! আমি মরে গেলেও কাউকে আমার গায়ে হাত দিতে দেব না! সকলকেই এখানকার মেয়েদের মত ভেবেচেন যে এককথায় সং সাজ্‌তে রাজী হয়ে যাবে!'

'বাবাঃ, তুমি একটি মেয়ে বটে! ঠাকুরপোকে ডেকে আনি—' রোষারক্ত মুখে কনকতারা ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন দ্বারে দাঁড়াইয়া সঞ্জয়।

'দেখ ঠাকুরপো, তোমার বৌ কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। কত বোঝালুম—রাগ কত, তর্ক কি! তোমার কথা শোনে কি না দেখ—'

জ্ঞানবাবু এক পার্শ্বে অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই দিকে চাহিয়া সঞ্জয় কহিল, 'আসুন মেজদা, বাইরে বসিগে।'

কনক আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, 'নিয়ে যাচ্চো—তাহ'লে সাজাবার কি হ'বে!'

সঞ্জয় লজ্জিতভাবে কহিল, 'থাক্ বৌদি, দরকার নেই। একখানা ভাল শাড়ী পরিয়ে দিলেই হবে।'

কনক মুখ কালো করিয়া কহিলেন, 'তবে তাই আগে বল্লেই তো হত। মিছে আমার অপমান হওয়ার কি দরকার ছিল!'

'তাই তো, বড় ভুল হয়েছিল, আমায় মাপ্ কোরো বৌদি—' বলিয়া সঞ্জয় কক্ষমধ্যবর্ত্তিনীর দিকে চাহিল। সেই ক্ষণে লীলাও মুখ তুলিয়া চাহিল। সেই শুভ মুহূর্ত্তের ক্ষণিক দৃষ্টিপাতে সঞ্জয় জীবনসঙ্গিনীর মুখে যে অলিখিত অনির্ব্বচনীয় ভাষা পাঠ করিল, তাহাতে একটা অভূতপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে ও নবঅনুভূত প্রবল আবেগে তাহার পুরুষের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া জ্ঞানবাবুর অনুসরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্তরের অন্ধকারে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কিশোরীর যখন আঠার বছর পার হয়ে যায় তখনও তার ধারণা থাকে,—তার পড়াশুনা রীতিমতই চলবে, বাপ-মায়ের আওতায়, সে বিদ্যামন্দিরের শেষ সম্মান লাভ করে যশের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হবে। সে নিয়মিতভাবে স্কলারশিপ পেয়ে আই, এ, পাশ করে যায়। কিন্তু তার এই আঠার বছর বয়সে, তার ভাই-বোনের সংখ্যা এত বেড়ে যায়, দরিদ্র পিতামাতার দৈনন্দিন দুঃখ, শিশুদের রোগ, ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণা এত বেড়ে ওঠে যে, কিশোরী তার বৃত্তির টাকা ভেঙে মাঝে মাঝে বাড়ীতে সাহায্য করতে বাধ্য হয়। শীঘ্রই এমন দিন আসে যে তার বৃত্তির টাকার সব কটাই, শিশু ভাই-বোনেদের রোগের চিকিৎসা ও দুধের খরচে ব্যয় করতে হয়। পড়া আর চলে না!

সতীর্থ অজিত বলে—'পড়া ছাড়বি নাকি ?'

'আর কি করার আছে ?'

'এই স্কলারশিপ পাওয়ার পরেও ?'

'বাপ-মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ছেলেকেও করতে হয় !'

'তাহলে—'

'এইখানেই খতম !'

সে একটা কড়া চুরুট ধরিয়ে টানে ; অজিতকে বলে—'খাবি ?'

অজিত অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়, বলে—'একমাস আগেও ত তুই সিগরেট বিড়ির নামে শিউরে উঠ্‌তিস !'

'উঠতামই ত। তা কি !'

তার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ উৎকট দেখায়। সে হাসে, মুখ বিকৃত করে, চুরুটে কসে দুটো টান লাগায়, বলে—'আঃ কি আরাম ভাই ! একটানে মাথাটা বেশ ঘুরে ওঠে। বোঁ বোঁ করে।'

অজিত দুঃখ করে, তার নেশা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, শেষে অপ্রসন্ন মুখে চলে যায়।

কিশোরী বাড়ী ফেরে। মা বলেন—'বাবা, বিয়ে একটা না করলে যে সংসার অচল হয়।'

অতি দুঃখে কিশোরীর হাসি পায়। সে উত্তর দেয়—'সংসার সচল ছিল কবে, তা ত জানি নে মা !'

মা বলেন—'এতগুলো ছেলেপিলে, একলা কেমন করে সামলাই বল। ছেলেগুলোকে বাঁচাতে হলে সংসারে লোক চাই যে—'

কিশোরী চুপ করে থাকে, মা বলেন—'কি বলিস ?'

'বলব আর কি ? সংসারে যে লোক আনতে চাচ্ছ, তারও ত একটা খরচ আছে ! আবার তারও ত কাচ্চা বাচ্চা হতে পারে।'

'সে আর হয় না কবে ? তাই বলে ছেলের বিয়ে দেব না ?'

'দেবে ?—দাও !'

সে ঘরের ভিতর উঁকি মারে। সব ছোট তিনটে ভাই আর দুটো বোন বলে—'বড়দা, দুটো লেবেঞ্চুস দেবে, বড় খেতে ইচ্ছে করছে !' সে তাদের অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট ক্ষীণ দেহের দিকে তাকিয়ে দেখে। তাদের ক্ষুধিত বিষণ্ণ দৃষ্টি তার প্রাণে আঘাত করে। সে দশটা পয়সা ফেলে দিয়ে ছুটে বের হয়ে যায় ! অবশিষ্ট চার আনার পয়সা দিয়ে, মোটা বর্ম্মাচুরুট কেনে, তার পরে টানের পর টান। উঃ, সূর্য্য চন্দ্র, পৃথিবী একাকার ! সব ঘূর্ণ্যমান। ক্ষণিক বিস্মৃতি—তাও ত সুলভ নয়।

সন্ধ্যাবেলায় সে অভ্যাসমত পড়ার ঘরে উঁকি মারে। ছোট আলমারিটার আশে পাশে গা জড়িয়ে মাকড়সার জাল

উঠেছে সে, উদাস নেত্রে চেয়ে দেখে বইগুলোর মধ্যে তেলাপোকার বাসা। পাতায় পাতায় জুড়ে গেছে—তেলাপোকার বাসায় আটা লেগে। যে একবার একখানা বইয়ের পাতাদুটো পৃথক করতে চায়, পাতাদুটোই ছিঁড়ে যায়! ঝুল আর তেলাপোকার গন্ধে তার নাক জলে ওঠে! সে তবুও ঘরে দাঁড়িয়ে থাকে আলমারীর দিকে তাকিয়ে, অনেকক্ষণ, অকারণে!

বাবা বলেন—'কিরে? এবারের স্কলারশিপের টাকা পেলি নে!' ছেলে বলে—'কলেজ ছাড়লে স্কলারশিপ থাকে না!'

বাপ আর্ত্তস্বরে বলেন—'তাও বটে!' তাঁর জীর্ণ পাঁজরার হাড় দীর্ঘনিঃশ্বাসের টানে ফুলে ওঠে!

রাঙা চেলি পরে কিশোরী একদিন বিয়ের বর সেজে বসে! সাত পাকের পর শুভ দৃষ্টির হাঙ্গামা চুকিয়ে, রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে পরের দিন বাড়ী এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

মা প্রশ্ন করেন—'বৌ পছন্দ হল?'

'তা ত জানি নে মা।'

মা ব্যথিত বিস্ময়ে ছেলের মুখের পানে তাকান, বলেন—'বলিস কি?'

'বলি ঠিকই, বৌ ত চাও নি! চেয়েছিলে লোক।'

মায়ের চোখ জলে ভরে আসে, ছেলে ছুটে পালিয়ে যায়। রাত বারোটায় ছোট বোন এসে বলে—'দাদা শোবে এসো, অনেক রাত হয়েছে। আজ যে ফুলশয্যা।'

তার মুখে হর্ষের হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই দাদার তাড়া খেয়ে তার হাসি উবে যায়। দাঁত মুখ খিচিয়ে কিশোরী উত্তর দেয়—'আচ্ছা আচ্ছা যা; পাকামি করতে হবে না!'

ফুলশয্যার খাট! চারিদিকে ফুল বিছানো! তার মাঝে জড় সড় ক'নে বৌ, ঢাকাঢুকো দিয়ে পড়ে। কিশোরী তাকিয়ে দেখে। দোর জানালার ফাঁকে ফাঁকে মানুষের মাথা দেখা যায়, তাদের ফিস্ ফিস্ তার কানে ঢোকে! সে আলো নিবিয়ে সোজা শোয় গিয়ে খাটের কোণে, শুয়ে পড়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে—আঃ—হাঙ্গামা চুকলে বাঁচি!

বৌ বুঝতে পারে—তার মন ডুকরে ওঠে! সে চুপ করে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিশোরী ঘুমাতে পারে না। দোর জানালার পাশের সাড়ীর খসখসানি, তার মনে যেন আগুন জেলে দেয়। সে নিজের উপর রাগে, মনে মনে ধিক্কার দেয়, স্থির হয়ে শুয়ে থাকে, নড়েচড়ে না।

সারা রাত খাটের তলায় মশা তাড়িয়ে পড়শী ঠানদি বিরক্ত হয়ে খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে আসেন। কিশোরী দেখে, বুড়ীর দুর্দ্দশায় হাসে, বলে—'এত সখও ছিল তোমার এই বুড়োকালে!'

বুড়ী গজগজ করে বলে—'ধন্যি ছেলে তুই যা হোক। বৌটা কি আর মানুষ নয়, এত অগ্রাহ্যি কেন?'

সকাল হয়, কিশোরী বেরিয়ে আসে। আসার আগে বৌয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে। প্রভাত সূর্য্যের কনককিরণ তার মুখ পুড়িয়ে দেয়। কেন, সূর্য্য ওঠার কি আবশ্যক ছিল?

শেষে চাকরী জোটে পঁচিশ টাকায়। তার বেশী কিই বা আর জুটবে। তবু স্কলারশিপের টাকার চেয়ে ত বেশী। তবুও চাকরী। বাপ মা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। কিন্তু দেখা যায়—যে কে সেই।

মেজ ছেলের জ্বর ছাড়ে না! ইঞ্জেক্সানের দরকার বলকর পথ্য চাই। কিন্তু মেলে কোথায়? কারু দাঁতে ঘা, কানে পুঁজ। ময়লা ছেঁড়া কাঁথা, তেলচিটে বালিশ, আর ছারপোকাওয়ালা পাটির উপর শুয়ে শুয়ে, কারু পাঁচড়া, কারু দাদ, কারু উৎকট কাসি!

কোলের ছেলের দুধ কিনতেই অনেকের প্রাপ্য ব্যয় হয়ে যায়। ছেলেগুলো এক একটা করে মরে! মরণকালে শেষ ওষুধ দু'এক টাকার কেনা হয়! তার খরচ আর দেহ সংকারের খরচ আহারের সংস্থান থেকেই ভাগ চুর করে নিতে হয়! অনশনক্লিষ্ট, শীর্ণ কুশ্রী রোগা শিশুদলের কাতর আকুতি মর্ম্মভেদ করে! কিশোরী দেখে, মা বাপের দিকে চায়। চোখে পড়ে তাদের দাবদগ্ধ মরুর বুকের রুক্ষ কঠোর চকচকে দৃষ্টি!

ভরা যৌবনে তার স্ত্রী হয়ে পড়ে—পোড়া কাঠ!—কঙ্কালের উপর ঝোলা চামড়া লাগান একটা বিকট মূর্ত্তির মত।

কিশোরী বাড়ীতে থাকা কমিয়ে দেয়। বৌ এসে অনুযোগ করে, বলে—'তুমি অত বাইরে বাইরে থাক কেন? আমার ভাল লাগে না!

কিশোরী দাঁত খিঁচিয়ে বলে—'তোমাদের ও হাড়সার মূর্ত্তি, শুকনো চেহারা আমার সহ্য হয় না!'

বৌ নবীন যৌবনের উন্মেষোন্মুখ প্রবৃত্তিগুলোর মুখে পাষাণ চাপা দিয়ে আরও শুখাতে থাকে!

বাবা প্রশ্ন করেন—'এ মাসে কুড়ি টাকা কেন? আর পাঁচ টাকা?

'পাই নি।'

'কেন?'

'অত জানি নে!'

মেজ ছেলে জানায়—'দাদা আজকাল, সিগরেট বিড়ি আর সিদ্ধি খায় বাবা!'

বাবার সম্মুখেই কিশোরী বলে—'খাই বেশ করি! তোর কি!' দুটো চড় খেয়ে ভাই ছুটে পালিয়ে যায়, মায়ের কাছে নালিশ করতে, দেখে—মা চালের জন্য শূন্য টিনের পাশে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন! তার আর নালিশ জানানো হয় না! কিছু না খেয়েই সে স্কুলে চলে যায়। স্কুলে মাইনে লাগে না তাই!

কিশোরী রাত্তে বাড়ী আসে না; পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। ভাবে একটা শখ অন্তত মিটুক!

সরলা বৌ হাসে, বলে—'কিগো, আমায় আনাচে কেন? আমি একলা থাকি, রাত হলে ভয়ে মরি—'

কিশোরী উত্তর দেয়—'তুমি একলা জেনেই ত এসেছি বৌ!' বৌ হাসে, পান খেতে দেয়, বলে—'কাল এসো!'

'কাল? উঃ সে যে অনেক দিন!' সে জোর করেই ঘরে ঢোকে! সকালে দেখা হয় অজিতের সঙ্গে—হঠাৎ আচমকা! অজিত তাকে চিনতে পারে না! দারিদ্র্য যাকে দিনের পর দিন চুষে খেয়েছে, অতৃপ্ত প্রবৃত্তির তাড়না যাকে কুরতে আরম্ভ করেছে, বেশী দিন পরে তাকে চেনা শক্ত! কিশোরী থমকে দাঁড়ায়, ডাকে—'অজিত!'

অজিত ফেরে, অনেকক্ষণ ঠাওরে বলে,—'কে কিশোরী! এ কি মূর্ত্তি হয়েছে তোর?'

'একটা সিগরেট দিবি?'

'আমি ত খাই নে।'

সে পাশের দোকান থেকে কিনে তাকে সিগারেট দেয়—চোখ দুটো তার বেদনায় ম্লান হয়ে আসে। কিশোরী সিগারেট টানে, ক্রূর দৃষ্টিতে তাকায় অজিতের পানে, বলে—'কি করছিস আজকাল?'

'প্রোফেসরি।'

তাকে সবলে একটা ধাক্কা মেরে কিশোরী ছুটে চলে যায়। শৈশব-স্বপ্ন একবার তার আঁধার বুকখানাকে শাণিত ছুরিকা দিয়ে দুভাগ করে চিরে দিয়ে যায়—মেঘলা আকাশকে বিদ্যুৎ যেমন করে চেরে, তার মত! অজিত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাড়ীর পথ ধরে।

তারপর কিশোরীর দুঃস্বপ্ন কেটে যায়—স্ত্রীর হাসি মুখের সাদর অভ্যর্থনায়! ছোট দুটো ছেলে- যেন পূর্ণিমা রাতের সফল স্বপ্নের মূর্ত্ত সুষমা! তারা চুমুর জন্যে বাবার কাছে মুখ আগিয়ে দেয়, চুমু আদায় করে খলখল করে হেসে ওঠে! বড়টা হাততালি দেয়, বলে—'মা—চুমু!' মাও তাদের গোলাপী গণ্ডে চুমু খেয়ে হাসির জের আর মিটতে দেন না!

ইয়ার হারাণ বলে—'হ্যাঁরে কিশোরী! তুই যে বাবা সকলকে টেক্কা দিলি। ভদ্রলোকের ছেলে—'

কিশোরী বাধা দেয়, রাগে, বলে—'তা কি?'

'শেষটায় কিনা খেঁদি বুনোনী! সে যে বাবা আদ্যি-কালের বুড়ী।' কিশোরী রাগে মুখ ভার করে বলে—'কি করি বল্!'

'পঁচিশ টাকা মাইনে পাস্, করিস কি? না, চাকরী ছেড়েছিস?'

'চাকরীর জানটাই কেবল আমার টনটনে আছে ভাই!'

'তবে পঁচিশ টাকা ত কম নয়!'

'নয়ই ত। কিন্তু কি জানিস—' বলতে বলতে তার চোখ ছল ছল করে, স্বর ভারী হয়, সে কষ্টে বলে—'সবাইকে ভুলতে পেরেছি; কিন্তু মায়ের ব্যথাটা এখনও আমার বুকে টনটন করে! কাজেই তাঁর নামে দশটা টাকা না পাঠিয়ে পারি নে।'

'ওঃ, ভারি বাড়ীর দরদ! আমাদেরই কি আর মাগ ছেলে. ছিল না? না, মা নেই'

কিশোরী কথা কয় না, মুখের কথা বুকের ব্যথায় জড়িয়ে আসে।

হারাণ রাগ করে, ঠাট্টা করে বলে—'অতই যদি, তবে বাড়ী-ছাড়া কেন?'

'অনাহারে চোখের সামনে তিলে তিলে—' তার দৃষ্টি কোন্ দূর দেশে ভেসে যায়, বলে—'চোখে সয় না!'

'আমাদেরও অমন হয়েছিল। দিন কতক! কে কার বাবা? যে যার—নীরদাকে দেখেছিস্?'

ঠাস করে তার গালে এক চড় মেরে কিশোরী ছুটে যায়,, বলে—'ছিঃ, আমার ছোট বোনটা যে ওরই বয়সী! মরে গেছে, তাই রক্ষে। নইলে সেও ত—হ্যাঁ বিধবাই হত! তেকেলে বুড়ো রোগী ছাড়া ত আর বর জুটত না।

হঠাৎ একদিন কিশোরীর মনি অর্ডারের দশ টাকা ফেরত আসে। চোখ দুটো তার ছলছল করে। বাড়ী যায়। দেখে বাড়ীতে কেউ নেই! এর ওর কাছে প্রশ্ন করে; শোনে—সব মরে গেছে—না খেতে পেয়ে আর রোগের তাড়নায়। বুড়ী-মা শেষকালে আত্মহত্যা করে জুড়িয়েছে! কেবল মেজ ভাইটা কোন্ যাত্রার দলে মিশে বেরিয়ে গেছে, হয় ত বা দুটো খেতে পেয়ে বেঁচে আছে!

মনি-অর্ডারের ফেরত দশ টাকার দিকে সে চেয়ে দেখে। হঠাৎ সে লাফিয়ে ওঠে। বাঃ, আজ আর খেঁদী নয়। সে যায় হারাণের খোঁজে, ভাবে—এতেও আমার এ প্রবৃত্তিটা গেল না। শরীরে শক্তি নেই, এতে শান্তিও নেই; তবু এর নেশাটা আমায় জড়িয়েছে পুরুভুজের মতন!

সে ফেরে। বৌর কথা তার হঠাৎ মনে পড়ে যায়। বৌর বাপের বাড়ী যায় খোঁজ করতে। শ্বশুর বলেন—সে মরে গেছে!'

সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আবার ভাবে—'কিন্তু সেও বিকসিত যৌবনে পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্ত্রীত্বে ও মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সকলের একজন হতে পারত।

পথে বেরুতেই নটবর বলে—'কে কিশোরীদাঠাকুর নাকি! ছিঃ! ছিঃ!'

কিশোরী অবাক হয়, বলে—'কেন?'

'তুমি কেমন ধারা স্বামী গো? বৌটাকেও দুটো খেতে দিলে না? শেষে সে কিনা বেরিয়ে গেল!'

'বেরিয়ে গেল? তাহলে মরে নি?'

'না।'

সে যেন বাঁচে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে—আঃ অনাহারের দায় এড়িয়ে তবু!

নটবর ভাব দেখে ভাবে—'ঠাকুর দুঃখে পাগল হয়ে গেছে! নইলে এ শুনে কেউ সুখী বা স্থির হতে পারে?'

হঠাৎ কিশোরী ট্যাক খুলে দেখে—দশ টাকা! মাকে পাঠান টাকা! সে ভাবে—এ টাকার সে অপব্যয় করবে না!

বাসায় ফিরে তার খোলার ঘরখানিতে গিয়ে বসে! সবাই ঠাট্টা করে—'এ কি! অনাসৃষ্টি। নিশাচর হঠাৎ নিশার সঙ্গে আত্মীয়তা ভুলে গেল না কি?'

রাত বাড়ে। কিশোরী অস্থির হয়! তার সুপ্ত প্রবৃত্তি আবার জেগে ওঠে। সে ছোটে ছোটে—খেঁদীর কাছে নয়, আর কার উদ্দেশে! অনেকক্ষণ ঘুরে শেষে এক ঘরে সে ঢুকে পড়ে। যাকে আকুল আগ্রহে প্রবৃত্তির সকল উগ্রতা দিয়ে সে জড়িয়ে ধরে, সে হঠাৎ তার মুখের দিকে চেয়ে ফুকরে কেঁদে ওঠে! 'এ কি? ভগবান! তুমি! কিন্তু তোমাকে এ ভাবে পাওয়ার আশা ত আমি স্বপ্নেও করি নি!'

কিশোরীও অবাক হয়ে ভাল করে চেয়ে দেখে—হা ভগবান! সে আজ তার স্ত্রীর ঘরেই এসে উঠেছে—প্রবৃত্তির তাড়নায়!

হু হু করে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে। সে প্রকৃতিস্থ হয়ে তাকিয়ে দেখে—তার স্ত্রী তার পায়ের গোড়ায় মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে আছে!

লতাময়ী উর্ব্বশী

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

[কলহান্তরিতা উর্ব্বশী প্রণয়ী পুরূরবার অনুনয় উপেক্ষা করিয়া দেব-সেনাপতি চিরকুমার কার্ত্তিকেয়ের তপোবন কুমার-কাননে গুরুশাপসংমূঢ়হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কুমার-বন স্ত্রীজনপরিহরণীয়, কাজেই উর্ব্বশী কাননে প্রবেশ করিবামাত্র একটি শ্যামলী লতিকায় রূপান্তরিতা হইলেন। কবি কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কের এই আখ্যান ভাগ অবলম্বন করিয়া কবিতাটি রচিত।]

কুমার-কানন-তলে উর্ব্বশী সে—স্বর্গের অপ্সরা,—
স্থকঠোর অভিশাপ-লীনা।
নন্দন-বনের ছায়ে প্রিয়াহারা ফিরে পুরূরবা,—
অশ্রুম্লানদৃষ্টি, উদাসীন। মিলনের স্তব্ধ বীণা,
শূন্য শয্যা, দীর্ঘতরা চন্দ্রিকা রজনী,
শুষ্ক শীর্ণ সুগন্ধি মালিকা,
প্রেমভাষাগুঞ্জহীন পরিচিত বকুলবীথিকা
স্বপ্নসম ভাসিছে অন্তরে। ফণী যেন শিরোমণি
ফেলেছে হারায়ে।
… তন্দ্রাহতা বিশীর্ণপল্লবা,
অরণ্যবল্লরী প্রিয়া ;—নহে, নহে চিরমধুকরা !

মায়ার উর্ব্বশী সে যে, কভু ফিরে উষার আননে,
ধূসর রক্তিমবাসা পূর্ব্বাকাশ তটে।
মহেন্দ্র-বাসরে কভু স্তনাংশুক-সরম হারায়ে
নৃত্য করে ছন্দোময়ী, ফাল্গুনীর প্রেমভিখারিণী,

মদির লোচনা নারী। আজি মর্ত্ত্যে তাহার নয়নে,
বিচ্ছেদের প্রেমবারি ধীরে ধীরে তুলিল দুলায়ে
সে কোন্ মায়াবী নর!

তাই সে যে লতা, সঞ্চারিণী
শিশির-মার্জ্জিত তনু, কাননের শ্যাম চিত্রপটে
লীলাময়ী উঠেছে ফুটিয়া।

স্তব্ধ ঘন কুমার-কানন;
বিহগ ফিরিছে একা। প্রিয়া নহে চক্ষুর গোচরা।
করুণ রোদনে তা'র মাঝে মাঝে কাঁপে বনস্থলী;
পুষ্প নাহি, ফল নাহি; বিরহের দীর্ঘশ্বাস ভরা—
তপঃক্লিষ্ট বনস্পতি। প্রেমভাষা ভুলেছে সকলি;
শুধু রুদ্ধ অন্ধকার হোমধূমে পুঞ্জিত গগন।

সেথা সর্ব্বসীমন্তিনী লতা হ'য়ে মেলিছে পল্লব;—
অপূর্ণ মুকুল-স্তন-স্তোকনম্রা সুপর্ণগুণ্ঠিতা!
তনুর লাবণ্যমধু শ্যামশোভা দিল' বিস্তারিয়া
সর্ব্ব অবয়বে তা'র। সেথা আজি তুলে কলরব
বিশ্বের বিরহী যত। ব্যথাতুরা নীরবকুণ্ঠিতা
সঙ্গচারিণীর দল দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
কভু আর্দ্র পত্রদল মেলে
ইঙ্গিত জানায় ধীরে সমীরের পরশে দুলিয়া।

সে ইঙ্গিত-মর্ম্মকথা গন্ধবহ উদাস-নিঃশ্বাসে
বহি' চলে দেশান্তরে নদীগিরিকন্দর লঙ্ঘিয়া

তৃণে তৃণে পরশ বুলায়ে। সর্ব্বব্যাপী ছায়া তার
মুছি' লয় সন্ধানের আলোকের রেখা। ব্যথাভার,—
অন্ধকারে ফেনায়িত সমুচ্ছল নীলসিন্ধুসম
উঠে তরঙ্গিয়া।

শান্ত অনুপম
প্রিয়ার মোহন ছায়া সুদূরের সুনীল আকাশে,
ক্লান্ত নেত্রে ক্ষণিকের দাহ পাসরিয়া
হেরে ধীরে প্রতিষ্ঠান-পতি। তমালবনের ছায়ে,
শ্যামপত্র-পল্লবের 'পরে, ঊষার মৃদুল বায়ে,
কুসুমের সুষমা-সম্ভারে প্রিয়ার আননখানি
দীর্ঘ দিন গিয়াছে মিশিয়া!
সন্ধানী বিরহী আজি রহস্যের আঁধার ভেদিয়া
হেরে সবি প্রিয়াময়। সর্ব্বহারা খুঁজে পেল' বাণী!

তারপরে একদিন বসন্তের আবেশহিল্লোলে,
মৃত্তিকার দেহ 'পরে চঞ্চলের চলিল ক্রন্দন;
ব্যথাতুর পুরূরবা হেরে দূর কুমার-কাননে
প্রিয়া যেন লতা হ'য়ে দোলে—
নিবিড় সুষমা-মাখা। প্রসারিত করতল 'পরে
ঝরিল মঞ্জরী দু'টি। দুই বিন্দু অশ্রু, থরে থরে
শোভিল মণির মত। প্রেমভাতি জাগিল নয়নে,
অম্লান কোরকে তার রাখি দিল প্রথম চুম্বন
আদি নর, আদিম বিরহী।

... বাহিরিয়া এল নারী;
লতিকার শ্যামদেহ ছাড়ি'।

বেপমান তনুখানি শোভে যেন কোরকের মত।
শ্যামলী, সুন্দর-দেহা সারা পৃথ্বী স্তবগান রত
দু'টি কর্ণমূলে তা'র। প্রসন্ন-আননা,
চাহিল ফিরিয়া ধীরে মায়া স্তব্ধ প্রিয়ের আননে;
বারেক চাহিল ধীরে স্মিতহাস্যে নগ্নদেহ 'পরে—
পদ্মরাগ-রক্তিম উরসে। তারপরে দেহ ভরি'
তুলিয়া তরঙ্গখানি ফিরে এল ত্বরিত-গমনা
প্রিয়ের বাহুর পাশে। সরমের নিগড় পাসরি'
আলোকের শুভ্র বন্যা ছেয়ে গেল সারাটি ভুবনে
বিধাতার আশীর্ব্বাদ সম।
... উঠে আজি থরে থরে
সৃষ্টির প্রথম পুষ্প পূর্ণ দুটি অন্তরের মাঝে।
ঝিঝির নবীন গান দুটি দেহবীণাযন্ত্রে বাজে।

ভ্রাম্যমানের জল্পনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মাঝে মাঝে মনে হয়, বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির বিকাশটা হয় ত অবিমিশ্র শুভ না হতেও পারে। কারণ পাঁচ বৎসর আগে পারিস যে এত ভাল লেগেছিল তার কারণ কি এই-ই নয় যে, সে সময়ে এ অতুলনীয় ঐতিহাসিক নগরীর প্রতি অভিজ্ঞতাটিকেই একান্ত ক'রে গ্রহণ করতে পারতাম—যেটা আজ হারিয়েছি? আজ হয় ত অনেক জিনিষকেই একটু গভীরতর ভাবে দেখছি—যদিও সেটা জোর ক'রে বলা চলে না—কিন্তু প্রতি জিনিষকেই যেন কি এক রকম ক'রে নিজের মনের রসানে সেঁক দিয়ে গ্রহণ করছি না? এক কথায়, আজ প্রতি বাহ্য বস্তুরই সমালোচনা করার লোভ সংবরণ করতে ত পারছি না, অথচ সঙ্গে সঙ্গে এটাও ত বুঝতে পারছি যে, পাঁচ বৎসর আগে হৃদয়ের সে তারুণ্যের অবস্থায় এখানকার প্রতি অভিজ্ঞতা আমার মনের গায়ে যে পুলক শিহরণ বিছিয়ে দিত, তখনও বাইরের প্রতি চমক আমার প্রাণের নিভৃত নিকুঞ্জে যে ফুলটি অতি সহজেই মুঞ্জরিত করে তুলত, সে সময়ে প্রতি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই যে নিহিত সুরটি হৃদয়বীণার রণিয়ে রণিয়ে তা'র প্রতি তারকে সে আবেশে কম্পিত ক'রে তুলত;—আজ

হৃদয়ের সে নবীনতা ও সরসতাটি লুপ্ত না হোক, অপেক্ষাকৃত সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করছে নিশ্চয়ই। হয় ত আবার এক দিন দেখা যাবে যে, সে তরুণ গ্রহণ-কামনাটি কোনও এক সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে উঠেছে, হয় ত কোনও এক বিশেষ অভিজ্ঞতার মলয় পরশে দেখ্‌ব যে, আবার সে ফুলটি তার সৌরভ অভিনব ভাবেই ছড়িয়ে দিয়েছে: হয় ত তখন দেখ্‌ব হৃদয়ের একটা সমৃদ্ধ উপভোগ-শক্তি এই আসরে চোখ মেলেছে;--কিন্তু যত দিন তা না হয় ততদিন মনের কোণে একটা আশঙ্কা যে জমা বাঁধেই যে, যা পেয়েছি সেটাতে যা হারিয়েছি তার ক্ষতিপূরণ হয় ত হয় নি। কিন্তু উপায় কি! যা অতীত তাকে আঁকড়ে থাক্‌লেই ত তাকে ধ'রে রাখা যায় না। অতীত বর্ত্তমানকে জন্ম দিয়েই বিলীন হয়—কেন না এই তার ধর্ম্ম। তাই যা গেছে তাকে যেতে দেওয়াই ভাল, যা অনাগত তাই বেশী সত্য।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি মনে পড়ে—

'গেছে কেটে যাক কেটে পুরাতন রাত্রি।'

সুতরাং হয় ত যা হারিয়েছি তার স্থলে যেটা অর্জ্জন ক'রেছি তাকেই নিবিড় ক'রে বরণ করতে প্রয়াস পাওয়া ভাল। হৃদয়ের নবীনতার সে আগমনীর গানে মনের প্রতি পত্র-পুষ্প আজ আর বিকশিত হ'য়ে ওঠে না বটে, কিন্তু মনের একটা সমাহিত স্থৈর্য্য যে ধীরে ধীরে প্রাণারাম ভাবে ঘন হ'য়ে ধরা দিচ্ছে তাকেও ত ছোট করে দেখা চলে না! সে সময়ে সামান্য আঘাতেই মনটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত না কি—যেটা আজ হয় ত সে ভাবে আর ঘটতে পারবে না? সে সময়ে প্রতি বিপরীত স্রোতই মনকে অনেকটা দিশেহারা করত না কি—যেটা মনের নদীর ধারার পরিমাণ স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে আজ হয় ত সে ভাবে সম্ভবপর হ'তে পারে না। এককথায় মনটা সে সময়ে সহজেই চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ত. যে দোল একবার আরম্ভ হ'লে আর যেন থামতে চাইত না। তাতে কি একটা সুনিবিড় পরিণতির পথে বাধা পড়ত না? আজ মনের অবস্থা আশা করি ততটা কাঁচা নেই এবং এ অনুভূতির মধ্যে যে একটা তৃপ্তি আছে এটাও ত অস্বীকার করা চলে না। তাই তখনকার দিনের অবস্থাই ছিল ভাল, না আজকের পরিণতিই বেশী কাম্য, এ—চিন্তাকে বেশী প্রশ্রয় না দিয়ে জীবনের পত্রপুষ্পে প্রতি নূতন হিল্লোলের আগমনীর রসসঞ্চারকেই যেন অভিনন্দন করতে পারি।

তবু মনের একটা ধর্ম্মই এই যে, যা গেছে তার জন্যে একটু আক্ষেপ, একটু অনুশোচনা একটু অশ্রুপাত করতে সে ভালবাসে। সে ত ভাবে না যে জীবনে রসসঞ্চয় করার প্রেরণা ও উপায় ক্ষণে ক্ষণে তার বর্ণ পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য। তাই সে পরিচিত উপায়ে জানা ধরণে রসসঞ্চয় করার ক্ষমতাকে হারাতে এত অনিচ্ছুক; ও তাই যা বর্ত্তমান তার মূল্য পূর্ণ পরিমাণে দিতে না চেয়ে যা বিগত তার মূল্য নির্দ্ধারণ করতেই এত ভালবাসে। কথায় বলে যে-মাছটা পালায় সে মাছটাই সব চেয়ে বড় হ'য়ে থাকে। প্রবচনটির মধ্যে একটা গভীর সত্য নেই কি? কিন্তু কেন আজ হঠাৎ এ গবেষণা সেটা একটু খুলে বলি।

কাল এই বিরাট পারিস শহরে আমার একটি বিদেশী বন্ধু ও চারটি বিদেশিনী বান্ধবীর সঙ্গে রাত প্রায় একটা অবধি এখানকার একটি নাচঘর ও একটি কাফেতে খুব হৈ হৈ করে কাটানো গেল। এ কাটানোর ফলে দেখা গেল যে, মনের সে নবীনতা অনেকটা হারানো গেছে যা পাঁচ বৎসর আগে এ রকম অভিজ্ঞতা থেকেও রসসঞ্চয় করতে পারত। ব্যাপারটা এই:

আমাদের দলটির মধ্যে পাঁচটি জাতির প্রতিনিধি ছিল। আমার বন্ধু চেক অতি সুপুরুষ ও স্নেহশীল মানুষ—খানিকটা প্রাচ্যভাবাপন্ন, যদিও বেশভূষায় পুরো দস্তর নব্যপন্থী। তাঁর স্ত্রী ফরাসী—সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ও মিশুক। অপর এক জন চেক্—বিপুলকায়া, সর্ব্বদাই গল্পোৎসাহিনী ও অট্টহাস্যনিপুণা। আর একজন ইতালিয়ান পিয়ানো-বাদিকা ও রীতিমত পুরুষভাবাপন্না। আর একজন পোল, স্বভাবটি দুর্ভেদ্য।

হঠাৎ দেখা গেল যে, এখানকার মেলামেশার মধ্যে পারিস-জীবনের এই ভাবে বেপরোয়া রকমের কালকর্ত্তন করার প্রবৃত্তি আমাকে বেশ একটু সচকিত ক'রে তুলছিল। মনে হচ্ছিল পাঁচ বৎসর আগে এ রকম ভাবে জীবনের

পথচলায় এদের রসসঞ্চয় করার অভ্যাসটাকে হয় ত বেশ সুনজরেই দেখতাম। কিন্তু কাল যেন মনটা সর্ব্বদাই সমালোচনারূপ অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে চাবুক হাতে সব-কিছুরই মধ্যে দোষটুকুর খোঁজে উধাও হতেই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল আমার ভূতপূর্ব্ব য়ুরোপ-অনুরাগী মনটিকে একবার নির্ভয়ে প্রশ্ন ক'রে বসি যে, য়ুরোপের এই হৈহৈ-প্রিয়তাটা কি সত্যই আনন্দকর, না শুধু কোনো রকম ক'রে সময়ের ব্যাদিত ব্যাদানকে অর্থহীন চাঞ্চল্যরূপ অখাদ্য দিয়ে কোনো মতে পূর্ণ করা? এ সংশয়ের উত্তরে আমার ফরাসী বান্ধবী সে দিন বেশ একটা কথা বলছিলেনও।

সেদিন তিনি ও আমি একটা হোটেলে খাদ্যভোজন করছিলাম। হঠাৎ একজন তরুণ একজন তরুণী ভোজন-কক্ষের একটা দিকের দু'চারটি চেয়ার সরিয়ে দিয়ে একটা গ্রামোফোনে ফক্সট্রটের রেকর্ড লাগিয়ে বেপরোয়া হ'য়ে নাচ সুরু করে দিলেন। আমি একটু আশ্চর্য্য হ'তেই বান্ধবী আমায় বললেন যে, যদি আমি য়ুরোপের নাচের প্রতি এই আসক্তিটা ভাল রকম করে বুঝতে পারতাম তা'হলে য়ুরোপের সভ্যতার বিকাশধারার মর্ম্মস্থলটির পরিচয় পেতাম। কারণ (তিনি বললেন) য়ুরোপ সর্ব্বপ্রকার গতিকেই বিশ্বাসের চোখে দেখে—স্থাণুবৎ স্পন্দনহীনতাকে একটা মস্ত কিছু মনে করে না।

কথাটা সত্য। এ কয়দিনে নীসে ও পারিসে এই সত্যটা যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম। সেদিন মুল্যাঁ রুজ ব'লে এখানকার একটি বিখ্যাত নাচঘরে সারারাত্রি ধ'রে নাচের হলুরার বিরাট কক্ষে অন্যূন দশটি যুগলমূর্ত্তিকে অশ্রান্তভাবে নাচ্‌তে দেখে যেন নতুন ক'রে মনে হ'ল যে, এ সভ্যতার মধ্যে একটা অফুরন্ত জীবনীশক্তি আছেই আছে—যার অভিব্যক্তি এদের মধ্যে পরিণতি নিয়েছে—সমাপ্তিহীন স্পন্দনের দিকে, অর্থহীন চাঞ্চল্যের দিকে ও যুক্তিহীন উধাও-হওয়ার দিকে।

আমি বল্‌ছি না যে, চিন্তার দিকে, গবেষণার দিকে ধ্যানের দিকেও এরা বড় নয়। আমি বলতে চাচ্ছি শুধু এই কথা যে, সে চিন্তা, গবেষণা ও ধ্যানের মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য এদের আছেই আছে। সে বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে এদের জীবনীশক্তি। এটা মস্ত জিনিষ এ কথা মান্‌তেই হয়।

অথচ তবু আমাদের সাবধানী প্রাচ্য মনের সময়ে সময়ে মনে হয়ই হয় যে, এ জীবনীশক্তির কি বিরাট অপচয়ই না হয় এখানে! য়ুরোপ আজ নক্ষত্রবেগে শহুরে হয়ে পড়ছে ও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ নর-নারী শহুরে জীবনের বিশ্রাম-বিতৃষ্ণা ও নৃত্য-পিপাসায় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু—হয় ত শক্তি যখন বেশী সঞ্চিত হয় তখন সে অপচয়েই যথার্থ সার্থকতা পায়। কে জানে? অন্তত জগতে প্রতি সভ্যতার বিরাট শক্তি অপচয়ের দৃশ্যে এই কথাই ত' মনে হয়। প্রকৃতিও লক্ষ লক্ষ জন্ম দেন লতায় পাতায় ফলে ফুলে পতঙ্গে তরঙ্গে বাতাসে ঝঞ্ঝায়—শুধু তাঁর অপচয়ের ও ধ্বংসের ক্ষমতার দৃশ্যে আত্মপ্রসাদ পেতে নয় কি?

মানুষও প্রকৃতির হাতের খেলার পুতুল মাত্র। অন্তত আমাদের কালকের নৈশহাসিগল্প ও দুটি কাফেতে খাওয়া-দাওয়ার দৃশ্যে এই চিত্রটিই যেন আমার চোখে বেশি ক'রে ফুট হয়ে উঠ্‌ল যে, আজকের য়ুরোপে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর আমোদ-প্রমোদের মধ্যে মানুষের শক্তির অপচয়ের দৃশ্যে এই কথাই আমার বেশি ক'রে মনে হয়েছিল। সারাদিন তারা কাজ করে—শুধু গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপ মাতোয়ারা হ'য়ে হৈ হৈ করার জন্যে।

কাল আমার একটি বন্ধু বল্‌লেন যে, আজ রাত বারটার পরে তাঁর নিমন্ত্রণ তাঁর কোন য়ুরোপীয় বন্ধুর বাড়ী। সম্ভবত রবিবারের ভোর বেলা অবধি তাদের বা নাচের বা গান ও অট্টহাসির আসর চল্‌বে। জীবনে অবসরের এই সদ্ব্যবহার!

কাল রাত একটার সময়ে একান্ত ক্লান্ত মনে ঘরে ফিরে অবধি কেবলই মনে হচ্ছিল এই একটা কথা যে, কোথায় চ'লেছে আজকের লক্ষ লক্ষ দিশেহারা আমোদ-বিলাসী মানুষ! জীবনীশক্তির তারিফ মন খুলে করা চলে; বলা চলে এই-ই ত জীবন—নইলে গতিহীন,